আড়ালে উপত্যকা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মডার্ন কলাম

১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই বিডন রো, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ বিজন ভট্টাচার্য

আড়ালে উপত্যকা' গ্রন্থে যাদের কথা বলা হয়েছে

সানজিদেবী (৩৫) : চাসু উপত্যকার মুখ্য ধর্মস্থান 'সানজিধাম'-এর প্রধান। তিনি 'মাতাজি' বা 'সানজিমাতা' হিসাবেই সমধিক পরিচিতা। স্থানীয় মানুষজন সানজিধামকে আশ্রম বলে গণ্য করে থাকে এবং মাতাজি তাদের কাছে সাক্ষাৎ দেবী। কার্যত, তিনিই উপত্যকার প্রধান চলিকাশক্তি। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে বা নির্দেশ অমান্য করলে চরম শাস্তি পেতে হয়। শক্ত হাতে তিনি আশ্রম পরিচালনা করে থাকেন। মেয়েরা যেখানে নিছক ভোগের বস্তু সেখানে সানজিদেবীর প্রতি এমন অভাবনীয় সম্মান প্রদর্শন বিস্ময়কর ঘটনা। তিনি যুবতী ও রূপসী। মঙ্গল ও শনিবার মাতাজি মৌনী থাকেন।

নাংগেল তাফা (৬৫) : চাসু উপত্যকা ও সংলগ্ন এলাকাকে হিমালয়প্রেমীদের কাছে পরিচিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান। ধীর, শান্ত, প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মানুষটির হাত ধরেই ধীর বিশ্বাস ওই এলাকার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়। ধীব যেমন তাঁকে তার গুরুজি বলে ভেবে থাকে তিনিও তেমনি তাকে পুত্রসম স্নেহ করেন। দুর্ঘটনার কারণে তিনি আপাতত অবসরে। সারা উপত্যকায়, এমনকী তার বাইরেও, তিনি অত্যন্ত সম্মানীয় মানুষ।

সোনাম চিকু (৫০) : ক্ষ্যাপাটে, রুক্ষ ও অসম্ভব বদমেজাজি হলেও পাহাড়ে অত্যন্ত দক্ষ গাইড। চিকু আগে অন্য এলাকায় গাইড হিসাবে পাহাড়ে যেত। বর্তমানে বছব খানেক ধবে সে চাসু উপত্যকায়। সানজিমাতা ও নাংগেল তাফা ছাড়া আর কাউকে সে তেমন গুরুত্ব দেয় না। স্থানীয় মানুষজন তাকে এড়িয়ে চললেও সে মাতাজির স্নেহধন্য।

আপাং কেনি (৫০) : মাচদা গ্রামের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী। সে 'লালাজি' অর্থাৎ শেঠ হিসাবে স্থানীয় মানুষজনের কাছে বেশি পরিচিত। বাইরেব লোকজন তাকে 'আপাং' বা 'কেনি' বলেই চেনে। ট্রেকারদের কাছে আপাং কেনি এক পরিচিত নাম। তাদের প্রয়োজনে সে সব ব্যবস্থা করে দেয়।

নগলি দাকাত (৪০) . কুড়ি বছর বয়সে বিধবা হওয়ার পর নগলি আর বিয়ে করেনি।

সবাই তাকে অসৎ, লোভী ও দুষ্টকর্মে লিপ্ত থাকে বলে জানে। তার দেশি মদের কারবার। তার ধাবায় সস্তায় খাবারও পাওয়া যায়। বেশ স্বচ্ছল ও অহঙ্কারী মহিলা হলেও স্থানীয় মানুষ তার ছায়া মাড়াতে চায় না।

দিরাং লাকা (৪৫) : সর্বঅর্থে পরগাছা। একদা আপাং কেনির খাস নোকর ছিল। আপাতত সে খুব অসহায়। বেহেড মাতাল ও অলস। কারও কাছেই তার তেমন গুরুত্ব নেই। এক সময় কেনির নির্দেশে সে পাহাড়ে মালবাহক হয়ে যেত।

বিনতি লাকা (৩০) : দিরাং-এর স্ত্রী এবং আপাং কেনির রক্ষিতা। তার শরীরের গঠন অত্যন্ত আকর্ষণীয়। দিরাং তাকে অবহেলা করলেও বিনতি তাকে খুব ভালবাসে। ভারী সুন্দর মনের মানুষ বিনতি।

মানজু সালান (৩০) . সানজিদেবীর নিজের ভাই। আশ্রমের কাজেই মূলত সে ব্যস্ত থাকে। পাহাড়ে গাইড হিসাবেও কাজ করে। তবু তাকে সহজে বোঝা যায় না। অনেকের ধারণা সানজিদেবী উপত্যকার মুখ্যমন্ত্রি হলে মানজু পুলিশমন্ত্রির কাজটা বেশ দাপটের সঙ্গে করে থাকে। তবে অতি গোপনে।

দিশ (১৮) : কুৎসিত না হলেও বিশ্রি দেখতে। মেয়ে কিন্তু চেহারায় পুরুষালি ভাব। বোবা হলেও প্রচুর রহস্য তাকে ঘিরে।

ইরিকা টোর (৪০) : কানাডা থেকে হিমালয় ভ্রমণে এসেছেন। ছিপছিপে গঠন। মেয়েদের তুলনায় তাঁকে লম্বাই বলা চলে। পাহাড়ে গিয়ে নতুন কিছু করে দেখাতে চান। সোনাম চিকুর সঙ্গে মাতরা রেঞ্জ টপকে চাসু উপত্যকা থেকে ডোলি উপত্যকায় যাওয়ার অভিলাষে বছর না ঘুরতেই ফের তিনি মাচদা এসে হাজির। অল্প পরিচয়েই সানজিদেবীর খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছেন।

ধীর বিশ্বাস (৪৫) : ফি-বছর হিমালয়ে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস। চাসু উপত্যকায় ধীর বেশ কয়েকবার এসেছে। মূল চাসুতে সে এর আগে তিন-চারদিনের বেশি কখনও থাকেননি। এই প্রথম সেখানে তার মাস ঘুরে যায়।

লাশ

মাচদা ঢোকার মুখে বাসটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তার উপরে কিছু উত্তেজিত মানুষের জটলা। সবার মতো ধীরও নেমে পড়ল। রাস্তার বামদিকের পাথুরে ঢাল ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে জনা কয়েক মানুষকে দেখতে পেল ধীর। রাস্তায় এত মানুষ অথচ ওখানে মাত্র চার-পাঁচ জন! সবার দৃষ্টি ওই ক'জনের উপর। ব্যাপার কী জানতে চেয়েও কারও কাছে সঠিক জবাব পাওয়া গেল না। সামান্য ইতস্তত করে এক-পা দু'-পা করে ধীর নীচে নামতে থাকে। দু'মিনিটের মধ্যেই সে ওই চার-পাঁচ জনের কাছে পৌঁছে যায়। একজন পরদেশি মানুষকে আচমকা তাদের সামনে দেখে লোকগুলো সরে দাঁড়ায়। আর অমনি ধীরের চোখ আটকে যায়।

দাহ করার জন্য কোনও লাশ পড়ে থাকলে যেমন দেখায় তেমনি একটা মানুষ পাথরেব উপর শোয়ানো। পড়ন্ত বিকেলে পাথরের আড়ালে আবছা পরিবেশ। মুখ থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা থাকলেও তার পর থেকে আর কোনও আড়াল করার ব্যাপার ছিল না। পা দুটো দেখেই বোঝা যায় মেয়েমানুষ। পায়ের গোছ বেশ শক্ত, লড়াকু সংগ্রামের চিহ্ন। কী হতে পারে, ভাবছিল ধীর।

মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে দেখতে যাবে ধীর অমনি দু'জন হেঁইহেঁই করে আপত্তি জানাল।

"হ্যায় কৌন আপ?"

সে কে জানতে চায়। কোনও উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে প্রেসকার্ড বের করে ধীর তাদের সামনে ধরল। একই সঙ্গে বাম হাত দিয়ে মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিল। আর্তনাদ কবতে গিয়েও পারল না। হিংস্রতার বীভৎস চিহ্ন মেয়েটির শরীরের প্রায় সর্বত্র। মুখ-গলা-বুক ছাড়িয়ে তা নাইকুণ্ডের গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। খুব বেশি হলে পনেরো সেকেণ্ড হতে পারে। যেমন ঢাকা ছিল তেমন করে ঢেকে দিল ধীর। তারপর উঠে পড়ল।

মাচদায় ধীর মোটেই অপরিচিত নয়। অথচ দাঁড়ানো মানুষজনের একজনও তার পরিচিত নয়। এ সব এলাকায় কোনও ছবির সঙ্গে যদি অশোকস্তম্ভ দেওয়া পরিচয়পত্র থাকে তা হলে তাকে সরকারি লোক বলে মনে করা হয়। প্রেসকার্ডধাবী মানুষ এদিকে পত্রকার অর্থাৎ সাংবাদিক। পত্রকারকে ওখানকার লোক খুব সমঝে চলে। সেই সুযোগটা নিয়েছিল ধীর। সম্ভবত লোকগুলো পিতসির সরপঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চায়েত থেকে এসেছে। তাই ওরা কেউই তার পবিচিত নয়। পুলিশ আসা পর্যন্ত ওদের কাজ ডেডবডি পাহারা দেওয়া।

"মেয়েটি কে?" জানতে চাইল ধীর।

একজন বলতে গিয়েও হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ধীর বুঝল ইশারায় নির্দেশ পৌঁছে গেছে। সুতরাং কোনও কথা নয়। জেনেও না জানার ভান করল সে।

"পাত্‌তা নেহি সাব্।"

যেখানে হাত গুণে মানুষের সব কিছু বলে দেওয়া যায় সেখানে লোকটা কিছুই জানে না। একটা মেয়ে নির্মম আঘাতে মারা গেল অথচ তার পরিচয় জানা গেল না। যাবেই বা কী করে! নদীতে ভাসিয়ে দিলেই এদিকে সব পরিচয় হাওয়া। এতটা করা গেল আর ভাসিয়ে দেওয়া গেল না। হাতের কাছেই নদীনালা—বিকেল থেকেই সেখানে জলের তোড় দেখার মতো। অল্প টানা হ্যাঁচড়া করলেই অনায়াসে নদীর জলে মৃতদেহ চালান করে দেওয়া যেত। তা কিন্তু করা হয়নি। তার অর্থ মেয়েটির হত্যাকারী পুলিশ ফুলিশের তোয়াক্কা করে না। বেশ সাহসী সে।

মৃতদেহের উপর থেকে কাপড় তুলে ফেলতেই ভক্ করে একটা আঁশটে গন্ধ ধীরের মুখে ধাক্কা মেরেছিল। অর্থাৎ পচনক্রিয়া শুরু হওয়ার মুখে।

"খুনটা কখন হয়েছিল বলে মনে হয়?"

ধীরের চাঁচাছোলা প্রশ্ন শুনেও তারা কেউ ঘাবড়াল না। একই জবাব এল।

"পাত্‌তা নেহি সাব্।"

পঞ্চায়েত থেকে লোকগুলোকে ডেডবডি পাহারা দিতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ এসে গেলেই তাদের ছুটি। একটু চোটপাট হম্বিতম্বি করলেই সব বেরিয়ে পড়বে, জানে ধীর। তবে ওপথে গিয়ে তার লাভ নেই। মানে মানে সরে পড়াই ভাল। অনেক বেশি সাহস ও অকারণ আগ্রহ দেখিয়েছে সে। ঘাতক হয়তো কাছেপিঠেই ঘাপটি মেরে তাকে লক্ষ করছে।

পাহাড়ের ঢাল ধরে নদীর বেড পেরিয়ে বাসরাস্তায় ফিরতে গিয়ে কী মনে করে ধীর আর একবার মৃতদেহের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। লোকগুলো কোনও কিছু বোঝার আগেই এক হ্যাঁচকায় ঢাকা কাপড়টা সে সরিয়ে দিল।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ধীর। প্রাথমিকভাবে দেখে তার মনে হল, যৌন নিপীড়ন করার সময় মেয়েটিকে খুন করা হয়নি। খুন করার উদ্দেশ্যেই তাকে খুন করা হয়। কামিজ ও শালোয়ারের প্রায় সর্বত্র ছেঁড়াফাটা আর রক্তের শুকনো কালো দাগ। এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ঢালে ধাক্কা খেলেই কেবল এমনটা হতে পারে। তারপরই সম্ভবত মেয়েটিকে মরিয়া ক্রোধের শিকার হতে হয়। পাথর দিয়ে মুখ, গলা ও বুকে আঘাত করা হয়। আঘাতের প্রচণ্ডতায় মেয়েটির ঘাড় সম্ভবত ভেঙে যায়। আর একটু জানা দরকার ধীরের। খুনির মোটিভ বুঝতে বাধ্য হয়েই তাকে অল্প অশ্লীল আগ্রহ দেখাতে হল। লাশের নিম্নাঙ্গের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। মেয়েটি মারা যাওয়ার পরও হত্যাকারীর ক্রোধ প্রশমিত হয়নি। কাপড় যেমন ছিল তেমনিভাবে ঢেকে বাসরাস্তায় ফিরে এল ধীর।

বাস তখনও দাঁড়িয়ে। ধীর ভেবেছিল মাত্র আধ কিলোমিটার দূরে ইদরিনালার উপর পুল পেরিয়ে বাস হয়তো মাচদা চলে গেছে। সবার মধ্যেই চাপা উত্তেজনা। অথচ ছোট ছোট দলে কোনও শলাপরামর্শ তার নজরে পড়ল না। যেন অনেকদিন ধরে যে ঘটনা ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছিল তা ঘটে গেল। ড্রাইভারের এগিয়ে যাওয়ার কোনও গরজ নেই। হিমালয়ের বাসপথে ড্রাইভার আর কনডাকটররা শাহেন-শা। বাসের মাথা থেকে তার রুকস্যাক পিঠে নিয়ে নেমে এল ধীর। অনেকেই বাস ছেড়ে চলে গেলেও যারা ছিল তাদের সবার নজর তার উপর। তবে সে গুরুত্ব দিল না। একা হলেও অনেকদিনের অভ্যাসের ফলে এদের সঙ্গে হিসেবনিকেশ করতে ধীরের অসুবিধে হয় না।

হাঁটছিল ধীর কিন্তু তার পা ঠিক মতো চলছিল না। এই মাচদার কোনও এক ঘরে বা ঝুপড়িতে এক ভয়ঙ্কর খুনি ঘাপটি মেরে বসে আছে, তার মনে হল। অবশ্য সে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতেও পারে। এমনও হতে পাবে বাসরাস্তার জটলার মধ্যে এখনও সে দিব্যি দাঁড়িয়ে, তদারকির কাজে মগ্ন। স্বভাব-শান্ত পাহাড়ি মানুষের মনে আজকাল সমতলের হিংসা জায়গা করে নিচ্ছে। কঠিন ভার তার মনে। ক্রোধ কতটা নির্মম হলে একজন মহিলার শরীর এভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে পারে, ভেবে বের করতে চাইল ধীর। শরীর অবশ হয়ে এল তার। কোনও কূল পেল না। শুরুতেই এমন! হিমালয়ের তা হলে থাকলটা কী!

মাচদায় পৌঁছে গেলে বাঁধনহারা উল্লাসে তার বুক যেমন ভরে যায়, এবার তেমন হল না। এমন একটা ঘটনা ইদরিনালার ওপারে অথচ এপারে সব স্বাভাবিক, শান্ত। যেন সবদিনের মতোই আরও একটা দিন। কারও মধ্যে কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। হঠাৎ হঠাৎ করে মেয়েটির দেহ তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। ধীর গোয়েন্দা নয়; তবু তার ধারণা ঘাতককে উচিত জবাব দিতে মেয়েটি মরিয়া চেষ্টা করেছিল। তার সারা শরীরে সংগ্রামের চিহ্ন। প্রাণ বাঁচানোর জন্য সে চিৎকার করে লোক জড়ো করতে চায়নি। প্রাণ থাকতে সমানে লড়েছিল। তার অনুমান, ওই মরিয়া সংগ্রামের সময় কোনও কিছুর ধাক্কায় সে হঠাৎ পড়ে যায়। সেই সুযোগে ঘাতক তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে। সে কি বাঁচার জন্য প্রাণভিক্ষা করেছিল? ধীর নিশ্চিত, সে তা করেনি। করলে মৃতদেহের আঘাত এত গুরুতর হত না।

আঘাতের প্রচণ্ডতায় মেয়েটি কি ক্রমশ অসহায় হয়ে পড়ে? শরীরে ক্রমাগত আঘাত নিতে নিতে সম্ভবত সে বুঝতে পারে তার মৃত্যু আসন্ন। কেউ যখন বুঝতে পারে তার মৃত্যু কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র তখন কী ঘটতে থাকে তার মনে? বোধহয় জীবনের অপরাহ্ন সে সহসা প্রত্যক্ষ করে। প্রচুর স্বপ্ন, বাসনা, ফেলে আসা পরিতৃপ্তি ও পরিকল্পনা ধীরে ধীরে চুরচুর হতে থাকে পলকপ্রয়াণে।

কলকাতা থেকে বাঁকুড়া যাওয়ার পথে কোনও এক স্টেশনের কাছে ধীর এমন এক পলকপ্রয়াণ প্রত্যক্ষ করেছিল। সে এক বিস্ময়কর ডাকাত ধরার গল্প। পাঁচজনের মধ্যে বাকি

চারজনের কী গতি হয়েছিল তা তার জানা নেই। কিন্তু একজনের কপালে কী ঘটেছিল তা সে খুব সামনে থেকে দেখেছিল। তলোয়ারধারী ক্রুদ্ধ জনতার সামনে এক অতি সাধারণ ডাকাত। অবিকল যেমন এক দিনমজুর, মেহনতি মানুষ। মৃত্যু অনিবার্য মনে হলেও তাকে একবারের জন্যও ভীত মনে হয়নি। তবে সে একটা অনুরোধ করেছিল। যেমন ইয়ার-দোস্তদেরই করা যায়।

"বাবু তুমরা তো আমকে মারেই দিবেক, তার আগে যদি একটা বিড়ি খাতে দাও।"

সামনে দাঁড়ানো চকচকে তলোয়ারধারী মানুষটি কিঞ্চিত সদয় হলেন। তিনি আদেশ দিলেন : 'দে-রে, একটা বিড়ি দে ওকে।'

শুধু বিড়ি দেওয়াই নয়, সেই বিড়ি ধরাতে সাহায্য করতেও এগিয়ে এলেন একজন।

প্রথম টানের সঙ্গে সঙ্গে দানবীয় স্বাভাবিকতায় তলোয়ার চমকে উঠল। ডাকাত মানুষটি তো বটেই, এমনকী যারা এই অভাবনীয় পালা প্রত্যক্ষ করছিল তারাও ঘটনার আকস্মিকতা টের পায়নি। পাওয়া গেল যখন ফিনকি দিয়ে একটা মানুষের মুণ্ড ছিটকে গিয়ে পড়ল! আর কী আশ্চর্য — মুণ্ডহীন কণ্ঠনালী থেকে সেই ধুঁয়ার কুণ্ডলী ভুসভুস কবে বেরোতে না বেরোতেই স্তব্ধ হয়ে গেল! ঘটনার বীভৎসতায় জনতা গুটিয়ে কেঁচো হয়ে পড়ল। পা টিপে টিপে ভীত জনতার হাতে হাত রেখে ধীরও ট্রেনে এসে উঠল। দু'চারটে স্টেশন পার হওয়ার পর এক সাহসী মানুষ কানে কানে বললেন—ওরা কেউই কিন্তু ডাকাত ছিল না।

ধীরের অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। সামান্য ভয় পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই সে জমিয়ে উপভোগ করেছিল। মুণ্ডহীন ধড়ের কণ্ঠনালী থেকে অর্ধসমাপ্ত ধূমপানের ধোঁয়া—চাট্টিখানি কথা!

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মেয়েটিও কি তার ঘাতকের কাছে ডাকাতটির মতো কোনও অনুরোধ জানিয়েছিল? সম্ভবত, না। সমতলের মার্জিত নির্মমতা পাহাড়ি এলাকার ভাবনার সঙ্গে নিতান্তই বেমানান।

আপাং কেনির ডেরা ধীরের অনেকদিনের পাকা আস্তানা। মুদিখানা, কাটা কাপড়ের দোকান, থাকার ব্যবস্থা ছাড়াও খাওয়ার হোটেল জমজমিয়ে চালায় কেনি। সন্ধে একটু গড়ালেই হোটেল শুঁড়িখানা হয়ে যায়। বিস্তর খদ্দের। কেনি না থাকলেও মুখিলাল মজুদ। মুখি কর্মচারি হলেও খুব বিশ্বস্ত। ধীর বিশ্বাস বলতে গেলে তাদের ঘরের লোক। তাই তাকে দেখে মুখির মধ্যে কোনও বাড়তি উচ্ছ্বাস দেখা গেল না। তার মালপত্তর নিয়ে মুখি সটান ভিতরে চলে যায়। গরম চা সামনে রেখে জানতে চায় : "অওর কুছ, দাদা?"

ধীর মুখিকে জানিয়ে দিল, অন্য কিছু লাগবে না। চা হলেই চলবে। চলে যাওয়ার মুখে মুখিকে ডাকল ধীর। কাছে আসতেই তার কাঁধে হাত রেখে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। তার কাছে সে সরাসরি জানতে চাইল।

"আচ্ছা মুখি, নালার ওপারে যে মেয়েটি খুন হয়েছে সে কে?"

মুখি যেন আকাশ থেকে পড়ল। তার মুখ দেখে মনে হল এমন আজগুবি কথা সে এর আগে কখনও শোনেনি।

"খুন! ক্যাযা আপ পাগল হো গ্যায়া দাদা!"

"তা হলে?"

অনর্গল ভাঙা হিন্দিতে তার জবাব জানিয়ে দিল মুখি। বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় : তা হলে আর কী — অভাব, ঝগড়াঝাটি আর তাতে রাগের বশে আত্মহত্যা। এমন কাণ্ড এখানে হরবখত ঘটে। কেন, আপনি জানেন না? ঘটনাটাকে মুখি জলের মতো পরিষ্কার করে দিল। অকারণে ধীরের গোয়েন্দাগিরি। তবে যেটা সে জানতে চেয়েছিল তার উত্তর মুখি দেয়নি। মেয়েটি কে, তা সে বলেনি।

চাসু উপত্যকায় এখন আর সরল মনে সবকিছু ধরে নেওয়া যায় না। চাসু যে তার চোখের সামনেই ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে তা বুঝতে ধীর বিশ্বাসের অসুবিধে হল না। ওখানে আপাং কেনি ছাড়া তার কাছের মানুষ নাংগেল তাফা—অতি সজ্জন ও সম্মানীয় ব্যক্তি। প্রয়োজনে সে নগলি দাকাত-এর উপরও কিছুটা নির্ভর করতে পারে। সবাই সমান না হলেও এরা চমৎকার মানুষ। কোনও বারই উপত্যকার মধ্যে সে খুব একটা থাকে না। মূল উপত্যকায় যাওয়ার জায়গা তেমন নেই বলে প্রায় সবাই অন্যত্র চলে যায়। চাসু ছাড়িয়ে কিছুটা এগোলেই যাওয়ার জায়গা অঢেল। তবে এবার সে চাসুর মধ্যে কিছুদিন কাটাতে চায়। প্রতিবারই দু'এক পিস উদ্ভট লোকের দেখা পায় ধীর। মেজাজ বিগড়ে গেলেও তাকে শান্ত থাকতে হয়। প্রচুর ব্যথা আর আশঙ্কা নিয়ে সেই ঘুরে ফিরে একই জায়গায় আসা। কীসের টানে তা তার কাছে পরিষ্কার নয়। পরিষ্কার হলে তার ভ্রমণ মানচিত্রে চাসুর আর কোনও ঠিকানা থাকবে না, জানে ধীর বিশ্বাস।

চা খেয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল ধীর। যে বাসে সে মাচদা এসেছিল সেটা ফিরতি মুখে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে। খুব ভোরে বাস ছাড়ে তাই তখন থেকেই জায়গা রাখার হুড়োহুড়ি। মাত্র তিন মাস হল বড় বাস মাচদা আসা শুরু হয়েছে। তার আগে বাস পিতসি পর্যন্ত আসত। পিতসি থেকে অবশ্য মাচদা পর্যন্ত জিপ চলত। তখনই একটা জিপ হোটেলের সামনে এসে

দাঁড়াল। জিপ থেকে আপাং কেনি নামতেই তার কাছে গেল ধীর। জিপ থেকে দু'জন পুলিশও নামল। মাচদায় এর আগে কখনও পুলিশ দেখেছে বলে তার মনে পড়ল না।

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কেনি ধীরকে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে গেল। ওই দু'জন পুলিশও তাদের সঙ্গে ঘরের মধ্যে এল। একটু অবাক হল ধীর। পুলিশ দু'জনের মধ্যে একজন অফিসার। চেয়ারে বসে দু'জনই ধীরকে ভাল করে লক্ষ করছিল। এর অবশ্য কোনও কারণ খুঁজে পেল না ধীর। কেনিকে তার কিছুটা উদ্বিগ্ন বলে মনে হল। প্রথম দেখা অথচ ক্যায়সা হ্যায় দাদা, ইস টাইম কীধার জানে কা প্ল্যান বানায় এসব জানতে চাইল না। তবে কেনির কথা থেকে সে জানতে পারল পুলিশ তার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছে। অফিসারটিও খুব একটা স্বস্তি বোধ করছিলেন না। তাই কোনও ভূমিকা না করেই সরাসরি তাঁর প্রশ্নে চলে গেলেন।

"আপনি কি ডেডবডির ঢাকা খুলে দেখেছিলেন?"

প্রশ্ন শুনে প্রথমে অবাক তার পর অসম্ভব বিরক্ত হল ধীর।

"হ্যাঁ, দেখেছিলাম।"

"আপাং কেনি আপনার সম্বন্ধে সব খবর আমাদের দিয়েছেন। আপনি শিক্ষিত মানুষ আপনি জানেন না কাজটা আইনবিরুদ্ধ?"

কাজটা ঠিক নয়, জানে ধীর। ঢাকা খুলে কোনও মৃতদেহ দেখতে হলে তদন্তে নিযুক্ত পুলিশের অনুমতি প্রয়োজন হয়। কিন্তু কোনও মতেই কাজটা আইনবিরুদ্ধ নয়। তা ছাড়া, তার দেখার সময় সেখানে কোনও পুলিশ ছিল না। বুদ্ধি করে প্রশ্ন করলে অফিসারটি তাকে বিপদে ফেলতে পারতেন। তা তিনি করেননি তাই কৌশল করে ধীর কিছুটা আক্রমণাত্মক হতে চাইল।

"কোনও ডেডবডির ঢাকা খুলে দেখা আইনবিরুদ্ধ কাজ নয়। আইনটা আমি ভালই বুঝি। আমি নিজে একজন উকিল।"

মুহূর্তের মধ্যে অফিসারটির মুখের রঙ বদলে গেল। তিনি ধারণাই করতে পারেননি যে তিনি একজন উকিলকে জেরা করছেন। পুলিশ উকিলদের পারতপক্ষে ঘাঁটায় না। কেনি নিজেও জানত না যে তার বাঙালিদাদা এক বকিল হ্যায়। সহজ সুন্দর মানুষ কখনও উকিল হয় নাকি! অন্য দিকে, চাসু উপত্যকায় প্রায়ই ঘুরতে আসা কোনও লোক যে উকিলও হতে পারে জেনে অফিসারটি নরম হয়ে গেলেন। মুখ রক্ষা করার তাগিদে জানতে চাইলেন।

"আইনের কথা নয়তো বাদই দিলাম। মাঝপথে হঠাৎ বাস থেকে নেমে একটা ডেডবডির ঢাকা কেন আপনি খুলতে গেলেন তার তো কারণ থাকবে।"

অফিসারটির প্রশ্নটা বেশ চেপে ধরার মতো। হাসল ধীর। সেই সুযোগে একটা জুতসই উত্তর ঠিক করে নিল।

"আসলে কী জানেন, বাঙালিরা প্রায়ই এদিকে ঘুরতে আসে। যদি তাদের মধ্যে কেউ হয় এমন উদ্বেগ থেকেই ঢাকা খুলে দেখতে হয়েছিল। কার ডেডবডি বলে দিলে খোলার দরকার পড়ত না। বার বার প্রশ্ন করেও উত্তর পাওয়া যায়নি। তাই খুলতে হয়েছিল।"

ধীরকে অবাক করে দিয়ে প্রচুর ক্ষমাটমা চেয়ে অফিসারটি উঠে পড়লেন। হঠাৎ তার মনে হল, পুলিশ যখন ছুঁয়ে গেল তখন আঠারো ঘা হতে কতক্ষণ। তাই একটা পালটা চাল দিয়ে রাখল।

"আরও একটা কথা থানেদার সাব্।"

দরজার সামনে গিয়ে অফিসারটি পিছনে ফিরলেন।

"হ্যাঁ, বলিয়ে?" হিন্দি ভাষায় সৌজন্য ও গালাগালি দুটোই চমৎকার খোলে।

"এমন ঘটনা এখানে আগে ঘটতে দেখিনি। ফেরার সময় এ ব্যাপারে আমি কমিশনার সাহেবের কাছে জানতে চাইব। পত্রকার হিসাবে এটা আমার জানা অত্যন্ত জরুরি।"

অল্প চিন্তা করলেন অফিসারটি। তার পর আপাং কেনির দিকে তাকালেন।

"আপ পত্রকার ভি হ্যায়?"

"হ্যাঁ, আমি একজন সাংবাদিক।"

একটু সময় নিলেন। কী উত্তর দেবেন হয়তো ভেবে নিলেন।

"আপ বেফিকির রহিয়ে। জলদি সে জলদি হম ইস কেস কা বারে সব কুছ পাত্তা কর লেঙ্গে।"

দু'সপ্তাহের মধ্যেই মেয়েটির মৃত্যুর কারণ উনি জেনে যাবেন এমন প্রতিশ্রুতি যে বলার জন্যই বলা তা জানে ধীর। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল। পুলিশকে জানানো গেছে ধীর বিশ্বাস সহজ মানুষ নয়। তার হাত খুব একটা ছোট নয়। পুলিশ জানলে ক্রিমিন্যালরা সঙ্গে সঙ্গেই তা জানতে পারে। ধীর চায় ক্রিমিন্যাল তার পরিচয় জেনে যাক।

মাচদা পৌঁছেই সে যে কাণ্ড ঘটিয়েছিল তা শুনে কেনিকে বেশ চিন্তান্বিত মনে হল। বিশ্বাস দাদা বরাবরই খুব কড়া ধাতের মানুষ জানে কেনি। কিন্তু তবু অযথা ঝামেলায় সে জড়িয়ে পড়তে পারে এটা কেনি ভাবতে পারেনি। ডেডবডির ঢাকা খুলে দাদা কি তাকে ঝামেলায় ফেলে দিল? তার চোখেমুখের অবস্থা কিন্তু তাই-ই বলে।

একটা ব্যাপার ধীরকে সত্যিই খুব ধন্দে ফেলে দিল। ছোট্ট জায়গা মাচদা। সবাই সবাইকে চেনে। বলতে গেলে গ্রামের মাঝখানে একটা মেয়ে বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়ে থাকল অথচ সে নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই! ঘটনা যাই হোক, যে বাড়ির মেয়ে তারা তো শনাক্ত করতে আসবে। তাও এল না। তা হলে কি এমন ধরনের মেয়ে যার মরা বা বাঁচায় কারও কিছু যায় আসে না? মানুষের মধ্যে থেকেও কোনও মেয়ের এমন পরিণতি ভাবতে বেশ কষ্ট হয়। কারও ভয়েই কি মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পিছিয়ে আসছে। এমন ঘটনা সমতলে ঘটে। এখানেও কি সেই একই হাল? চাসু উপত্যকার মানুষ যে দিনে দিনে এত নির্মম হয়ে উঠছে তা কি সে ভাল করে আগে বুঝতে পারেনি?

তার চিন্তার রেশ হঠাৎ কেটে যায়। তার প্রায় গা ঘেঁষে কেউ বসল বলে মনে হল। তাকিয়েই চিনতে পারল। ছেরিং পালকো—আই.টি.বি.পি. ফোর্সে চাকরি করেন। ভাল বাংলা বলেন। প্রায় দু'দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে আছেন। মাস ছ'য়েকের মধ্যে চাকরি থেকে অবসর নেবেন। ছুটি কাটিয়ে সকালের গাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন। বুয়ারাতে পালকো-র বাড়িতে সে একবার রাত কাটিয়েছিল। ভারী চমৎকাব মানুষ।

— খুব কষ্ট পাচ্ছেন, তাই না। একটা যুবতী মেয়ে মারা গেল অথচ এলাকার মানুষেব মধ্যে কোনও প্রতিবাদ নেই!

গায়ে পড়া এমন গার্জেনিতে বেশ বিব্রত বোধ করল ধীর।

— কেন, আপনি কষ্ট পাননি?

— না, একেবারেই না।

— সে কী!

মুচকি হাসলেন ছেরিং পালকো।

— আপনাদের ওখানে তো গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, গরু ছাগলের মতো মানুষকে মেরে ফেলা হয়। গ্রাম ছেড়ে মানুষ জঙ্গলে পালায়। ক'বার আপনি প্রতিবাদ করতে গেছেন?

খুব বিরক্ত হল ধীর। ছেরিং তার অহংবোধের উপর এন্তার ঘুঁষি মারতে উদ্যত। রাজনৈতিক হাঙ্গামা আর ঠাণ্ডা মাথায় খুনকে তিনি এক করে দেখছেন।

— দুটো এক জিনিস নয় ছেরিং সাব্।

— আপনারা খুব বুদ্ধিমান। তফাৎ করতে শিখেছেন। আদর্শের জন্য খুন ঠিক খুন নয়, কী বলেন?

চুপ করে থাকাই শ্রেয় বলে মনে হল ধীরের। ছেরিং নিজেও যে কোনও কারণে ভীত এটা ভাবতে সে বাধ্য হল।

— একটা মেয়ের মৃত্যু নিয়ে আপনার নাটক করার দরকার নেই। আপনি হিমালয়ে ঘুরতে এসেছেন, ঘুরে চলে যান।

— এসব আপনি কী বলছেন!

— বলছি কারণ মানুষই মানুষকে মেরে শেষ করবে এটাই ইতিহাসের বিধান। নিজেকে বাঁচিয়ে কোনও মতে বেঁচে থাকার উপরে আর কোনও আদর্শ নেই এখন, এটা আমি বুঝেছি। আপনি পণ্ডিত মানুষ আপনাকে আর আমি কী বোঝাব।

ছেরিং পালকো ধীরের কাছে বেঁচে থাকার আদর্শ পন্থা বর্তমানে কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় তা বলে গেলেন। বাঙালি দেখলেই এখন অন্যান্যরা এভাবেই গায়ের ঝাল মেটায়। তাদের কাছে বাঙালিরা বোধহয় এখন আর যথেষ্ট পরিমাণ ভারতীয় নয়।

সোনাম চিকু—ইরিকা টোর

প্রচণ্ড আওয়াজে ধীরের ঘুম ভেঙে গেল। মাথার পাশে রাখা টর্চটা হাতে নিয়ে ফোকাস করার আগেই দরজা দু'ভাগ। দু'জন লোক ঘরে ঢুকে ধীরের সামনে চোটপাট করতে থাকল। একজন নেশায় চুর। এত রাতে কেন এমন হাঙ্গামা বুঝতে পারল না সে। স্লিপিং ব্যাগের ভিতর থেকে বেরিয়ে তাকে উঠে দাঁড়াতেই হল। হঠাৎ তাকে ওভাবে উঠে দাঁড়াতে দেখে দু'জন কিছুটা সরে গেল। টর্চ জ্বেলে একজনের মুখের উপর ধরে থাকল ধীর। অল্প হলেও লোকটা যে ঘাবড়ে যেতে পারে জানত সে। এসব বজ্জাতি প্রথমেই চেপে না দিলে পরে আব সামলানো যায় না—বোঝে ধীর। প্রথমেই জানা দরকার, কী কারণে ওরা এত উত্তেজিত।

"ক্যায়া মাঙ্গতে হ্যায় আপলোগ?"

দ্বিতীয় জন টলতে টলতে উত্তর দেওয়ার আগেই অন্যজন তাকে বক্‌সিং করার কায়দায় ঘুঁষি মেরে বসল। ধীর বুঝল এতটা বেপরোয়া স্বভাব যাদের তাদের সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ সারা সম্ভব নয়। উত্তর সে পেয়েই গিয়েছিল।

"তো আপ লড়নে চাহতে হ্যায়?"

হঠাৎ সব চুপ। নীচে পড়ে থাকা লোকটার গোঙানো পর্যন্ত থেমে গেল। ধীরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা ভাবতেই পারেনি একজন পরদেশি তাকে এভাবে চমকে দিতে পারে। ধীরেব কতটা ক্ষমতা সম্ভবত সে যাচাই করছিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে কারও খোঁজাখুঁজির শব্দ পেল ধীর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সারা ঘর আলোয় ভরে গেল। নাইট-ল্যাম্প ধরে এক বিদেশি মহিলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল ঘরটা আগে থেকেই এক মহিলা বুক করে রেখেছিলেন। রাত দশটা পর্যন্ত উনি না পৌঁছানোয় কেনি তাকে রাতের জন্য থাকতে দিয়েছিল। শর্ত ছিল উনি পৌঁছে গেলে ছেড়ে দিতে হবে। ওই মহিলা যে একজন মেমসাহেব সেটা অবশ্য ধীর জানত না।

"আই বুকড্ দিস রুম।"

ঘরটা তাঁর বুক করা সেটা মেমসাহেব জানিয়ে দিলেন। একটু ধাক্কা খেল ধীর কিন্তু প্রকাশ করল না। অতি দ্রুত সব গুটিয়ে বাইরে আসতে চেষ্টা করল। আলো থাকায় তার সুবিধে হল। গোছানো স্যাকটার পাশে দাঁড়াতে যাবে ধীর এমন সময় হুংকার।

"আভি নিকালো তুম ইহাঁসে।"

ধীর বুঝল এমন বেয়াদপকে তখনই সামান্য ইস্ত্রি করে না রাখলে পরে বিপদ হতে পারে। কোনও উত্তেজনা প্রকাশ না করে ধীর লোকটার প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়াল। অভদ্রের সঙ্গে

সুভদ্র আচরণ তার স্বভাবে নেই।

"ক্যায়া বোলা তুম? অওর এক দফে বোলকে দেখো।"

লোকটা মধ্যেকার হিংস্রতা নিমেষে উধাও। সরতে সরতে সে মেমসাহেবের পাশে এসে দাঁড়াল। হিংস্র হওয়ার জন্য যে হাত-পা ছোঁড়ার দরকার হয় না বোধহয় বুঝল সে।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সব স্তব্ধ। সেই সুযোগে সে তার স্যাক, অ্যাক্স ও ন্যাপস্যাক তুলে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। একজন বুনো লোকেব উপর বিরক্ত হয়ে সৌজন্যবোধ ভুলে যাওয়া উচিত নয়। একজন মহিলা হিমালয় ভ্রমণে এসেছেন, তাঁকে তো উইস্ করতেই হয়।

"গুডনাইট ম্যাম!"

কোনও উত্তর পেল না ধীর। অবশ্য না পাওয়ারই কথা। ঘরের মধ্যে যা ঘটে গিয়েছিল তা হজম হতে সময় লাগারই কথা।

দরজার বাইরে তখন জমাট অন্ধকার ও দমকা বাতাস। কেনি তাকে উঠোনের চাবি রেখে দিতে বলেছিল। ধীর নেয়নি। যে ঘরে সে এসে ওঠে সেটায় এলাকার এক মাতাজির ভক্ত উঠেছিলেন তাই যত বিড়ম্বনা। অবশ্য মাত্র এক রাতের ব্যাপার। পুবখোলা উঠোনে দমকা বাতাস কেবল পাক খায়। মাঝরাতের পর সেখানে টিকে থাকাই দায়। ঠাণ্ডায় হিম হয়ে যেতে হয়। এভাবে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হবে জানলে উঠোন খুব একটা মন্দ হত না।

কেরোসিন তেলের খালি ড্রামের পাশে ফোমম্যাট পেতে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাতটা কাটাতে চাইল ধীর। কিছুক্ষণের মধ্যে দমকা বাতাস, ধুলোবালি আর পোকার উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে স্লিপিংব্যাগ থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে হল। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ করে মেমসাহেবের ঘরের দরজা খুলে গেল। একটা মানুষকে আর একজন প্রায় টেনে হিঁচড়ে ঘরের বাইরে নিয়ে আসছিল। নির্মম মনে হলেও এসব এখানে দিনে দিনে খুব স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। পড়ে থাকা লোকটার পাশেই মেমসাহেব হাত-মুখ ধুতে থাকলেন। যে লোকটাব সঙ্গে তাকে টক্কর নিতে হয়েছিল সে মগে করে জল ঢেলে দিচ্ছিল। ঘাড়ের উপর তোয়ালে রেখে ঘরে ঢোকার মুখে মেমসাহেব লোকটাকে গুড-নাইট করলেন। ঘরের দরজা বন্ধ হতেই বাইরে ফের ঘুটঘুট্টি অন্ধকার।

চোখের পর্দায় অন্ধকার জমা হতে হতে কিছুটা ফিকে হচ্ছিল চতুর্দিক। তার চোখে আচমকাই গেঁথে গেল দৃশ্যটা। পড়ে থাকা মানুষটার কাছে কেউ যেন গুটিসুটি মেরে এগিয়ে আসছিল। চুপ করে নজর করছিল ধীর। মানুষটাও লাশ হয়ে যেতে পারে! দ্বিধায় পড়ে গেলেও হাতের কাছে সে অ্যাক্সটা নিয়ে রাখল। ইচ্ছে করেই টর্চটা জ্বেলে দেখল না। একজন

মানুষটাকে তুলে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল, বুঝতে পারল ধীর। একজনের পক্ষে কাজটা বেশ কঠিন। হঠাৎ কান্না। গভীর রাতে কেউ কেঁদে উঠলে সব কেমন যেন ওলটপালট হয়ে যায়। কান্নাটা যদি কোনও মেয়ের হয় তা হলে তো কথাই নেই। সুটপুট করে একটা স্থবির তাপ সহসা অন্যের মধ্যেও ঢুকে পড়তে চায়।

ধীরকে উঠতেই হল। আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতেই মেয়েটি তাকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ জ্বেলে ধরল ধীর। মেয়েটি তার পাট্টু আর ওড়না নিয়ে আলুথালু। তার মনে হয়েছিল এবার বোধহয় তার পালা। নিজেকে বাঁচানোর জন্য সে উবু হয়ে কোঁৎ পাড়ছিল। ধীর তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল।

"ডবো মাত্। ম্যায় কোই ডাকু নেহি। কেনি মেরা পুরানা দোস্ত।"

কাজ হল। কান্না থেমে গেল। উবু হয়ে কোঁৎপাড়াও। ধীর লোকটাকে টেনে তুলতেই মেয়েটি তাকে জড়িয়ে ধরল। ঘরের মানুষ হলেই ওভাবে জড়িয়ে ধরা যায়। সম্ভবত মেয়েটির স্বামী হবে ওই লোকটা।

"আভি তুমলোগ ঘর যাও। রাত বাড় রহা হ্যায়।"

কৃতজ্ঞতায় মেয়েটি মাথা ঝাঁকিয়ে থাকল। তারপর লোকটাকে ধরে এক-পা এক-পা করে রাস্তা ধরে এগোতে থাকল। ঠিক ওই সময় অন্ধকার ফুঁড়ে সেই রাগী লোকটা ওদের সামনে এসে হাজির। ধীর তখন মাত্র কুড়ি ফুট দূরে দাঁড়িয়ে। টর্চ জ্বেলে কিছুটা পথ এগিয়ে দিচ্ছিল। দূর থেকে কাছে এল সে। নিজেদেব ভাষায় মেয়েটিকে ক্রমাগত ধমকে যাচ্ছিল লোকটা। এবং তারই মধ্যে লটকে থাকা লোকটার পকেট হাতড়ে কী যেন খুঁজছিল। লোকটার সঙ্গে একটু আগেই ঝামেলা হয়ে গেলেও সে স্বাভাবিক হতে চাইল।

"ক্যায়া ঢুঁড়তে হ্যায় আপ?"

'আপ' করে যে তাকে ধীর সম্ভাষণ করতে পারে ভাবতে পারেনি লোকটা। উত্তরটাও সহজে পেয়ে গেল ধীর।

"শালে নে মেরা শ'রূপেয়া চুরায়া।"

একশো টাকা চুরি করলে কার না রাগ হয়। একটু ভাবল ধীর। এমন কথা বলা দরকার যাতে মেয়েটিও নির্বিঘ্নে ঘরে যেতে পারে এবং তার সময়টাও নিরুপদ্রবে কেটে যায়।

"আভি ছোড় দিজিয়ে ইনকো। কল আপকা শ' রুপেয়া মিল জায়েগা।"

এমন সময় মেমসাহেবের ঘরের দরজা খুলে গেল। হাঁক পাড়লেন।

"সোনাম!"

বিদ্যুৎ গতিতে সোনাম মেমসাহেবের কাছে দৌড়ে গেল। সেই সুযোগে মেয়েটি লোকটাকে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ধীর তার জায়গায় ফিরে এল। সোনাম আর মেমসাহেব তখনও আলোচনায় ব্যস্ত। আর ঘুমোনোর চেষ্টা করল না ধীর। পশ্চিম থেকে খলখলিয়ে গড়িয়ে পড়া ইদরিনালার মুক্ত ছন্দ শুনে রাতটা কাবার করে দিতে চাইল সে। হঠাৎ সামনে সোনাম! অসম্ভব শান্ত মনে হল তাকে।

"দেখিয়ে শালেনে ক্যায়া কিয়া! ইকি মেমসাবকি ঘড়ি ভি চুরা লিয়া।"

এ সব কথা তাকে কেন বলতে চায় সোনাম বুঝতে পারল না ধীব। পুরো কথা শোনার পর অবশ্য বুঝতে পারল।

"সোনে কি ঘড়ি! ক্যায়া, উসকি কীমত ভি আপ দে দেঙ্গে?"

তা হলে এটা বলার জন্যই সোনাম তার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে চাইল। একশো টাকা দিতে পারলে সোনার ঘড়ির দামই বা সে দেবে না কেন। সোনাম শুধু রাগীই নয়, কৌশল করে কথাও বলতে জানে।

কোনও উত্তর দিল না ধীর। বেয়াদপি ছাঁটার যন্ত্র তার হাতেই ছিল কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে ভেবে সে সংযত হল। তবু শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল।

"ক্যাযা, আপ মুঝে উল্লু সমঝা?"

থ্ মেবে থাকল কিছুক্ষণ। তাবপর মানে মানে সোনাম সবে পড়ল। ধীবের ইদবিনালার কাছে যাওয়ার ইচ্ছেটা হঠাৎ মরে গেল। সে ড্রামের পাশে গিয়ে স্লিপিংব্যাগে ফের আশ্রয় নিল। সোনাম তার মেমসাহেবের দরজার সামনে গিয়ে বসে থাকল। ইকি মেমসাব তাকে গার্ড মোতায়েন করলেন কিনা বোঝা গেল না। অল্প সময়েই ধীরের চরিত্র ধরা পড়ে গিয়েছিল। মেমসাহেবকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

বাহাত্তব ঘন্টা আগে মাকনায় একজনের মন্তব্য হঠাৎ মনে পড়ে গেল ধীরের। এমন অপ্রাসঙ্গিক এবং অপ্রয়োজনীয় মন্তব্যের কোনও প্রয়োজন ছিল না। শুনিয়ে দেওয়া দরকার তাই বলা।

"আপনারা বাঙালিরা উপরচালাকিটা ভালই রপ্ত করেছেন। ঠগ-জোচ্চরদের হাতে আপনারা হেনস্থা হবেন না তো কারা হবে।"

"উপরচালাকি বলতে আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন, বুঝলাম না।"

হাসলেন সুরথ নেগি। পাশে বসা এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিলেন। বিবর্ণ গম্ভীর মুখ। খুব চাপে ছিলেন সম্ভবত। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে বয়স।

"কী ধরনের চালাকি করেছেন ভদ্রলোক?"

"সানকুণ্ড ঘুরতে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। সবাই ফিরে এল কিন্তু উনার স্ত্রী ফিরে এলেন না।"

"মানে!"

ধীরের কথা শুনতেই পেলেন না সুরথ নেগি।

"কেন জানেন?"

"কেন?"

"উনার দুর্বল স্ত্রীব সঙ্গে থাকবে এমন একটা ছেলেকে আমি ঠিক করে দিয়েছিলাম। পাছে বাড়তি দু'শো টাকা বেশি খরচ হয তাই উনি আমার হোটেল ছেড়েই চলে গেলেন।"

"কিন্তু এমন ঘটনা ঘটল কী করে?"

"কেমন করে আবার, যে যার মতো করে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। ফেরার সময়ও তাই। পথ ভুল করে বেপথে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী— পুলিশ চেষ্টা করছে। তবে জীবিত অবস্থায় তাঁকে পাওয়ার সম্ভবনা নেই।"

ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখল ধীর। দুঃখজনক বললে কম বলা হয়। বাইশ বছরের ছেলে ফিরে এল, এমনকী উনিশ বছরের মেয়েও। কিন্তু তাদের মা ফিরলেন না। ছেলে যখন সানকুণ্ডের অসাধারণ দৃশ্যকল্প বর্ণনায় ব্যস্ত তখন জানা গেল তার মা ফিরে আসেনি।

"খুবই দুঃখজনক ঘটনা। তবে ইদানীং বাঙালিদের সঙ্গে আপনারা মাত্রাছাড়া দুর্ব্যবহার করছেন এটাও ঘটনা।"

একটু চুপ করে থাকার পর নেগি মুখ খুললেন।

"তার জন্যও তো আমি আপনাদেরই দায়ী করব।"

"কেন, আমাদেব দাযী কববেন কেন?"

"আগে আপনাবা অন্যায দেখলে প্রতিবাদ কবতেন এখন মেনে নেন। কোনও কিছুব প্রতিবাদ কবতেই আপনাবা ভয পান।"

বছব আট-দশ ধবেই দেখছে ধীব। ঘুবে বেডানো মানুষজন বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হন। এই ভ্রমণপিযাসী মানুষজনেব সত্তব ভাগই বাঙালি। ভাবতবর্ষেব অন্যান্য এলাকাব লোকেবা মনে কবে তুখোড বুদ্ধি থাকলেও বাঙালিবা এমনিতে খুব ভীতু প্রকৃতিব। তাদেব ভূখণ্ডটুকু ছাডা বাঙালিবা যে মানুষ হিসাবে অন্যত্র নস্যি এটা ওবা বুঝে গেছে। তাই সর্বত্র এখন বাঙালিবা তাডা খায, পিছু হটে।

ধীবেব ক্ষেত্রেও ইদানীং এমন ঘটনা ঘটতে শুরু কবেছে। যখন একা থাকে তখন বেশ প্রকট হয। হিমালযেব সর্বত্রই এখন মস্তানি। যে সব মবমী ঘটনা হিমালযপ্রেমীদেব বিববণে লেখা আছে সে সবই আজ নিছক গল্প মাত্র। বাসে, বাস্তায, গ্রামে, স্কুলবাডিতে, পাহাডি মানুষজনেব কাছে পর্যটকেব আব তেমন কদব নেই। সর্বদা চাপে থাকতে হয। সঙ্গে মহিলা থাকলে বিভিন্ন কাযদায উত্যক্ত কবাব চোবাগোপ্তা চেষ্টাও হয। এও এক ধবনেব মস্তানি। আমাব এলাকায আমি শেব। আমাব তোলা তোমাকে দিতেই হবে। না দিলেই দুনিযাব ঝঞ্ঝাট, বিপদ। পর্যটকস্থান ছেডে কিছুটা উপবে উঠলেও সেই একই হাল। লালাজি (দোকানদাব), মালবাহক, অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক, পোর্টাব এজেন্ট সবাই পবিমাণ মত মাংস খুবলে নিতে চায। হিমালযেব প্রতি দুর্নিবাব আকর্ষণেব কাবণ শুধু তাব ৮ প্রকৃতিই নয, সেখানকাব মানুষেব মনোহবা সঙ্গও এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। সবই আজ অস্তাচলে।

এবাব তাকে দেখে আপাং কেনি মোটেই খুশি হযনি। ধীব বিশ্বাস কোনও দিনই তাব খদ্দেব ছিল না। একটা ভালবাসাব সম্পর্ক ধীবে ধীবে তৈবি হযেছিল। কম পযসায পাহাডে ঘোবা একটা লোকেব কাছ থেকে বাডতি পযসা বোজগাবেব ধান্দা কাজে দেয না। অনেকদিনেব পবিচয তাই এডিযে যেতে পাবে না। তা ছাডা আপাং নিজেই নাকি এখন মস্তানিব ঝামেলায জেববাব। কোনও এক গাইড নাকি বেগে গিযে তাব মুখে ছুবিই মেবে দেয। প্রথমেই সে এ ব্যাপাবে তাকে হুঁশিযাবি দিযে বেখেছে।

"একা মানুষ তুমি বিশওযাস দাদা, মনে বাখবে। এবাব তোমাব তেজ কমাও। পাহাডে এখন পদে পদে বিপদ।"

কথা শেষ কবে হেসে ফেলেছিল কেনি। যেন কথাব কথা। কিন্তু ধীব তাব কথায মোটেও আশ্চর্য হযনি। আনন্দ তুলে নিতে আব সে পাহাডে আসে না। পাহাডি পথে শুধু চডাই-উৎবাই কবলেই হয না, বিপদেব মুখে পডাব অনিবার্য সম্ভাবনাও থাকে। কষ্ট, বিবক্তি,

অধৈর্য হওয়ার সম্ভাবনা ছাড়াও থাকে মৃত্যুভয়। ক্লান্ত মানুষ এর ফলে ধীরে ধীরে তার অর্থহীন আস্ফালনের কৌশল ভুলে যেতে পারে। কলকাতার মস্তানিরাজে আজন্ম লালিত কোনও মানুষ এভাবেই একদা ধীর বিশ্বাসে পরিণত হতে পারে। এমন বিশ্বাসের তাড়নাতেই সে হিমালয়ে আসে।

হিমালয়ের ঢালে যে বিপদ হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ায় তা বিলক্ষণ এক প্রকার পরীক্ষা। কতটা সামনে বা পিছনে যাওয়া উচিত তার এক নিরন্তর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ। কিন্তু সেই ঢালে পৌঁছবার আগেও আজকাল প্রচুর বিপদ সামনে এসে দাঁড়ায়। কেনি কোনও ভুল বলেনি। এ সব তাকে মনে রাখতে হয় বৈকি। চাসু উপত্যকায় ঢুকেই সে যা দেখেছে তারপর তাকে অনেক কিছুই স্মরণে রাখতে হয়।

রাত এক সময় সত্যিই ফিকে হয়ে এল। দরজা খুলে মেমসাহেব বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সোনাম জলের ক্যান হাতে তাঁর পিছনে। কিন্তু তাঁর হাতেমুখে জল দেওয়ার কোন বাসনা দেখা গেল না। ইয়া লম্বা টেলিলেন্সের মধ্যে দিয়ে যা দেখেন তাই ফটাফট তুলতে থাকেন। হিমালয়কে বাক্স বন্দি করার এই অভিনব কৌশল ধীরকে আর অবাক করে না। প্রতিটি ভ্রমণের ফ্রেম মানেই এখন ঝলসে ওঠা রঙিন ছবির উড়ন্ত হাউই। কালের সঙ্গে তাল রেখে ইকি মেমসাহেব নিখুঁত নিশানায় তাঁর ডালি সাজিয়ে নিলেন। ধীর তখন ড্রামে হেলান দিয়ে আধশোয়া।

হঠাৎ মেমসাহেবের চোখ পড়ল ধীর বিশ্বাসের উপর। তাঁর চক্ষু স্থির! কয়েক সেকেণ্ড পরই তিনি চোখ সরিয়ে নিলেন। হয়তো ঈষৎ লজ্জাও পেলেন। ধীরকে পিছনে রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ তাঁর হাত দু'টি কোমরে এসে আটকে গেল। তার অবস্থা দেখে লোক জড়ো হয়ে যেতে পারে ভেবে ধীর উঠে পড়ল। চোখ তুলে তাকাতেই সে দেখতে পেল ইকির বুকের মাঝখানে একটি ছোট্ট বাচ্চা। শরীরে তার কোনও পোশাক নেই। নিজের উইণ্ডপ্রুফ দিয়ে বাচ্চাটিকে তিনি ঢেকে রাখতে চান। বাচ্চাটি ফের ধুলোয় হামাগুড়ি দিতে চায়। ইকি রাজি নয়। বাচ্চাটির দস্যিপনার কাছে শেষ পর্যন্ত মেমসাহেবকে হার মানতে হয়। ধুলোয় হামাগুড়ি দেওয়া শিশু দু'কদম যায় আর পিছন ফিরে তাকায়। মেমসাহেবকে তার ঠিক পিছনে দেখে সে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। ইকি এ ছবি তুললেন না কিন্তু ধীর ক্যামেরা ছাড়াই সে ছবি তুলে রাখল।

ইদরিনালার তীর ধরে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াতে গিয়ে তার নজর পড়ে গেল ওপারে। আবছা মনে হল একটা ডেডবডি তখনও সেখানে শোয়ানো। সাদা চাদরে ঢাকা। একটা লাগামছাড়া ক্রোধ তাকে তীরের ফলার মতো হঠাৎ ভেদ করে চলে গেল। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল। চোখ সরিয়ে নিল। বুঝল তার দেখা ডেডবডি তার মনে। জায়গাটা আর পাঁচটা

জায়গার মতোই বোল্ডারে ঘেরা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। ফিরে এল ধীর। কেনির হোটেলে ঢুকতে যাওয়ার মুখে সে থমকে দাঁড়াল। জোর কোলাহলে হোটেল সরগরম। ধীর ঢুকতেই চেঁচামেচি থেমে গেল। মাত্র দু'জন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—সোনাম ও কেনি।

সোনামকে দিনের আলোয় ভাল করে দেখল ধীর। লোকটার মুখে সে পাহাড়ি মানুষের সারল্য দেখতে পেল না। সোজা করে তাকায় না। এমন মানুষ অকারণে ছোঁক ছোঁক করে, মারকুটে স্বভাবের হয়। প্রৌঢ় হলেও শরীরের গঠন বেশ মজবুত। এমন লোক হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে। ওই লোকটার সঙ্গে কাল রাতে তার যা ঘটেছিল সেটা ভুলে যাওয়ার মানুষ সে নয়। পাহাড় বা হিমালয়ে এমন মানুষ সে অনেকদিন পর দেখল। তাও অবস্থা স্বাভাবিক করতে সে এগিয়ে এল।

"ব্যাপার কী, আপাং ভাই?"

খুব বিরক্ত মনে হল আপাং কেনিকে।

"কাল রাতে তুমি কী ঝামেলা করেছ? এখন তো ম্যাডামের কাছে আমাকে তোমার হয়ে ক্ষমা চাইতেই হয়।"

সেই ক্রোধ ফের তার মধ্যে মাথা চাড়া দিতে চাইল। ঠাণ্ডা দৃষ্টি দিয়ে ধীর কিছুক্ষণ সোনামের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর কেনির দিকে। সকালের চা তেতো হয়ে গেল তবু শান্ত থাকতে চাইল ধীর।

"ম্যাডাম তোমাকে কী বলেছেন সেটা কি তুমি আমাকে বলবে?"

কথার মধ্যে হয়তো বেশ জোর ছিল। সোনাম ও কেনি দু'জনই কিছুটা অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। দু'জনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে থাকল।

"কী বলেছেন সেটা তুমি তাঁর কাছে গিয়ে জেনে নিলেই পার।"

ধীর যে হঠাৎ উঠে পড়তে পারে সেটা সোনাম বা কেনি কেউই ভাবতে পারেনি। ধীর বিশ্বাস যে তার তেজ এখনও কমিয়ে ফেলেনি এটা বুঝতে কেনির দেরি হল না। চেষ্টা করেও ধীরকে থামাতে পারল না আপাং কেনি। বেরিয়ে যাওয়ার আগে টেবিলে একটা একশ টাকার নোট রেখে সোনামের দিকে তাকাল ধীর।

"আপকা খোয়া হুয়া শ'রুপেয়া।"

ঠিক যা ভেবেছিল ধীর তাই। ইদরি নালার ধারে নুড়ি পরখ করে দেখছিলেন ম্যাডাম। কিছুটা সময় নিয়ে আস্তে আস্তে ধীর তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ইকি তাকে দেখে একটু অবাক হলেন কিন্তু সৌজন্য বিনিময় করতে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না। সৌজন্য বিনিময়ে ধীর সাড়া

দিল না। সে এসেছিল ক্ষমা চাইতে তা হয়ে গেলেই তার কাজ শেষ।

— ম্যাডাম, আই অ্যাপোলোজাইজ ফর হোয়াট হ্যাপেণ্ড লাস্ট নাইট। ফিল ভেরি ভেরি সরি!

ইকি অসম্ভব অবাক হয়ে গেলেন।

— আরে আরে তুমি এসব কী বলছ! কাল রাতে কী ঘটেছে যে তুমি সবি হচ্ছো, অ্যাপোলজি চাইছ? আমি তো এমন কথা কাউকে বলিনি।

ধীর এবার ব্যাপারটা বুঝে গেল। তবু কথা চালিয়ে গেল। এ সময় দুম করে চলে গেলে খারাপ দেখায়।

— না মানে, কাল আপনি ঝামেলায় পড়েছিলেন। হয়তো ঠিক মতো ঘুমোতেও পারেননি।

— সেটা অবশ্য তুমি ঠিক বলেছ। তোমাকে বের করে দিয়ে আমি বেশ অপরাধবোধে ভুগেছি। আমারই উচিত তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া।

ব্যাটা ধীর, তুই পারিস বটে! মেমসাহেবের মুখ থেকে কায়দা করে আসল কথাটা বের করে নিলি।

— না না, এ নিয়ে আপনাব অন্য কিছু ভাবা ঠিক নয়। আপনি একজন একা মহিলা। আমাকে চেনেন না। আপনাকে তো সতর্ক থাকতেই হয়।

দু'তিন পা করে এগিয়ে পিছিয়ে স্থিব হলেন ইকি। মাটির দিকে অল্প তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন।

— কী জান, সবই পবিস্থিতির উপর নির্ভব করে। আমরা দু'জনেই হিমালয়ে ঘুরতে এসেছি। হিমালয়ে ঘুরতে আসা মানুষ সাধারণত দিগভ্রষ্ট হয় না।

এসব কী বলছেন মেমসাহেব! হিমালয়ে মানুষেরাই আসে। তা হলে . . . !

— হিমালয়ের পবিমণ্ডল কিন্তু এখন আমূল বদলে গেছে। এখন অনেক কিছুই ঘটে যা আগে ভাবা যেত না।

— সোনামও তাই বলে। সে জন্যই হয়তো আমাকে আগলে রাখতে চায়। হি ইজ অ্যা গুড ফ্রেণ্ড।

এবার ধীর সরে পড়তে চাইল। ম্যাডামকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে যাওয়ার মুখে ইকি

ধীরের দিকে সোজাসুজি তাকালেন।

— একটু বসলে কেমন হয়? অনেকদিন পর কথা বলে আরাম পাচ্ছি। তোমার আপত্তি আছে?

ম্যাডামের বডিগার্ড দেড়শ ফুট দূরে চঞ্চল হয়ে পায়চারি করছিল। সোনাম বোধহয় চায়নি মেমসাহেবের সঙ্গে ধীরের আলাপ হোক।

— আপনি কথা বলতে চান এ তো মহা আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু তার আগে বোধহয় সোনামের সঙ্গে আপনার কথা সেরে নেওয়া দরকার।

ধীরের কথা সহজভাবে নিলেন ইকি। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন সোনামকে। ইশারায় কাছে আসতে বললেন তাকে। কাছে আসতে তাকে কিছু নির্দেশ দিলেন। ফিরে যাওয়ার আগে ধীরকে সে আড়চোখে একবার দেখে নিল। প্রচুর সন্দেহ সে দৃষ্টিতে।

— তোমাকে দেখলেই মনে হয় পাহাড়ে ঘোবা মানুষ। আমিও ঘুরতে চাই। সঙ্গত কারণেই আমাদের পরিচিত হওয়া দবকার, মত বিনিময় করা দবকার।

ধীর মোটেই মনে করে না তার মেমসাহেবের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দবকাব। তবু তাকে সৌজন্য দেখাতে হল।

— অবশ্যই। হিমালয়ে পরিচয়ের স্বাদই আলাদা, মনোরম অভিজ্ঞতা।

— তা হলে নামটা জেনে নাও— ইরিকা টোর। নিবাস আপাতত কানাডা।

ধীরের আর ভাল লাগছিল না। কিন্তু তবু আলাপে বাধ্য হচ্ছিল।

— এদিকে বোধহয় আপনি আগেও এসেছেন?

— গত বছরই তিন সপ্তাহ এদিকে ছিলাম। সঙ্গে আমার বয় ফ্রেণ্ড রেক্স সাইডও ছিল। পাহাড়ে ঘোরা ওর ধাতে সয় না। ওর কাছে পুরো ব্যাপারটাই পাগলামি।

— এবার তাই একাই চলে এলেন?

— না, ঠিক তা নয়। গতবারই সোনাম একটা পাস-এর কথা বলেছিল। ওই পথ ধরে ডোলি উপত্যকায় কেউ যায়নি। পাস পর্যন্ত ওর পথ জানা। আমি আগ্রহী হলে ও নিয়ে যেতে চায় জানিয়ে রেখেছিল।

চাসু উপত্যকা থেকে ডোলি উপত্যকাকে আলাদা করে রেখেছে মাতরা রেঞ্জ। সেদিকে কোনও পাস বা গিরিবর্ত আছে বলে ধীর অন্তত শোনেনি। কেমন যেন ব্যাপারটা।

— পাসটা ঠিক কোথায়? মাতরা রেঞ্জের উপরে নিশ্চয়?

— হ্যাঁ, ঠিক তাই। ঠিক পাস হয়তো নয়, কোনও ডিপ্রেশন। সোনাম খুব দক্ষ গাইড। ওই ডিপ্রেশন ধরে ওঠা ওর পক্ষে হয়তো অসম্ভব নয়।

স্থির হয়ে গেল ধীর। এই নিয়ে চাসু উপত্যকায় তার সাতবার আসা হল। প্রথম তিনবার শৃঙ্গ আরোহণ অভিযান এবং পরের তিনবার ট্রেক করার অভিপ্রায়ে তাকে আসতে হয়েছিল। এবার নিছকই উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে। চাসু উপত্যকার ভূ-বৈচিত্র নিয়ে একদা সে কিছু পড়াশোনাও করেছিল। চাসু থেকে ডোলি উপত্যকা যাওয়ার পায়ে চলা পথ চাসুনালা ধরে দক্ষিণ থেকে উত্তর বরাবর। তারপর ওই পথ পূর্বে বাঁক নেয়। শেষ এক কিলোমিটার চড়াই ভেঙে উঠলেই ছড়িয়ে থাকা ডোলি গ্রাম। মোট পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পথ। জাতি ও বর্ণভেদে ডোলি চারটি ভাগে বিভক্ত। ডোলির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। মাতরা রেঞ্জ টপকে ডোলি পৌঁছানোর কোনও ভিন্ন পথ খুঁজে বের করা এক অভাবনীয় ব্যাপার। কিন্তু ওই বরফ ও পাথরের ঢাল ধরে প্রায় আঠারো হাজার ফুট উচ্চতায় ইরিকা টোর কতটা স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন, ভাবছিল ধীর।

— তুমি হঠাৎ চুপ করে গেলে। কারণটা কি জানতে পারি?

তবু তার মুখে কিছুক্ষণ কোনও উত্তর এল না। ধাঁধায় পড়ে গেল ধীর।

— গতবার সোনামের সঙ্গে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

— তেমন কোথাও না। তবে ইটুনালা ধরে আলাপানি পর্যন্ত গিয়েছিলাম। সেখানে এক সপ্তাহ কাটিয়েও ছিলাম। দারুণ জায়গাটা।

— জায়গাটার উচ্চতা কেমন হতে পাবে বলে আপনার মনে হয়?

— প্রায় বারো হাজার ফুটের মতো। তবে বেশ ঠাণ্ডা। বাতাসও খুব।

ধীরকে একটু ভাবতেই হল। সোনামের সঙ্গে ইরিকা মাতরা রেঞ্জ টপকে যে ডোলি উপত্যকায় পৌঁছতে চায় এটা পরিষ্কার। যে পাস বা ডিপ্রেশনের কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই তার প্রতি এমন আকর্ষণ ইরিকার পক্ষে বেমানান। যুক্তি তা বলে না। কোনও কিছু আবিষ্কার করা পাহাড়ে ঘোরা মানুষের কাছে প্রত্যাশিত। কিন্তু ইরিকার যোগ্যতা সম্বন্ধে ধীরের তেমন ধারণা নেই। সোনাম বলেছে তাই কানাডা থেকে দুম করে চলে এলাম— কথার মধ্যে খুঁত প্রচুর।

— তুমি কিন্তু হঠাৎ থেমে যাও। কী ব্যাপার বল তো?

— ভাবছিলাম মাতবা রেঞ্জ আপনারা কতটা চেনেন। জায়গাটা কিন্তু খুব সহজ নয়।

আপনাদের পরিকল্পনাটাই বা কেমন।

— ওই দিকে কি তুমি আগে গিয়েছ?

— সেভাবে যাওয়া হয়নি। মাতরা নালা ধরে বছর তিন আগে অবশ্য কিছুটা এগিয়েছিলাম। পরে আরও একবার। তাকে ঠিক যাওয়া বলা যায় না।

— তোমার কি মনে হয় ওই ঢাল ধরে আমি যেতে পারি?

অনভিজ্ঞের মতো কথা। একটা মোরেন রিজের উপর দাঁড়িয়ে সে চারদিকে তাকিয়ে দেখেছিল। আবছা মনে পড়ে। দুটো হিমবাহ কোথাও এসে মিশলে একটা ছন্নছাড়া কাণ্ড ঘটে। মাতরা রেঞ্জের তলায় চলার সময় তাই সতর্ক থেকে পথ বের করে নিতে হয়। শক্ত বরফ ও পাথরের উপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কৌশল রপ্ত করতে হয়। শুধু হাঁটতে পারার যোগ্যতা ওই ঢালে মোটেও যথেষ্ট নয়। ইরিকা কতটা পারেন তার ধারণা নেই। স্বভাবতই ইরিকার প্রশ্নের উত্তরও তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

— সোনাম আপনাকে পাহাড়ে দেখেছে। এলাকাটাও তার পরিচিত। তাই সোনাম ছাড়া অন্য কেউ এর উত্তর দিতে পারে না।

খুব বিরক্ত হলেন ইরিকা টোর। তাঁর কথায় অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল।

— তোমার নাম ও সাকিন কিন্তু এখনও তুমি বলনি।

কালবিলম্ব না করে ধীর তার নাম ও ঠিকানা জানিয়ে দিল।

— দেখো ধীর, তোমার মতো অভিজ্ঞ না হলেও আমারও পাহাড়ে ঘোরার অভ্যেস আছে। বিশ বছর বয়স থেকেই আমি পাহাড়ে যাই। বরফ বা রক কী জিনিস আমি জানি। হিমবাহে ক্যাম্প করে থাকার অভিজ্ঞতাও আমার আছে। এলাকাটা তুমি দেখেছ। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে তবু তুমি সোনামকে দেখিয়ে দিলে!

এমন ছেলেমানুষী বোধহয় মেমসাহেবদেরই মানায়। তবে সোনাম যে ম্যাডামের বেশ দুর্বল জায়গা এটা সে বুঝে গেল।

– এখনও আমি তাই-ই বলব ম্যাডাম। সোনামই সেটা ভাল বলতে পারে।

উঠে পড়তে গিয়েও উঠলেন না ইরিকা। মুখচোখ তাঁর হঠাৎ রক্তবর্ণ হয়ে গেল। বেশ ঘাবড়ে গেল ধীর। কী এমন ঘটল যে ম্যাডাম এতটা বদলে গেলেন? কারণটা সে কিছুতেই বুঝতে পারল না।

— আর যাই হোক তুমি সোনামের মতো সাধারণ মানুষ নও। অথচ সোনামের ভূত

তোমার ঘাড়ে চড়ে বসল। কী ব্যাপার বল তো?

কী উত্তর দেবে ধীর ভেবে পেল না।

— সোনাম সাধারণ মানুষ হলেও সে সাধাসিধে। তার কথাবার্তা বা ব্যবহার তোমার মতো ঝকঝকে নয়। তোমার তাকে অপছন্দ হওয়াই স্বাভাবিক।

চুপ করে থাকল ধীর। ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে দেখারও ভরসা হল না তার।

— ইচ্ছে ছিল না বলার। তবু না বলে পারছি না। গতরাতে তুমি সোনামের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছ। মনে রেখ, ও পাহাড়ি মানুষ। একটু জংলি প্রকৃতির। ক্ষেপে গেলে কিন্তু বিপদে পড়তে পার।

ধীর বিশ্বাসের মুখে কোনও কথা ফুটল না। বিশ্বাসই করতে পারল না সে, এই সেই মহিলা যিনি কিছুক্ষণ আগে ধুলো মাখামাখি একটি বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তার সঙ্গে অত্যন্ত সুভদ্র আচরণ করেছিলেন। হনহন করে এগিয়ে যাওয়া ইরিকা টোর-এর দিকে ধীর অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

আপাং কেনি

নিজের উপর ভয়ঙ্কর বিরক্ত হল ধীর। চাসু উপত্যকায় পা রেখেই সে মানুষজনের ক্ষোভের কারণ হয়ে পড়ছে। এমন তো এর আগে কখনও হয়নি। সুন্দর ব্যবহারের সুবাদেই সে মানুষের কাছে চলে আসে। এবার তার হলটা কী ! ইরিকা টৌর পছন্দ করেন এমন দু'চারটে কথা অনায়াসেই সে বলতে পারত। উলটে সে যুক্তির পথ ধরে মাষ্টারি করে গেল। ঘটনাটা তাকে অবাক করলেও তার অস্বস্তি কাটল না। একই সঙ্গে একটা ব্যাপার তাকে বেশ ধন্দে ফেলে দিল। সোনাম সম্বন্ধে ইরিকা তাকে হঠাৎ কেন সতর্ক করে দিতে চাইলেন, এটা তার কাছে রহস্য থেকে গেল। তার ধারণা সোনাম কিছটা বদরাগী, সহজেই রিয়্যাক্ট করে। সোনাম যদি সত্যিই দক্ষ গাইড হয় তা হলে তো তার মধ্যে প্রচুর শিক্ষণীয় বস্তু থাকার কথা। হিমালয়ের বন্ধুর পথে দাঁড়িয়ে যাঁরা সঠিক পথের সন্ধান দেন তাঁরা অসামান্য মানুষ। দক্ষ গাইড বললে তাঁদের সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। নিজের প্রাণ বাজি রেখে তাঁরা অন্যদের সুরক্ষিত রাখতে সর্বদা চেষ্টা করে থাকেন। অথচ এমন একজন মানুষ সম্বন্ধে ইরিকা তাকে প্রায় শাসানি দিয়ে গেলেন। একটু ধন্দে তো পড়তেই হয়।

যে পাথরটার উপর ইরিকা বসেছিলেন সেটার দিকে তাকিয়ে দেখল ধীর। একটা ছোট্ট কাগজের টুকরো দুমড়ে পাথরের নীচে কেউ ফেলে গিয়েছিল। তুলে ভাঁজ খুলে দেখল তাতে কারও সম্বন্ধে ইরিকা তাঁর অভিমত লিখে রেখেছিলেন। মানুষটা খুব সাহসী, দৃঢ়চেতা ও আগ্রহ উদ্রেক করতে সমর্থ। ইংরাজির বাংলা করলে মোটামুটি তাই-ই দাঁড়ায়। কিন্তু সেই মানুষটা কে? সম্ভবত সে নিজে। তাঁর অভিমত বদলে যাওয়ায় ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অর্থাৎ গোঁসা হলেই কিল মারতে পারেন।

ইদরিনালার বহতা জলরাশির নরম রোদ্দুরে সে কী হিল্লোল! বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেদিকে তাকিয়ে থাকল ধীর। সুন্দর আমেজে মনটা তার ভরে গেল। চোখেমুখে জল দিয়ে বিলকুল ফ্রেস হয়ে গেল। চায়ের তেষ্টা মেটাতে সে আস্তে আস্তে বালি ও পাথর ছড়ানো তীর ধরে রাস্তায় উঠতে পা বাড়ালো। ইদরি নালার বেড় টপকে রাস্তায় উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ধীর। কী যেন একটা পাথরের ফাঁকে চিকচিক করছিল। নিচু হয়ে দেখে একটা লেডিস ঘড়ি। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকার সময় হয়তো ঘড়িটা পড়ে যায়। ঘড়ির মালিক সম্ভবত টের পায়নি। ম্যাডামের ঘড়ি হঠাৎ উধাও হওয়ায় সোনাম সেই লোকটাকেই চোর সাব্যস্ত করে ফেলে।

মুখির কাছে চা পেল বটে তবে ফাও হিসাবে আরও কিছু অভাবনীয় প্রাপ্তি ঘটে গেল। ধীর হোটেল ছেড়ে ম্যাডামের কাছে ক্ষমা চাইতে যাওয়ার পরেই কেনি মুখিকে কিছু নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল। এক, বিশওয়াস দাদাকে কয়েক দিনের জন্য সে আপাতত হোটেলে থাকতে দিতে পারছে না। দুই, বন্ধু মানুষ দাদা তাই তার থাকার জন্য সে আশ্রমে বলে ব্যবস্থা করে

দেবে। দাদা যেন কিছু মনে না করে।

মুখির কথায় জানতে পারল ধীর যে সোনামের পুরো নাম সোনাম চিকু। এ তল্লাটে বেজায় দাপট তার। প্রায় সবাই তাকে সমঝে চলে। কেনির ধারণা সোনামের সঙ্গে ধীর বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে। অন্যদের মতো কেনিও চিকুকে খুব ভয় পায়। ব্যবসাদার মানুষ কোনও মস্তানকে চটিয়ে ব্যবসা করতে পারে না। কেনির মুখে ছুরির আঁচড় নাকি চিকুরই আঁকা। তার কোনও ক্ষতি হতে পারে এই আশঙ্কায় কেনি ধীরকে এড়িয়ে যেতে চায়। প্রথমে পুলিশ পরে চিকু-মেমসাহেব সবার সঙ্গেই তার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার অভ্যাস তাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। চিকু মূর্তিমান বিপদ, মেমসাহেব রোজগারের খনি। শুকনো বন্ধুত্বের জন্য সে তো এদের চটাতে পারে না। খাঁটি কথা। কিন্তু একজন দক্ষ গাইড যে এমন মস্তানিও করতে পারে এটা তার জানা ছিল না।

আপাং কেনির হোটেলে ধীরের থাকার মতো জায়গা হবে না এটা তাকে সত্যিই ভাবিয়ে তুলল। কেনির হোটেল ছাড়া অন্য কোথাও থাকার কথা সে কখনও ভাবেনি। এত বছর ধরে যার সঙ্গে বন্ধুত্ব, পরিচয় ও লেনদেন সে হঠাৎ তাকে এমন অস্বস্তিতে ফেলে দিতে পারে এটা তার মাথায় আসেনি। কেনি ছাড়া সে গিয়ে উঠতে পারে তার গুরু নাংগেল তাফা-র কাছে। নাংগেল থাকে লুনি গ্রামে। মাচদা থেকে দক্ষিণে প্রায় চড়চড়ে চড়াই ভাঙার পর পরে বুয়ারা। সেখান থেকে সহজ ঢাল ধরে আরও দু'কিলোমিটার গেলে পড়ে লুনি। খুব সম্মানীয় মানুষ হলেও নাংগেল তাফার কোনও সামাজিক প্রভাব নেই। এত চমৎকার মানুষ ও হিমালয় পথের দক্ষ গাইড খুব কম দেখা যায়। কয়েক বছর আগে একটা দুর্ঘটনায় তিনি আহত হন। তার পর থেকে তিনি আর পাহাড়ে যেতে চান না। ফলে চাসু উপত্যকায় এসে তাকে এখন অন্য মানুষ খুঁজে নিতে হয়। যারা নিছক মালবাহক মাত্র। নাংগেলজির কাছে গিয়ে পৌঁছালে তিনি আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়বেন ঠিক কথা। কিন্তু তিনি কেনির প্রতি রুষ্টও হবেন যেটা ধীর চায় না।

বাকি থাকল নগলি, নগলি দাকাত। ধীর তার কাছে গিয়ে হাজির হলে সে প্রচণ্ড খুশি হবে। একা একজন পরিচারিকার সঙ্গে থাকে নগলি। অত্যন্ত সুন্দর মনের মানুষ বলেই ধীর নগলির কাছে বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করে। তবু তার জীবনধারা ও কাজকর্ম প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। এলাকার মানুষজন তাকে ভাল মেয়ে বলে মনে করে না। তার নাকি চরিত্র খারাপ। অথচ ধীর কখনও তার মধ্যে কোনও খারাপ বস্তু দেখেনি। মুখটা খুব ভাল নয়। কাউকে সে রেয়াত করে কথা বলে না। চাসু উপত্যকার মতো জায়গায় একজন মেয়ে এমন দাপট নিয়ে থাকতে পারে বিশ্বাস করা যায় না। তবু তার ঘরে গিয়ে রাত্রিবাস করা একটা বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার।

ধীর অবশ্য ভোরের গাড়িতে ফের মাকনা ফিরে চলে যেতে পারে। তার কাছে সেটা হবে ভয়ে পিছিয়ে যাওয়া। তেমন ধাতের মানুষই নয় ধীর। হঠাৎ তার সামনে আলু পরটা

রেখে গেল মুখি। তার একটু পরেই চা। লোক কম ছিল তাই তার পাশে বসে পড়ল মুখি। খুব করুণ মুখ। দাদাজির সঙ্গে তার ভাই সাহেবের এত দোস্তি তবু তাঁর হোটেলে থাকার মতো জায়গা নেই এটা হয়তো সে মেনে নিতে পারছিল না।

"দাদাজি আপ ধামপে মাত যাও। কোই দুসরা জগহ ঢুঁড়ো।"

ধাম অর্থাৎ আশ্রমে ধীর যাক এটা মুখির ইচ্ছে নয়। অন্য কোনও জায়গায় যাওয়ার পরামর্শ দিল সে। তবু ওই ধাম সম্বন্ধে ধীর আগ্রহ প্রকাশ করল। আশ্রম জায়গাটা কেমন জানতে চাইল সে।

"ইয়ে ধাম ক্যায়সা জগহ মুখিলাল?"

তারপর আর তাকে থামানো গেল না। বাইরের লোক মুখিলাল। তার কোনও রাখঢাক নেই। যাতে কেউ শুনতে না পায় তেমনভাবে সে বলে গেল। আশ্রমকে সবাই বলে সানজিধাম। ওই ধামের আরাধ্য দেবী হলেন সানজিমাতা। মুখি তাঁকে মোটেই দেবী বলে স্বীকার করতে চায় না। তার নাকি অসম্ভব তেজ, বেজায় অহঙ্কারী। তার প্রশ্ন, দেবী-মহাত্মারা কি কখনও এমন হন? মাচদা থেকে ইটু যাওয়াব পথে চাসু ছাড়িয়ে সামান্য উপরে উঠলেই আশ্রমে পৌঁছে যাওয়া যায়। কেউ বলে আশ্রম, কেউ বলে সানজিমাতার মন্দির। মাতা সশরীরে অধিষ্ঠান করেন আশ্রমে। উপত্যকার মানুষজন সানজিধাম ও সানজিমাতাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করে। তাঁর আদেশ সর্বদা মান্য বলে গণ্য হয়। তার হেরফের হওয়ার কোনও উপায় থাকে না। গত বছরই কী একটা কাবণে নাকি সানজিমাতা ইরিকার সাহায্য চান। তার পর থেকেই দু'জনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। পাহাড়ে ঘোরার জন্য সোনামকে সঙ্গে নেওয়ার পরামর্শ ইরিকাকে নাকি তিনিই দেন।

ধীর বিশ্বাস হঠাৎ ওই সানজিদেবী সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠল। যাঁর আদেশ সর্বদা শিরোধার্য তিনি মোটেই হেলাফেলার মানুষ নন। এমন দেবীর সঙ্গে সোনাম চিকুর পরিচয়ই বা কীভাবে? চাসু উপত্যকায় এতদিন ধরে তার যাওয়া-আসা তবু আশ্রম যে এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান সে কথা তো কেউ তাকে বলেনি। এমনকী নাংগেলজির মুখেও সেকথা সে কখনও শোনেনি। এর আগে সোনামের নামও সে শোনেনি। এত দক্ষ গাইড অথচ তার কানে আসবে না। সেটা কী করে হয়!

আচমকা ঝড়ের বেগে সোনাম চিকুর প্রবেশ। চেয়ারে বসে সে নির্দেশ পাঠাল।

"মুখি তেরা বাপকে লিয়ে এক কাপ গরমাগরম চায় লাগা।"

মুখি তোর বাপের জন্য এক কাপ গরম চা পাঠা। বেয়াদপির বহর দেখার মতো। ধীব উঠে পড়ার সময় তাকে দেখতে পেল সোনাম। হঠাৎ অস্বস্তিতে পড়ল সে। উঠে সে ধীরের

পাশে এসে বসল। কেঁচোর মতো হয়ে মুখি সোনামের সামনে গরম চা রেখে গেল।

— নমস্তে সাব্!

এমন সুভদ্র আচরণে সে একটু অবাকই হল। তবে সৌজন্য বিনিময় করতে সে-ও সময় নিল না।

— নমস্তে সোনাম ভাই!

—শুনা হ্যায় আপ বহত পহেলেসে ইস তরফ আ রহা?

অনেকদিন ধরে ধীর যে এদিকে আসছে সে খবর তা হলে সোনামের কাছে পৌঁছে গেছে।

— আপনে ঠিকহি শুনা। মগর আপসে মুলাকাত কভি নেহি হুয়া।

এতদিন ধরে এলেও এবারই যে তার সঙ্গে ধীরের প্রথম দেখা এটা জানিয়ে বেশ আরাম পেল সে। অস্বস্তি কাটাতে সময় নিল সোনাম।

— পহেলে ম্যায় দুসরা সাইড থা। সিৃফ দো সাল ইধার আয়া।

মাত্র দু'বছর চাসুতে এসে উঠেছে। ধীরকে সে জানবেই বা কী করে। অকারণে মনে হলেও ধীর নাংগেল তাফা-র নামটা টেনে আনল।

— নাংগেলজি মেরা গুরুজি হ্যায়। ম্যায় উনকা বাত বহত মানতে।

স্থির দৃষ্টি নিয়ে তাকে সমানে পর্যবেক্ষণ করে গেল সোনাম। তার পর মুখ খলল।

— তো আপহি হ্যায় ওহ্ আদমি?

কথাটা বলেই হেসে ফেলল সোনাম। হিন্দিতে 'আপনিই তা হলে সেই লোক' অর্থে কী বোঝাতে চাইল সোনাম ধরতে পারল না ধীর। তাহলে সে কি ধীরের নাম আগে কারও কাছে শুনেছিল। ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা ঠিক কী ধীর আর জানতে চাইল না। তবে এটা বুঝল, তাকে সোনাম নামে চেনে। দেখল এই প্রথম। অনেক কিছু ঘটে যাওয়ার পর রতন শেষমেষ রতনকে চিনতে পারল।

— কৌনসি সাইড জায়েঙ্গে আপ?

কোন দিকে সে এবার ঘুরতে যাবে সোনাম জানতে চায়। ধীর সে সব ঠিকই করেনি। এই অবস্থায় সেদিকে তার মনও নেই। তবু কিছু একটা বলতে হয়। হঠাৎ তার সাচ্চুধুরা বলে একটা জায়গার কথা মনে পড়ে গেল।

— সাচ্চুধুরা। আপ গ্যায়া হোগা সায়েদ?

— আরে সাব্, মাত যাও। পত্থর গিরনেকা খতরা হ্যায় উঁহা।

এত নামডাক অথচ পাথর পড়ার ভয়ে কাবু! অবাক হল ধীর। কেন জানি মনে হল তার এসব শোনা কথা। সাচ্চুধুরায় যায়নি সোনাম। হঠাৎ এমন একটা প্রসঙ্গ নিয়ে এল সে যার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

— মেমসাব আপসে থোড়া নারাজ হো গ্যায়ি। বাত ক্যায়া সাব্?

ইরিকা টোর যে তার উপর কিছুটা ক্ষুব্ধ সেটা তা হলে জানে সোনাম। ব্যাপারটা জেনে নিতে চায়। কিন্তু তাতে তার লাভ। খুব আগ্রহ নিয়ে উত্তরের অপেক্ষায় ছিল। ঠিক কথাটাই বলতে চাইল ধীর।

— ইস তরফসে আপ দোনো ডোলি জানেকা প্ল্যান বানায়। ম্যাডামনে মুঝে পুছিথি, ক্যায়া ম্যায় উস রাস্তেসে যা স্যাকতি?

এদিকে দিয়ে ডোলি যাওয়ার প্ল্যান হয়েছে সেটা ধীর যে জানে এটা চিকুকে জানিয়ে দিল সে। ম্যাডাম ওই পথে যেতে পারেন কি না এটাও যে তিনি তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন সেটাও বলে দিল সে সোনামকে। সব শুনে সামনের মানুষটা বেশ অস্থিব হয়ে পড়ল। কেন এমন হল সেটা বোঝা গেল না।

— ক্যায়া বোলা আপনে?

— ম্যাযনে বোলা ইয়ে জবাব স্রিফ চিকুভাইনে দে স্যাকতা।

ওই পথে ম্যাডাম যেতে পারেন কি না তার জবাব একমাত্র চিকুই দিতে পাবে এটা শুনে সোনামের দমবন্ধ ভাবটা কেটে গেল।

— আপনে তো সহি জবাব দিয়া।

— সায়েদ মেরা জবাব উনকি পসন্দ নেহি হুয়ি। ইস লিয়ে থোড়া নারাজ হো গ্যাযি।

হো হো করে হেসে উঠল চিকু। প্রাণখোলা হাসি, মানতেই হয়। তাব পব যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল সে। কথায় কথায় তার দুরবস্থার কথা ভুলে গিয়েছিল ধীর। আবার সেই চিন্তা তার মাথায় পাক দিতে থাকল। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা মানুষের কথা মনে পড়ল তার—দিরাং লাকা।

তার হোটেলে থাকার জায়গা নেই তাই দিরাং-এর ঘরে ধীর চলে যেতে পারে এটা কেনি স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। দিরাং নেশাগ্রস্ত, অলস ও সর্বঅর্থে এক 'ফালতু আদমি'।

তার ঘরে বিশওয়াস দাদা—না , কোনও মতেই সেটা সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা দিরাং কেনির ভৃত্য, পরিষ্কার যাকে বলে কেনা গোলাম। পাহাড়ে, বিশেষ করে হিমালয়ে জাতপাত ও অর্থনৈতিক অবস্থার নিরিখে মানুষের দাম নির্ধারিত হয়। ওই বিচারে সে কোনও মানুষই নয়।

সরল মানুষ, অসম্ভব দুঃখী মানুষ দিরাং। মদের নেশায় প্রতিনিয়ত তার সর্বস্ব লুট হতে থাকে তবু তার হুঁশ থাকে না। পরনির্ভরশীল ও দুর্বল মানুষের মধ্যে আত্মসম্মান গড়ে ওঠার সুযোগ কম। আসলে দিরাং লাকা একটা গোটা মানুষই হতে পারেনি। না হোক, তবু ধীরের কাছে সে দারুণ মানুষ।

প্রথমেই ধীর তার জিনিসপত্র বাইরে এনে রাখল। খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মুখি সে দিকে নজর দিতে পারেনি। অবশ্য তার করারও কিছু ছিল না। রাস্তার অন্য দিকের একটা দোকানে চায়ের অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করার সময় সে কেনিকে দেখতে পেল। চা হাতে নিয়ে ধীর চুমুক দিতে থাকল। কেনি তার সামনে এসে দাঁড়াতেই কিছুটা দূরে সে ইরিকা ম্যাডামকে দেখতে পেল। কেনি জানতে চাইল।

— এখানে চা খাচ্ছো! কেন আমার হোটেলে কি চা নেই?

কোনও উত্তর দিল না ধীর। এমনকী তার মুখের দিকে তাকিয়েও দেখল না। চা শেষ হতেই ইরিকা সামনে এসে দাঁড়ালেন। সকাল বেলায় তিনি যে ধীরকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন সেটা বোঝা গেল না। খুব সহজ মনে হল তাঁকে।

— কয়েকদিনের জন্য মি. কেনির হোটেলের দুটো ঘরই আমার লাগছে। তাই সানজিধামে তোমার থাকার ব্যবস্থা করে এলাম। দুঃখিত ধীর, তোমাকে অসুবিধায় ফেলে দিলাম।

যে কথাটা কেনি নিজে বলতে পারছিল না সেটাই ম্যাডামকে দিয়ে বলিয়ে নিল। ওই দুটো ঘর তৈরি হওয়ার আগে ধীর যেখানে থাকত ধীর এখনও সেখানেই থাকে। কেউ থাকলে অন্য কথা। ম্যাডাম সেটা জানেন না। তাঁর মন রাখতেই হিসাবটা হঠাৎ বদলে গেছে। তা হোক, তার হাতে সময় কম। জ্যাকেটের পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে ধীর ইরিকার সামনে ধরল।

— দেখুন তো ঘড়িটা আপনার কি না।

ইরিকা অবাক হলেন। তাঁর চোখে মুখে শিশুসুলভ চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল।

— হ্যাঁ আমারই তো। কিন্তু তুমি কোথায় পেলে?

— রাস্তা থেকে ইদরিনালার বেড়ে নামাব মুখে, বালিতে পড়ে ছিল।

— তবে যে সোনাম বলছিল, ওই লোকটা চুরি করেছে।

ধীরের কানে কোনও কথা গেল না। চায়েব দাম দিয়ে রাস্তার ওপাশে গিয়ে পিঠে স্যাক তুলে নিল। খুব খাবাপ লাগছিল তবু মনটা শক্ত করে রাখল। হঠাৎ মুখিলাল দৌড়ে এসে তাকে খেয়ে যাওয়ার অনুরোধ করল।

— কাঁহা জা রহা দাদা। কমসে কম কুছ খা কে তো জাইয়ে।

মুখির পিঠে হাত রাখল ধীব।

— মুঝে বিলকুল ভুখ নেহি লাগ রহা। মেরা খানা তুম খা লেনা।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মুখি। তার মনিবের এত কাছের মানুষ হয়েও বাঙালিদাদাকে যখন হোটেল ছেড়ে যেতে হয় তখন তারও অবাক লাগে। দু'কদম এগিয়ে আপাং কেনি ও ইরিকা টোর-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ধীব।

— আপনাদের ধন্যবাদ। অন্য কোনও সময় সানজিমাতাকে আমি প্রণাম জানিয়ে আসব। কাল সকালেই মাচদা ছাড়ব। তাই আশ্রমে আর যাচ্ছি না।

দু'জন হতবাক মানুষকে পাশ কাটিয়ে বড় রাস্তা ধরে অল্প উত্তরে গিয়ে পশ্চিমের ঢালে ধীব চড়াই ভাঙতে এগিয়ে গেল।

দিরাং - বিনতি

দিরাং- এর ঘর মাচদার বড় রাস্তা থেকে অনেকটা উপরে। প্রায় দশ মিনিট চড়াই ভেঙে উঠতে হয়। ভারী বোঝা পিঠে নিয়ে ধীরের সম্ভবত একটু বেশিই লেগেছিল। উত্তর প্রান্তের শেষ বাড়ি তার চেনা। ঘর বলতে এক টুকরো বারান্দা আর মাঝারি সাইজের একটা ঘর। পাথরের দশ-বারোখানা সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠতে হয়। ঢালের মাঝখানে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে আবার চড়াই ভাঙতে থাকে ধীর। মিনিট পাঁচ পর দিরাং-এর ঘরের খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ায় সে। পশ্চিমে খাড়া পাথরপ্রাচীর। পূর্বে চাসু উপত্যকার অভাবনীয় জলছবি। ঝোপঝাড়ের মধ্যে চাসু গ্রাম কিছুটা আড়ালে চলে গেলেও সানজিধাম, ইটু, গাবুং এমনকী বুয়ারা গ্রামের কিয়দংশও স্পষ্ট দেখা যায়। আগে একবার দিরাং-এর ঘরে এলেও এভাবে চোখ চেয়ে দেখার সময় ছিল না ধীরের। উপত্যকার নাইকুণ্ডে চাসু, ইটু ও ইদরিনালার সঙ্গম এক অনবদ্য দৃশ্য বললেও কম বলা হয়।

উত্তরে চোখ ধাঁধানো দৃশ্য থেকে চোখ ফেরাতে পারে না ধীর। সানজিধামের পিছনে ছোটা মাতরা রিজের আড়ালে মাতরা রেঞ্জ অবশ্য ওখান থেকে দেখা যায় না। রিজ ও রেঞ্জের মধ্যিখানে মাতরা হিমবাহের ফুটিফাটা তুষারক্ষেত্র। বছর কয়েক আগে ওই তুষার প্রান্তরে একবার ঢুকেছিল সে। অতি সন্তর্পণে এধার ওধার করতে হয়। শক্ত বরফের ভাঙচুর বিভীষিকা অনভিজ্ঞ পথচারীদের জন্য মোটেই উপযুক্ত ভ্রমণস্থল নয়। তা ছাড়া, ওখান থেকে কোনও গিরিবর্ত টপকে এপার ওপাব করা যায় না। ওখানে ছ'হাজার মিটাবের কোনও শৃঙ্গও মাথা উঁচিয়ে নেই। ফলে পর্বতারোহীরাও ওদিকে অভিযান করতে যায় না। অল্প দিক পরিবর্তন করলেই যাওয়ার জায়গা অঢেল। তাই মাতরা হিমবাহ নিয়ে কারও আগ্রহ নেই। অথচ ওই পথেই ইরিকা টোর যেতে চান। সোনাম চিকুর দাবি, সে মাতরা রেঞ্জ টপকে ডোলি উপত্যকায় যাওয়ার পথ চেনে। কিন্তু ইরিকা ম্যাডামকে সঙ্গে নিয়ে কাজটা সম্ভব কি না তা ধীবের জানা নেই। বিপদে পড়লে সামাল দেওয়ার কাজে চিকু কতটা সক্ষম তাও সে জানে না। অবশ্য এ নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথাও নেই।

"সাবজি, অন্দর নেহি আনা?"

ঘরের মধ্যে আসার আমন্ত্রণ। তন্ময় ভাব কেটে যায় ধীরের। বিনতি ঠিক তার পিছনে। দিরাং-এর স্ত্রী হলেও আচার আচরণে বিনতি এলাকার মহিলাকুলের থেকে কিছুটা আলাদা। কোনও জড়তা নেই। অবশ্য চাসু উপত্যকার মেয়েরা পুরুষ মানুষের কাছে মোটামুটি সহজ হতে পারে। বিনতির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও সহজ। কথা বলার সময় সর্বদাই হাসির চিলতে তার মুখে জড়িয়ে থাকে। বাঙালি সাব্ পিঠে বোঝা নিয়ে যে তাদের ঘরে হাজির হতে পারে এটা স্বাভাবিক ঘটনা না হলেও তার কাছে কোনও বিস্ময়ের ব্যাপার নয়।

খোলা বারান্দার পর ছোট্ট এক টুকরো ঢাকা বারান্দা। তারপর ঘর। ঘরের এক কোণায় উনুন। উনুনের পাশে কম্বল পেতে বসার জায়গা। পাহাড়ি গ্রামে এভাবে বসার ব্যবস্থা তাপ সংগ্রহের তাগিদেই। সারা ঘরে ছোট্ট দুটো ঘুলঘুলি ছাড়া ছোট দরজা। মাথা ঝুঁকিয়ে ঢুকতে হয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও হাওয়ার ঝাপটা থেকে রক্ষা পেতে অবশ্য এ ছাড়া কোনও উপায়ও নেই।

বিনতির পোশাকে কোনও আড়ম্বর নেই। মেয়েদের সবসময়ের পোশাক পাট্টু আর ঢিলেঢালা কামিজ। কখনও সখনও ব্লাউস। ঘরে বাইরের লোক থাকলে ব্লাউস তেমন চলে না। সাইজে ছোট তাই সবটা আড়াল করার অসুবিধে। মাথায় স্কার্ফ জড়ানোর কায়দায় বিনতিকে একটু বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। ছিপছিপে শরীরে সবকিছুই মানিয়ে যায়। স্যাক ভিতরে রেখে ঘরের মধ্যে ঢোকে ধীর। উনুনের পাশে বসে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বিনতি। ক্ষণেক্ষণে ধীরের দিকে তাকিয়ে হাসে সে। সে হাসিতে কোনও আওয়াজ থাকে না। হাসিও যেন এক প্রকার ভাষা। অর্থাৎ ঘরোয়া লেনদেন কথা না বলেও চলতে পারে। পাহাড়ি অঞ্চলে যেখানে ভাষা দিয়ে ভাব বিনিময় করা কঠিন হয় সেখানে শরীরকে একটু বেশিই বলতে হয়।

"ফারেটা চলেগা , সাব্ ?"

"চলেগা।"

কিছুটা গোঁসা করেই সে মুখিলালের খানা খারিজ করেছিল। পরোটা খাওয়ার সুযোগ আসতে তার খিদেটা চনমন করে উঠল। দিরাং-বিনতি পরিবার কঠিন জীবনে অভ্যস্ত। পরোটাই তাদের কাছে অনেক কিছু। দিরাং কোনও রোজগার করে না। অলস তায় আবার মেজাজি মানুষ দিরাং। আপাং কেনি টুকরো টাকরা কাজের জন্য যা দেয় সেটাই তার রোজগার। বিনতির রোজগার মানে... সবার মতো ধীরও জানে। সেটাও আসে ওই কেনির কাছ থেকেই।

গরম গরম পরটার গন্ধে দিরাং কোথায় আর জানতে চাইল না ধীর। পাহাড়ে সর্বত্র খাবার জিনিস গরম থাকতে পাতে পড়ে। ঠাণ্ডার কোনও ব্যাপার থাকে না। অপূর্ব স্বাদ! আচার সে খায় না, তবু না করল না।

হাতের কাছে জল এনে রাখল বিনতি। কিছুটা খেয়ে বাকিটা দিয়ে হাত ধুয়ে এল ধীর। চায়ের মগ হাতে নিয়ে ঢাকা বারান্দায় এসে বসল সে। খোলা বারান্দায় বিনতি টুকবো কাঠ নিতে গেল আর তখনই তার নজরে পড়ল। বিনতির পাট্টু আর ব্লাউসে বিস্তর ছেঁড়া-ফাটা। এসব তার গা-সওয়া হলেও ঠিক ওই সময় তার একটু বেশিই খারাপ লাগছিল। মনে মনে ঠিক করল কেনির স্টোর থেকে এক জোড়া নতুন পোশাক কিনে আনবে সে। ঘবে কাঠ বেখে কখন যে বিনতি দরজার পাশে এসে বসেছিল খেয়াল করেনি ধীর।

"দিরাং কো কোই কাম দিলাদো সাব্।"

হঠাৎ ধাক্কা খেল ধীর।

দিরাং-এর জন্য কাজ! যে লোকটা কাজই করতে চায় না তার জন্য আবার কাজ কী! তা ছাড়া ধীর এসেছে হিমালয় ভ্রমণে। পাহাড়ি মানুষজনের দুঃখকষ্ট দেখার দায় তার নয়। অল্প কিছুদিন কাটিয়ে কোলাহলে ফিরে গেলেই সব মুছে যায়। তবু অবাক হল সে। আপাং কেনির কাছে দিরাং চাইলেই কাজ পাবে। সর্বদা দারু খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকলে কাজটা করবে কখন সে। তার জন্য কাজের ব্যবস্থা করে যে কোনও লাভ নেই এটা বিনতি ভালই জানে। কিছু একটা বলে প্রসঙ্গ শেষ করতে চাইল ধীর।

"ঠিক হ্যায়, লালাজি-সে বাত করেঙ্গে।"

চুপ করে যায় বিনতি। দিগন্ত আস্তে আস্তে ধীরের কাছে ঝাপসা হতে থাকে। ভোর হলে মাচদা ছেড়ে ঠিক কোথায় যাবে ভাবতে থাকে সে।

"লালাজি-কা পাস নেহি। দুসরা কোই জগহ্ দিরাং কো লাগা দো সাব্। দিরাং জরুর কাম করেগা।"

লালাজি অর্থাৎ কেনির কাছে নয়। অন্য যে কোনও জায়গায় দিরাং ঠিক কাজ কববে। বিনতির এমন কথা বলার কাবণ ঠিক কী বুঝতে পারল না ধীর। এসব কথা শুনতে তাব আর ভাল লাগছিল না। তাব মনে হল, দিবাং লাকা-র ঘরে উঠে সে মোটেই ভাল করেনি।

"কভি কভি মুঝে বহত ডর লাগতা সাব্"

অবাক হল ধীর। ডর, অর্থাৎ ভয! ভয়েব কী কারণ থাকতে পারে!

"দিরাং লালাজি কো বহত নফরত করতে হ্যায়। আচানক কুছ ভি ঘট স্যাকতা, সাবজি"

কেনিকে প্রচণ্ড ঘেন্না করে দিরাং! হঠাৎ কিছু ঘটে যেতে পারে! বলে কী বিনতি!

ধীব আর কোনও কথা বলল না। অনেক অনেক সময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল বহুদূরে পাহাড়ের ঢালে ঝুলে থাকা ইটু ও গাবুং গ্রামের দিকে। সেখানেও কি কোনও মেয়ে এমন কোনও সমস্যায় জেরবার হয়ে পড়ছে? কিন্তু সেটা আর বোঝা গেল না। ফের সেই কণ্ঠ। কিছুটা ভারী, চাপা কান্নায় আচ্ছন্ন।

"দিরাং মুঝে ভি খতম করনে কি ধমকি দিয়া। মগর, মেরি ক্যায়া কসুর সাব্?"

দিরাং বিনতিকে খতম করার হুমকি দিয়েছে। এই না হলে পুরুষ! অলস বেরোজগেরে স্বামীর মুখে খাবার তুলে দিতে হলে বিনতির সামনে আপাং কেনিকে সঙ্গ দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা নেই। তা ছাড়া, এসব নিয়ে এদিকে কেউ ভাবেও না। জীবনধারণের

অনিবার্য সংগ্রামে জেরবার মানুষ অন্যসব ভাবনার জন্য সময় দিতে পারে না।

রুক্ষ বন্ধ্যা প্রান্তরে চাষ আবাদের যথেষ্ট সুযোগ নেই। অল্পস্বল্প জলের ধাবে কোথাও কিছু হলেও তার জন্য পরিবারের লোকজনই অনেক। পিতসির আগে পর্যন্ত ভালই আলুচাষ হয়। এদিকে হয় না। বোধহয় মাটির দোষ। তবু চেষ্টা হয়। কেউ কেউ অল্প ফসল ঘরেও তোলে। কাজ বলতে মাল তুলে এখান ওখান করা। খুব কম পয়সার কাজ। রাস্তায় কুলিকামিন খাটার কাজ পেতে হলে অনেকের খাঁই মেটাতে হয। কামিন দেখলে হাঁ বেড়ে যায়। অবশ্য একটা লাভজনক কাজ করা যায় — করে অনেকেই। চোলাই মদের কারবাব। তাই করে অনেকের সংসার দিব্যি চলে যায়। বিনতির দ্বারা এর কোনওটাই হবার নয। পাহাড়ি মেয়ে হলেও বিনতির বোধহয় পরিশ্রম করার অভ্যাস নেই। এব জন্য দাযী সেই দিবাং।

গত দশ বছর ধরেই বিনতিকে দেখছে ধীর। কেনির মুদিখানা আর হোটেল বলতে গেলে তখন দিরাং-ই চালাত। আপাং কেনি ব্যস্ত থাকত তার মহাজনী কারবাবে। বিনতিব তখন কাজ বলতে কেনিব ঘর সাফ-সুতরো করা। হোটেলের খাবার পছন্দ না হলে বিনতি কেনির জন্য রান্নাও করে দিত। দু'একবার তেমন খাবার চেখেও দেখেছে ধীর। চমৎকার স্বাদ হত।

সারাদিনের হাড়ভাঙা পবিশ্রমের পর ক্লান্ত কেনি হযতো যুবতী বিনতির মোহে বাঁধা পড়ে যায়। অন্যদিকে মদ্যপানের মাত্রা বাড়তে থাকায় দিরাং-এর জায়গায় অন্য লোক বাখতে হয। দিনে দিনে তার প্রয়োজন কমতে থাকে। প্রতিবার ফিরে এসে ধীর দিবাং লাকা-কে ছন্নছাড়া পর্যুদস্ত অবস্থায় দেখেছে। কেনির কৌশলেব কাছে দিরাং তো বটেই এমনকী বিনতিকেও আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। দিরাং নিজেকে ঠিক রাখতে পারলে ঘটনা মনে হয এতদূর গড়াত না।

এখন তিনি বজ্রহুংকার ছাড়েন। বেচারা!

এমন অসহায় দুর্বল মানুষ কাবও ক্ষতি করতে পাবে বিশ্বাস হল না ধীবেব। দিরাং-এর হুংকাব নিজের অপদার্থতা আড়াল করার এক করুণ বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। কেনি বা বিনতি নয়, দিরাং সম্ভবত নিজেকেই খতম করতে চায়।

"দিরাং আচ্ছা আদমি হ্যায, বিনতি। সায়েদ থোড়া পরিশান হ্যায়। ডরো মাত, ম্যায় উনসে বাত করেগা।"

যেমন চুপ করে ছিল বিনতি তেমনি চুপ কবে থাকে।

পাহাড়ে এসে আর মন ভাল থাকে না ধীরের। সমতলের সব অদ্ভুত কাণ্ড এখন হিমালয়েও আকছার ঘটতে থাকে। সময় সময় পাহাড়কে ছুটি দিতে ইচ্ছে হয় তার, কিন্তু

পারে না। পাহাড়ে যাওয়ার অসুখ না থাকলে সে কিছু বাড়তি আরাম অনায়াসে খরিদ করে রাখতে পারত। অকারণে শরীরকে এত কষ্ট পেতে হত না। যারা লকারভর্তি আরামের মালিক তারা আর তাকে চিনতেই পারে না। রাজনৈতিক দূষণ ও দলাদলির আখড়ায় যার জীবনের অর্ধেকটাই ভো কাট্টা অবস্থা তাকে ভদ্রসমাজে হাজির করাও ব্যাপক ফ্যাসাদ, বলেন তাঁরা। ফলে ধীরের কাছে সমতলের মানুষ মানেই এখন চূড়ান্ত লাঞ্ছনার আগাম ভূমিকা মাত্র। তার চেয়ে কম ঝুঁকি পাহাড় পাহাড় খেলায়। তাই তাকে অনিবার্যভাবেই ফিরতে হয় সেই পাহাড়ি ঢালের আড়ালে।

খোলা বারান্দায় এলেই বাতাস ধাক্কা মারে। বাতাসের নির্মম ঝাড়ুদারিতে পাথরের পোক্ত ছাউনিও মড়মড় হ্যাকং-হ্যাকং আওয়াজ তোলে। বেলা বারোটার মধ্যেই রাস্তা মোটামুটি পরিষ্কার। নেহাত প্রয়োজন না পড়লে চারটের আগে ঝাপটা খেতে কেউ ঘরের বাইরে বের হয় না। হঠাৎ ধীরের দিরাং-এর কথা মনে পড়ে যায়। গেল কোথায় মানুষটা।

"বিনতি।"

"সাবজি?"

"কাঁহা গ্যায়া দিরাং তুমহে পাত্তা হ্যায়?"

"জি সাব্, পাততা হ্যায়। আপকো দ্যেখা অওর মিট লানে দৌড়া।"

যার বাড়িতে রাতের খাবারের সংস্থান থাকে না সে কিনা সাহেবকে দেখে মাংসের খোঁজে পাড়া দাপিয়ে বেড়ায়! আসলে দিরাং মানুষটাই এমন।

"দ্যেখা বিনতি, আচ্ছা আদমিকা নমুনা?"

সাহেবের কথা শুনে বিনতিকেও হাসতে হয়। তার মুখের মধ্যে ঝুলে থাকা ভাবী ওজনটা হঠাৎ সরে যায়।

"আদমি মেরি আচ্ছাই থা সাব্। আভি থোড়া বদল গ্যায়া।"

ধীরও হাসে কিন্তু কোনও উত্তর দেয় না। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় হন্তদন্ত হয়ে চড়াই ভেঙে উপরে উঠতে তৎপর দিরাং-এর দিকে। অতি দ্রুত চড়াই ভাঙলে হাঁফ ধরে অথচ দিরাং-এর সাবা শরীরে স্ফূর্তির জোয়ার। ধীরকে দেখেও দেখল না সে। হাঁক পাড়ে বিনতির নাম ধরে। এ কোন দিরাং, ভাবে বিনতি। এমন চঞ্চল আমুদে মানুষটা এতদিন ছিল কোথায়!

"সাবকা লিয়ে ডিনার বনেগা। জমকে বানানা বিনতি।"

দিরাং-এর কাছেই তার এমন আনন্দের কারণটা জানা গেল। সাবজি তো স্যাক পিঠে

কবে কখনও তাব ঘবে আগে আসেননি। ঘটনাটাকে স্মবণীয কবে বাখাব জন্যই এমন এলাহি ব্যবস্থা।

চোখ দুটো পাছে ভাবী হযে যায তা এড়াতেই সম্ভবত ধীব খোলা বাবান্দায এসে দাঁড়ায। চোখেমুখে বাতাসেব মুহুর্মুহু আছাড় উপেক্ষা কবে সে। হঠাৎ তাব নিজেকে পর্বতাবোহী বলে মনে হয। চবকিব মতো কবে চোখ দুটো ঘোবাতে থাকে ধীব।

সানজিধামেব কাছে ছোটা মাতবা বিজ পুব থেকে হঠাৎ দক্ষিণে বাঁক নেয। প্রকৃত পক্ষে ওই বিজ চাসু উপত্যকাব উত্তব সীমানা বলা যায। তাব পবই মাতবা হিমবাহ থেকে নির্গত মাতবা নালা দক্ষিণপথ ধবে ইটু নালায মিশে যায। মাতবা নালাব ঠিক পবেই মূল মাতবা বেঞ্জ থেকে দুটি বিজ প্রায সমান্তবাল বেখায উত্তব থেকে দক্ষিণে প্রসাবিত। ওই দুটি অনামা বিজেব মাঝখানে একটা ছোট্ট হিমবাহ আছে। মানচিত্রে তাব কোনও নাম না থাকলেও স্থানীয লোকেবা বলে সাচ্চু হিমবাহ। কেন এমন নাম তাব কোনও হদিশ পাওযা যায না। সাচ্চু হিমবাহেব পূর্ব প্রাচীব ও মূল মাতবা বেঞ্জ-এব সংযোগস্থলে সাচ্চুধুবা নামে একটা গিবিবর্ত আছে বলে সে নাংগেলজিব কাছে শুনেছে। পাহাড়েব গঠনপ্রণালী মানলে ওটাকে গিবিবর্ত বলা যায না। তা না হলেও তাব কাছে খবব আছে সাচ্চুধুবা বেশ কঠিন পথ। পাথব পড়াব ভয ছাড়াও তেবছা গালিপথ। পাথব ও ববফ ভেঙে উপবে ওঠাব জন্য বিস্তব মেহনত কবতে হয। সাচ্চুধুবা গিবিবর্ত হোক বা না হোক একবাব চেষ্টা কবে দেখলে কেমন হয, নিজেকে প্রশ্ন কবে ধীব। আব কিছু না হোক দিবাং লাকা-কে বেশি কবে পর্বতমনস্ক কবাব জন্যই বোধহয এটা দবকাব।

কালই দিবাং কে নিযে সে সাচ্চুধুবা দেখতে বেবিযে পড়তে পাবে। তবে সেটা বোধহয সম্ভব নয। ওখানে যাওযা খুব বিপজ্জনক জেনে থাকলে সে সটান না বলে দিতে পাবে। সে ক্ষেত্রে তাকে অন্য কোথাও যাওযাব কথা ভাবতে হতে পাবে। অবশ্য একটা মবিযা চেষ্টা কবে দেখা যেতে পাবে।

দিবাং-এব দিকে তাকিযে দেখল ধীব। খোলা বাবান্দায তাব থেকে কিছুটা দূবে দাঁড়িযে। সাহেব ঘবে ঢুকলে সে-ও ঢুকতে পাবে। এমন একটা দিনে সে দারু খাবে না তা হয না। তাবপব তাব সঙ্গে বেশ কযেক ঘন্টা কোনও কাজেব কথা বলা যাবে না। হয ঘুমিযে পড়বে তা না হলে গুম মেবে যাবে। সিদ্ধান্ত নিযে নিল ধীব। দিবাং-কে নিযে ঘবে ঢুকে বিনতিব কাছে গোল হযে বসল দু'জন। কাবও মুখে কোনও কথা নেই। বিনতিব মতো দিবাং-ও কিছুটা অবাক। সাবজি হঠাৎ এত গম্ভীব কেন? বিনতি একবাব তাব স্বামীব দিকে আব একবাব ধীবেব দিকে তাকাতে থাকে।

কোনও ভূমিকায গেল না ধীব। এসব ব্যাপাবে ভূমিকা বিপদ ডেকে আনে। সবাসবি লক্ষ্যে আঘাত কবতে চাইল সে।

"কালই তোমাকে আমার সঙ্গে উপরে উঠতে হবে।"

কথার মধ্যে খুব জোর ছিল। শুনলে মনে হয় আদেশ—কালই তোমাকে আমার সঙ্গে উপরে যেতে হবে। দিরাং চায় কি না তা সে ইচ্ছে করেই জানতে চাইল না। কোথায় যেতে হবে তাও বলল না ধীর। জানতে চাইলে তখন বলবে। ধীর অপেক্ষা করতে রাজি তার মধ্যে কোনও তাড়াহুড়ো ছিল না।

"কল নেহি হোগা সাব্। দো দিন বাদ চলিয়ে।"

দু'দিন বাদে যেতে চায় দিরাং। খুব খুশি হল ধীর। কোথায় যেতে হবে তা সে জানতে চায়নি। ভাল লক্ষণ ঠিকই কিন্তু তাকে তো কালই বেরোতে হবে।

"না, কালই আমি যেতে চাই।"

মাথা চুলকে বিস্তর ভাবে দিরাং। বার কয়েক বিনতির মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর খোঁজে। সেখানেও সে কোনও উত্তর পায় না। সম্ভবত বিনতিও এমন অবস্থার জন্য তৈরি ছিল না।

"ঠিক হ্যায় সাব, তব কলহি জায়েঙ্গে। মগর জানা কাঁহা?"

তার সিদ্ধান্তে যে নড়চড় হওয়ার কোনও উপায় নেই সেটা বোঝাতেই অতি সংক্ষেপে উত্তর দেয় ধীর।

"সাচ্চুধুরা!"

দিরাং-এর মুখে কোনও অস্থির প্রতিক্রিয়া না দেখে বেশ অবাক হল ধীর। জানতে হয় তাই প্রশ্ন করেছিল সে। যেন না জানলেও তার চলত। বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে গিয়েই তার নাকে গন্ধটা এল। এতক্ষণ আসেনি। চমৎকার কসা মাংসের পোড়াপোড়া মিঠে গন্ধ।

এরই মধ্যে মাংস চড়িয়ে তার মিষ্টি সুবাসে জিভে জল আনতে পারে বিনতি। চুলা থেকে হঠাৎ করে এক ঝলক খুলখুলে আলো বেরিয়ে পড়ে। বিনতির মুখের আদলে সেই আলো এক ছিলিম ঝিলিক মেরে যায়। ধীর বিশ্বাসের ইচ্ছে করে বিনতির চিবুক ধরে মৃদু নেড়ে দেয়। তারই মধ্যে বিনতির চোখ ক্রমাগত পাক খায়। এত দ্রুত এতসব ঘটে যেতে পারে সেটা বোধহয় তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। দ্যাখে বিনতি তার স্বামীকে—যার নাম দিরাং। ক'দিন আগেই যে তাকে খতম করার হুমকি দিয়েছিল। সাহেবের যাদুমন্ত্রে অবস্থা এখন অনেকটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয় তার।

হঠাৎ বিনতি জানতে চায় : "আপ দোনো কব তক বাপোস হোঙ্গে, সাবজি?"

ফিরতে তাদের কতদিন লাগবে তা বলা কঠিন। পাহাড়ে গেলে যে ফেরার দিনক্ষণ নিশ্চিত করে বলা যায় না এটা বিনতি জানে না। কেউ কেউ পাহাড়ে গিয়ে যে কখনও সখনও নাও ফিরতে পারে এ ব্যাপারটাই সে জানে না। তবে এসব তাকে জানানোর কোনও প্রয়োজন নেই। ধীর নিজে না ফিরলে কারও কিছু যায় আসে না, জানে সে। কিন্তু দিরাং না ফিরলে সে ভয়ঙ্কর সমস্যায় পড়ে যেতে পারে। কারণ চাসু উপত্যকায় পাহাড়ে গিয়ে ফিরে আসেনি এমন ঘটনা, যতদূর তার জানা আছে, আগে কখনও ঘটেনি।

দিরাং-এর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল ধীর। দারুর বোতল সামনে রাখা। কথাবার্তা চালাচালির ধুমে সে সাহস করে ছিপি খুলতে পারছিল না। তার কাছেই জানতে চাইল ধীর।

"দিরাং ভাই, ফিরে আসতে আমাদের ক'দিন লাগতে পারে?"

যেন তৈবিই ছিল তার উত্তর। কোনও তাপ-উত্তাপ নেই তার মধ্যে।

"সাতদিন তো লগহি জায়েগা। দো-এক দিন জাদা ভি লাগ স্যাকতা।"

সাতদিন তো লাগবেই। চাই কি দু'একদিন বেশিও লেগে যেতে পারে। সঠিক উত্তর— যাকে বলে একেবারে অভিজ্ঞ গাইডদের মতো। ধীর তার উপর ভরসা রাখতেই পারে। এবার তার ওঠা দরকার। কাল উপরে উঠতে হলে আজই মালপত্তর কেনাকাটা করে সাজিয়ে রাখা জরুরি। কেনাকাটা মানেই আপাং কেনি। ওই দিনই তার মুখোমুখি সে হতে চায় না কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও ছিল না।

দিরাং ও ধীর বসে ফর্দ তৈরি করে নেয়। কুড়ি কিলো খাবারদাবার সঙ্গে পাঁচ লিটার কেরোসিন তেল। চড়ার সাজসরঞ্জাম, তাঁবু ও ব্যক্তিগত মালপত্তর নিয়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কিলো ওজন। সাচ্চুধুরায় ওঠার সময় সব মিলিয়ে সঙ্গে থাকার কথা তিরিশ কিলো। অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। ছিপি খুলে গলায় অল্প পড়লেও দিরাং সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। ধীর ইচ্ছে করেই তাকে সঙ্গে নেয়নি। তার গন্তব্যস্থল ও সঙ্গীর ব্যাপারটা সে আপাতত গোপন রাখতে চায়।

বেলা সাড়ে চারটের পর বাতাসের বেগ কমে যায়। শরীরের কাপড়চোপড় তখন আর হাওয়ায় ওড়ে না। উৎরাই পথ ধরে কাঁধে কিট চড়িয়ে সে ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে। খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও বিনতি ও দিরাং-এর সংসারের পালে সে যে কিছুটা হাওয়া তুলতে পেরেছে এটা ভেবে ধীরের ভাল লাগে।

সাচ্চুধুরা যাওয়ার ছক যে মোটেই বাস্তবসম্মত নয় সেটা ধীর ভালভাবেই জানে। যে গিরিবর্তে নাংগেল পর্যন্ত হার মেনে পিছিয়ে আসে সেখানে দিরাং-কে সঙ্গে করে যে যেতে চায় সে মহামূর্খ। তা ছাড়া, কোনও কিছু না জেনে এমন একটা গিরিবর্তে ধীর যাওয়াব মানুষই

নয়। এ ব্যাপারে সিরিয়াস হলে লুনি গিয়ে নাংগেলজির কাছে সে সাচ্চুধুরা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে আসতে পারত। তা সে করেনি। কারণ সে নামকেওয়াস্তে সাচ্চুধুরা যেতে চায়। মাচদা পৌঁছে এবার তার খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। মনটাকে শান্ত করার জন্য আপাতত কোথাও গিয়ে কয়েকদিন আত্মগোপন করে থাকতে চায় ধীর। মাচদা ছাড়লে কয়েকদিনের মধ্যেই সব থিতিয়ে যাবে, বিশ্বাস তার। ওই সুযোগে বিনতি ও দিরাং-এর মধ্যেকার মানসিক চাপও কিছুটা সরে যাওয়ার সম্ভাবনা। ধীরের বিশ্বাস দু'জনই সুন্দর মনের মানুষ কিন্তু অনিবার্য পরিস্থিতির শিকার।

সানজিধাম বা আশ্রমের কল্যাণে চাসু উপত্যকায় এখন অনেক বাড়িতেই বিজলিবাতির ব্যবস্থা হয়েছে। কেনির হোটেলে আশ্রমের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিজলি আসে। উপত্যকার মূল এলাকা বলতেও এই দুটিকে বোঝায়। আশ্রম সম্বন্ধে সে মোটেই ওয়াকিবহাল নয় কিন্তু কেনির হোটেল অর্থে হোটেল ছাড়াও মুদির দোকান, কাটা কাপড়ের স্টোর এবং থাকার ব্যবস্থা। সন্ধে সাতটার পর হোটেল আর হোটেল থাকে না—পুরোদস্তুর বার। দেশি-বিদেশি মদের ঢালাও কারবার চলে তখন। অনেকে বলে এই কারবার দাঁড় করাতে গিয়েই দিরাং নিজের কবর খুঁড়ে ফেলে।

সাড়ে চারটার সময় হোটেলে তেমন লোক থাকে না। চুপচাপ সে তার মালপত্তর নিয়ে চলে আসতে পারে, ভেবেছিল ধীর। কিন্তু তার হিসাব মিলল না। খদ্দের না থাকলেও আপাং কেনি, সোনাম ও ইরিকা ম্যাডাম তখন গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। সে হঠাৎ ওই সময় ওখানে পৌঁছে যেতে পারে তারা কেউই এটা আশা করেনি। মুখিব হাতে ফর্দটা দিয়ে ধীর বেঞ্চিতে এসে বসল।

— কী ব্যাপার, তুমি এখন এখানে!

ইরিকা ম্যাডামের বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

— কাল ভোরে আলাপানির দিকে যাব ঠিক করেছি। কয়েকটা জিনিস নিতে চাই।

— আলাপানি! তুমি যাওনি আগে?

মিথ্যে করে বলতেই পারত যায়নি কিন্তু তা বলল না।

— গিয়েছি তবে অনেক আগে। আর একবার যেতে চাই।

ম্যাডাম চুপ করে গেলেন। মনে হল ধীরের তাঁর আর কিছু জানার নেই। হঠাৎ তার মনে হল দুপুরের ওই ঘটনার পর তার হোটেলে আসা উচিত হয়নি। কিন্তু তখন আব চলে যাওয়ারও উপায় ছিল না। তাই তার মালপত্তরের কী হল ধীর জানতে চাইল।

— ক্যায়া মুখিলালা, মেরা সামানকা ক্যায়া হুয়া?

মুখি তার মনিবের দিকে তাকাল। কেনির গম্ভীর জবাব তার কানে এল : ‘আমার কাছে কোনও মাল নেই।’

চড়াং করে কেউ যেন ধীরের মাথায় বাড়ি মারল। ঘাড় ঘুরিয়ে কেনির দিকে তাকাল সে। এক-পা দু-পা করে তার সামনে এসে দাঁড়াল ধীর। আপাং চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েও সাহস করল না। কলার চেপে ধরে লোকটার নাকটা ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে হল তার। কিন্তু তাকে ভাবতে হল। কেনি যতই শের হোক তাকে সিধে করার দাওয়াই তার জানা। তবে তাতে তার কোনও লাভ নেই। ধীরের হাতের মুঠোয় একটা আস্ত সংসার। বিনতি ও দিরাং কঠিন চাপে পড়ে যাক সেটা সে চায় না। অবস্থা বুঝে সোনাম ও ম্যাডামও তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে যায়। নরম হতেই হল ধীর বিশ্বাসকে।

— নেই মানে!

আপাং অন্য কিছু ঘটার আশঙ্কায় ভয়ঙ্কর ভড়কে গিয়েছিল। ধীরকে সে ভাল করেই জানে। হঠাৎ এই পরিবর্তনে স্বস্তি বোধ করলেও সে তার গোঁ ছাড়ল না।

— যা বলার তা আমি বলে দিয়েছি।

সোনামের ধীরকে পছন্দ করাব কোনও কারণ নেই। তারও বোধহয় ব্যাপারটা খারাপ লেগেছিল।

ক্যায়া বাত কর রহা তুম লালাজি! সামান লেনেকে লিয়ে সাবকো ক্যায়া তব পিতসি তক দৌড়না পড়েগা?

ম্যাডাম ধীরের হয়ে বেশ কয়েকবার সওয়াল করেও কেনিকে টলাতে পারলেন না। সোনামের মতো মারকুটে লোকও কেনিব গোঁ দেখে তাজ্জব বনে গেল। অস্বস্তি কাটাতে ফর্দ ও কিট তুলে বাইরে বেরিয়ে এল ধীর। অবস্থা যা তাতে মান বাঁচাতে তাকে পিতসির দিকেই দৌড়াতে হয়।

মিনিট দুই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর পিতসির রাস্তা ধরল ধীর। সারা শরীর জুড়ে থইথই ক্রোধ কমাতে তার প্রচুর দৌড়ানো দরকার। ক্রমাগত কায়িক পরিশ্রমে ক্রোধ কমিয়ে ফেলা যায়। শুধু তাই নয়, ক্রোধ ভর করলে পরিশ্রম করার ক্ষমতাও আচমকা খুব বেড়ে যায়। পৌনে দু'ঘন্টায় পিতসি। মাচদার মতো আটটার পর পিতসিতে সব শুনশান হয়ে যায় না। রাত দশটা পর্যন্ত দোকান বাজার খোলা থাকে। পিতসির ডাকসাইটে লালাজি উলফতরাম। নামে মুদিখানা হলেও সব পাওয়া যায়। কেনির বেশির ভাগ মালপত্র উলফতের দোকান থেকেই চালান যায়। উলফু ধীরকে ভলই চেনে। তাকে ওই সময় পিতসিতে দেখে সে অবাক।

— মাচদাসে পিতসি আয়া সামানকে লিয়ে! ক্যায়া বাত সাব্?

গল্প বানাতে হল ধীরকে। আসল ঘটনা উলফতকে জানালে কেনি ঝামেলায় পড়তে পারে। পত্রকার হিসাবে ধীর দারুণ সম্মান পায় এলাকায়। সরকারি লোকজনও তাকে যথেষ্ট খাতির করে। তবে তার পাহাড়ে ঘোরা ব্যাপারটা তারা তেমন বুঝতে পারে না। সেই সূত্রেই পিতসির সব চেয়ে বড় ব্যবসাদার উলফতরামও তাকে বিশেষ মর্যাদা দেয়।

— লুনি আয়া থা। ইস লিয়ে থোড়া বহত সামান আপকা দুকানসেহি লেনা ঠিক কিয়া।

উত্তর শুনে উলফতরামের বিস্ময় কেটে গেল।

— আচ্ছা কিয়া সাব। জগ্গু, সাবকো লিয়ে গরমাগরম চায়। অওর উনকা সামান ফটাফট তৈযার করনা।

মুহূর্তের মধ্যে ধীরের হাতে চা এসে গেল। চা খেতে খেতে সে দেখছিল। অতি দ্রুত একটা কাজ সেরে অন্য কাজ ধরার এস্ত মুন্সিয়ানা। তারই মধ্যে ঝপ্ করে বেরিয়ে উলফতের পাশের দোকান থেকে বিনতির জন্য সে এক সেট সালোয়ার কামিজ কিনে আনল।

ফিরে এসে দেখে তার মালপত্র প্যাক করে সামনে সাজানো। দাম মেটানোর সময় উলফত জানতে চাইল—অব সামান ক্যায়সে লে জায়েঙ্গে সাবজি?

উত্তর দিতে সমস্যায় পড়ে গেল ধীর। সব মিলিয়ে বিশ-বাইশ কিলো মাল ছাড়াও পাঁচ লিটার কেরোসিন তেল। ওই মাল নিয়ে পাহাড়ের ঢালে সে অনায়াসে চলাফেরা করতে পারলেও উলফতকে সে কথা বলা যায় না।

— আদমি হ্যায় মেরা সাথ। আভি আনেওয়ালা।

উত্তরে খুশি হয়ে দোকানের ভিড় সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল উলফু। পুরানবাহাদুর তার মালপত্তর পিঠে করে পাশের দোকানে পৌঁছে দিল। পুরান আড়ালে চলে যেতেই ধীর পিঠে মাল তুলে নিল।

কেনির হোটেলের একটু আগে থেকে ধীর খুব সন্তর্পণে পথটা পেরিয়ে যেতে চাইল। প্রায় পৌনে দশটা। ওই সময় কেনির হোটেলে দু'চার পিস মাতাল ছাড়া আর কারও থাকার কথা নয়। সে চায়নি ঝোঁকের মাথায় তার পিতসি পর্যন্ত মাল নিতে দৌড়ানোটা অন্য কেউ জেনে যাক। এবারও তার হিসাব মিলল না। ইচ্ছে করেই সে টর্চ জ্বালেনি। অন্ধকারে কিছুক্ষণ পথ হাঁটার পর অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে। কিন্তু ঝামেলা বাধাল রাস্তার কুকুরগুলো। ওই ঝোপড়া পিঠে ঝুপুকঝপুক করে পথ হাঁটলে চেনা মানুষকেই পাহাড়ি কুকুর ছেড়ে কথা বলে না। তায় সে আবার পরদেশি। বিভিন্ন ধরনের আর্তনাদ তাকে চারধার থেকে ঘিরে ধরল।

আর অমনি কেনির হোটেলের দু'ধারের দরজার পাল্লা হাট হয়ে খুলে গেল। কুকুর তাড়িয়ে তার সামনে এসে হাজির হল সোনাম। খুব বিরক্ত হল ধীর কিন্তু কিছু বলল না। কয়েক সেকেণ্ড পর ইরিকা টোরও বেরিয়ে এলেন। ভয়ঙ্কর বিরক্ত তিনি।

— তুমি তো অসম্ভব গোঁয়ার। সোনাম আর আমি মি. কেনিকে রাজি করালাম আর তুমি কিনা মাল নিতে পিতসি পর্যন্ত ছুটলে!

— এর মধ্যে কোনও গোয়ার্তুমি নেই ম্যাডাম। কাল ভোরেই আমি মাচদা ছাড়তে চাই। কেনির মাল দেওয়ার অসুবিধে আছে তাই বাধ্য হয়ে পিতসি যেতে হয়।

— কেন, এখানে খুঁজলেও পেতে। দু'চারজনের কাছে কিছু কিছু মালপত্র পাওয়া যায় শুনেছি।

— মাচদায় থেকে কেনিভাই ছাড়া অন্য কারও কাছে মালপত্র নেব এখনও সেটা ভাবতে পারি না। তা করলে আপাং কেনি লজ্জায় পড়ত। আপনি হয়তো সেটা জানেন না।

মৃদু হলেও ধাক্কাটা খেলেন ইরিকা। উনি আর কথা বাড়ালেন না। অন্যদিকে সোনাম চিকুর চোখেমুখে ঘোর বিস্ময়। পাঁচ ঘন্টারও কম সময়ে মাচদা থেকে পিতসি গিয়ে মালপত্র নিয়ে কেউ অনায়াসে ফের মাচদায় ফিরে আসতে পারে তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। পাহাড়ি লোক হলেও কথা ছিল।

— লাগতা হ্যায় কাফি সামান হ্যায় কিটকা অন্দর।

কিট নামাতেই হল পিঠ থেকে। কোমর থেকে গামছা খুলে মুখ মুছল ধীর। ইরিকা দেখে অস্বস্তিতে পড়লেন।

— খুব খারাপ লাগছে। সামান্য ভুল বোঝাবুঝির জন্য তোমাকে অযথা এতটা পরিশ্রম করতে হল।

— আমার মধ্যে কোনও ভুল বোঝাবুঝি নেই ম্যাডাম। আপাং ভাইকে আমি বিশ বছর ধরে চিনি। দু'একদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার আমরা আগের মতোই বন্ধু থাকব।

— সানজিধামে না গিয়ে হঠাৎ তুমি কেনির কাজের লোকের কাছে চলে যেতে পার ও ভাবতে পারেনি। খুব অভিমান হয়েছে। বিশেষ অনুরোধে সানজিমাতা রাজি হয়েছিলেন, জান তুমি?

— আসলে মেয়েদের আশ্রমে গিয়ে আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করতাম না। তা ছাড়া, মাত্র একটা রাতের জন্য আর অতদূর যেতে চাইনি।

— সানজিমাতা কোনও পুরুষমানুষকে তাঁর আশ্রমে থাকার অনুমতি দিয়েছেন এটা একটা বিরল ঘটনা। এমন একটা দুর্লভ সুযোগ গ্রহণ না করে তুমি খুব ভুল করেছ, ধীর।

— আমি দুঃখিত ম্যাডাম। কোনও এক সময় আমি গিয়ে মাতাজির কাছে ক্ষমা চেয়ে আসব।

— ভাল কথা, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—মানজু সালান, সানজিদেবীর আপন ভাই। ভাল গাইড।

সুঠাম চেহারার মানুষটি কখন এসে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল করেনি ধীব। আধো অন্ধকারে ভাল করে তাকে ঠাহর করতে পারল না সে। তবু মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করল ধীর। সঙ্গে সঙ্গে সানজিদেবী যেন তার প্রতি ক্ষুব্ধ না হন সেটা দেখার অনুরোধ রাখল সে মানজুর কাছে। মানজু খুব খুশি হল।

— আপ বেফিকির রহিয়ে সাব্। ম্যায় আপকা বারে উনকি সব কুছ বাতা দুঙ্গা।

— ম্যায় বহত থকে হুয়ে সালানভাই। অব চলতে হ্যায। ফিন মিলেঙ্গে।

কিট ও কেরোসিন নিয়ে কিছুটা এগোতেই ধীর সালানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল— আরামসে জানা সাব্!

ওজন নিয়ে ধীর চড়াই ভেঙে উপরে উঠতে থাকল। ঘন্টা খানেকের জন্য বেরিয়ে সে প্রায় সাড়ে পাঁচঘন্টা পর ফিরে এল। বিনতি নিশ্চয়ই খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছে। খোলা বারান্দায় পৌঁছে নিজেকে অসম্ভব ক্লান্ত মনে হল ধীরের। টর্চেব আলোয় গা ছমছমে অভিযানেব তাপ। চতুর্দিকে উদ্দাম স্থিরতা। ঢাকা বারান্দায় কিট তুলে রাখার সময় বিনতি বেরিয়ে এল। ঘোর দুশ্চিন্তা তার মুখে।

— সাবজি, আপ কাঁহা গ্যায়ে থে? মুখি আপকো ঢুঁড়নে আয়া থা।

মুখিলাল ধীরকে এখানে খুঁজতে এসেছিল! তাকে খুব চিন্তিত মনে হল।

— অন্দর আও সাব্।

কুপির আলোয় দেখতে পেল ধীর দিরাং লাকা-র ঘুমন্ত মুখ। কোনও ক্লান্তি নেই সে মুখে। নিশ্চিন্ত—নিরুদ্বেগ, শিশুর সারল্য মাখানো। ভারী আরাম বোধ করল ধীর। হঠাৎ চেপে ধরা ক্লান্তি তার শরীর থেকে নিমেষে উধাও।

— খানা দেঁ সাব্?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। বাইরে গিয়ে হাতেমুখে জল দিয়ে খেতে বসল ধীর। অন্যদিকে বিনতিও গরম গরম রুটি বানাতে আগুন খুঁচিয়ে তাওয়া বসাল। মাংস আর রুটি। বরাবরই মিতাহারী ধীর। তাওয়া বসতে না বসতেই তার খাওয়া শেষ।

— তুমহারি লিয়ে কপড়া লায়া। কিটকা উপ্পর হ্যায়।

কাপড়ের কথা শুনে বিনতির চোখমুখ চকচক করে উঠল। সাজার সম্ভার নেই— সাজলে তাকে ভালই লাগার কথা। ঢাকা বারান্দায় গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে নতুন কাপড় বের করে ফিরে এল বিনতি।

— যাও পহনকে দেখো।

কুপির আলোয় সবটা ঠাহর করা না গেলেও ঝলমলে পোশাকে দারুণ লাগছিল বিনতিকে। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরেঘুরে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করে দেখল সে। বাচ্চা মেয়েদের হাতে নতুন ফ্রক এলে যেমন হয় অনেকটা তেমনি করে।

পাট্টু আর ব্লাউস পরা থাকলে ওখানকাব মেয়েদের হঠাৎ-ই ভিনদেশি বলে মনে হয়। অথচ সালোয়াব কামিজে যেন পাশের কোনও প্রতিবেশী। ঘরের মধ্যে তার বউ নেচেকুঁদে একসা হলে কী হবে দিরাং দিব্যি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিল।

রাতের মধ্যেও কয়েকটা কথা সেরে বাখতে চেয়েছিল ধীর। তা আর হওয়াব উপায় নেই। এবার তারও ঘুমিয়ে পড়া দরকার। ম্যাট্রেস আর স্লিপিংব্যাগ নিয়ে ঢাকা বারান্দায় চলে গেল ধীর। স্লিপিংব্যাগের মধ্যে ঢুকতে যাবে হঠাৎ দরজাব সামনে এসে দাঁড়াল বিনতি।

– ক্যায়া, কুছ বোলনা হ্যায়?

ঘাড় নাড়ল বিনতি।

— ক্যায়া?

— মুখিলালনে বোলকে গ্যায়া অগব দিরাং আপকা সাথ উপ্পর গ্যায়া তো লালাজি বহৃত নারাজ হোগা।

কেনির সাহস তো কম নয়! বলে কিনা দিবাং তাব সঙ্গে উপরে গেলে সে ভয়ঙ্কর রেগে যাবে। ব্যাটা নিজেকে ভেবেছে কী, এলাকার শের নাকি! ইচ্ছে হল ধীরের গিয়ে হিসাবটা মিটিয়ে আসে। বিনতির সামনে এমন উগ্রভাব প্রকাশ করা সমীচীন নয়, বুঝল ধীর।

- দিরাং-নে ক্যায়া জবাব দিয়া?

— ইয়ে বাত মুখি মুঝে বোলকা গ্যায়া। দিবাং শো বহা থা।

ভাগ্য ভাল দিরাং শুয়ে ছিল। মুখি বেচারা প্রভুর নির্দেশ পালন করতে এসেছিল। দিরাং-এর সামনে এমন কথা বললে মুখির মুখের মানচিত্র নির্ঘাত বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

বিনতিকে তখনও সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারল ধীর। তার সঙ্গে লালাজির যে কোনও সময়ই দেখা হতে পারে। জিজ্ঞেস করলে বিনতিকে জবাব দিতে হবে। সুতরাং সে জানতে চায়, লালাজি জিজ্ঞেস করলে সে তাকে কী জবাব দেবে।

— অ্যায়সা করনা তুম। লালাজি পুছনেসে কহনা ডরকে মারে ইয়ে বাত তুম দিরাং-কো নেহি বোল স্যাকি। চড়া গুসসে মে থে দিরাং। ইয়াদ রহেগা।

— জি সাব্।

খ্রিরং!

হঠাৎ দরজায় শেকল আছড়ে পড়ার শব্দ। ঘুমটা ভেঙে গেল ধীরের। টর্চ জ্বেলে ঘরের মধ্যে গেল সে। ঢাকা বাবান্দা থেকে খোলা বারান্দায় যাওয়ার দরজা যথারীতি বন্ধ। তা হলে শব্দটা কি তার মনের ভুল? ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখল দিরাং যেমন ছিল তেমনি ঘুমে আচ্ছন্ন কিন্তু বিনতি নেই। ঘর থেকে সরাসরি বাইরে যাওয়া যায় একটা ছোট্ট জানলা টপকে। জানলার শেকল খোলা কিন্তু ভেজানো। ঘড়িতে তখন সাড়ে বারোটা। ধীরেব জন্যই হয়তো বিনতিকে এত দেরিতে বেবোতে হল। এভাবেই রাতেব পর রাত বেহুঁশ মাতাল স্বামীকে ঘবে রেখে তাকে বেরিয়ে যেতে হয়। আবার ভোর হওয়ার আগে ফিরেও আসতে হয়। দু'মুঠো অন্নের জন্য কত কী-ই না করে মানুষ। কাজটা বেঠিক মনে হলে আড়ালে, সবার অগোচরে করতে হয়। এমনকী ঘরে অতিথি এলেও হাজিবায় ছেদ পড়ার জো থাকে না।

সানজিদেবী

চাসু গ্রামে ঢোকার মুখে চাসুনালার উপরে লোহার পুল পার হয়ে মিনিট সাত ঢালের উপরে হাঁটলে পড়ে একটা কাঠের পুল। ছোটা মাতরা রিজ থেকে বেরিয়ে একটা ছোট ঝোরা এই পুলের অল্প নীচে হাঁকপাঁক করে চাসুনালায় গিয়ে মিশেছে। কাঠের পুল ওই ছোট ঝোরা পারাপারের জন্য সম্প্রতি বানানো হয়েছে। আগে ওখানে কোনও পুল ছিল না। বর্ষার ভর মরসুম ছাড়া তার প্রয়োজনও হত না। ওখানের যা কিছু চাষবাস তা ওই ঝোরার কল্যাণেই। ঝোরা সংলগ্ন পুরো এলাকাই সানজিধামের অন্তর্ভুক্ত। বৈচিত্র ও শ্যামলিমায় আশ্রম এলাকা চাসু উপত্যকার অন্যান্য অঞ্চল থেকে একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির।

চোখের সামনে চাসু উপত্যকায় কত পরিবর্তনই না দেখল ধীর। রাস্তা-ঘাট বেড়েছে, শুকনো মাটির অনুর্বর ঢালে ফসল ফলানোর চেষ্টা যথেষ্ট জোরদার হয়েছে; কিন্তু মানুষের দুঃখকষ্ট যেমন ছিল তেমনি আছে। প্রতি গ্রামে দু'চারজন বিত্তশালী মানুষ অন্যদের উপর জুলুম চালায়। অন্যায়ের প্রতিবাদ কবার সাহস হয় না কারও। শাসন ব্যবস্থাব পুরোটাই সরপঞ্চ বা পঞ্চায়েতের হাতে। সাধারণ মানুষের পক্ষে সেখানে প্রতিকার চেয়ে পাওয়া কোনও মতেই সম্ভব হয় না। অর্থবল ও বাহুবল থাকলে এমন প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোনও কিছুরই তোয়াক্কা করার প্রয়োজন হয় না। এ সব খোলাখুলিই ঘটে। সমতলের কৌশলী চাতুর্য পাহাড়ি এলাকার ওজনদার মানুষের এখনও দরকাব পড়ে না।

সানজিধাম বা আশ্রমের শুরু পায়ে চলা রাস্তা থেকে মাত্র দু'ফার্লং দূরে ঢালের উপবে। দূর থেকে দারুণ দেখতে লাগে। এতবার এদিকে এলেও কোনওদিন আশ্রমে যায়নি ধীর। যার কথা সর্বদা মান্য সেই নাংগেলজিও তাকে কোনওদিন আশ্রমে যাওযার কথা বলেননি। অবশ্য তাব আগ্রহ থাকলে সে নিজেই আসতে পারত। মাচদা থেকে আশ্রমেব দূবত্ব মাত্র তিন কিলোমিটার। ধীরেব না যাওয়ার কারণ সম্ভবত আশ্রম পুরোপুরি মহিলা পরিবেষ্টিত স্থান বলেই। ধর্মস্থানের প্রতি তার কোনও বীতরাগ নেই। তবে ধর্মস্থানেব প্রতি তার কোনও বাড়তি অনুরাগও নেই। প্রচুব আচার ও নিযমধারা থাকে প্রতিটি ধর্মস্থানে যা অবশ্য মান্য। কোথাও কোথাও জাতি ও বর্ণভেদে মারাত্মক ভেদাভেদও দেখা যায়। তাব পরও থাকে এমন কিছু অবশ্য পালনীয় বিধিব্যবস্থা যা তার কাছে প্রায়শই অনাবশ্যক বলে মনে হয়। পাছে কোথাও কোনও অঘটন ঘটিয়ে ফেলে এই আশঙ্কায় ধীর প্রায় সর্বদাই আশ্রম অভ্যন্তর থেকে দূরে থাকে। দিরাং বিশ্বাস করে শুভ কাজে যাওয়ার আগে সানজিধামে পুজো দিলে সুফল লাভ করা যায়। হতে পারে। দিরাং লাকা-র মতো বন্ধু মানুষের বিশ্বাসকে সে সম্মান করে।

এত কাছ থেকে আশ্রমের চৌহদ্দি প্রথম দেখল ধীর। তিনটি স্তরে সানজিধামকে ভাগ করা যায়— উপরিভাগ, মধ্যভাগ ও নিম্নভাগ। উপরের স্তবে পড়ে প্রধান উপাসনা গৃহ, আবাসস্থল, চিকিৎসা কেন্দ্র ও প্রশাসন বিভাগ। মাঝখানে বিশাল উৎসব প্রাঙ্গণ ও ভোজনালয়।

নিম্নভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ক্ষেত ও খামারবাড়ি। মধ্য ও নিম্ন ভাগের খাস সীমানায় কয়েকটি স্বতন্ত্র কক্ষ। দিরাং-এর ধারণা ওগুলি অতিথিশালা। এ ছাড়া সানজিধামের প্রবেশ দ্বার পার হলেই পড়ে সাধারণ বা বারোয়ারি উপাসনা গৃহ। তার অল্প নীচেই পবিত্র উষ্ণকুণ্ডের অবস্থান। যা নামে গরম কুণ্ড হলেও কুণ্ডের জল হাতে গরম মাত্র। তবে ঐ উচ্চতায় এমন এক উষ্ণকুণ্ড সানজিধামের মাহাত্ম্য প্রসারে সহায়কও বটে।

আবাসগৃহের নির্মাণশৈলী দেখলেই বোঝা যায় সেখানেও দু'টি ভাগ। একভাগের বিশাল এলাকা জুড়েত্রিতল কক্ষের সমাহার যেখানে বিভিন্ন স্তরের আশ্রমিকরা থাকেন। শক্ত পাথর দিয়ে মজবুত গঠন। তুলনায় খর্বকায় গুটিকয়েক গৃহ প্রধান উপাসনা গৃহের গা ঘেঁষে অবস্থিত। খুব সম্ভবত সানজিমাতার আবাসস্থল ওই গৃহগুলির মধ্যেই কোন একটিতে হতে পারে। ওখানের অনেক কক্ষই একান্ত ব্যক্তিগত। শোনা যায় ওই এলাকা সম্বন্ধে বিশেষভাবে গোপনীয়তা মেনে চলেন আশ্রমিকরা। বেশির ভাগ আশ্রমিক কন্যারই ওইসব কক্ষে প্রবেশ নিষেধ।

একটা ব্যাপার সে ঠিক বুঝতে পারল না। সানজিধাম মাচদা থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে। উপত্যকায় প্রথম বিদ্যুতের আলো পৌঁছে গেল সেখানে। এলাকার পবিত্রতম স্থান হিসাবে স্থানীয় ছাড়াও দূরদূরান্ত থেকে ভক্তবৃন্দ আসেন সেখানে। পিতসি থেকে মাচদা পর্যন্ত রাস্তায় এখন জিপ ছাড়া বাসও আসতে শুরু করেছে। অথচ ওই তিন কিলোমিটার পথ আর সুগম্য করা গেল না! মানুষ ছাড়া ওই পথে কোনও মতে খচ্চর যেতে পারে। এত ব্যাপক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র হয়েও এমন একটা মারাত্মক অসুবিধে নিয়ে ঘর করার রহস্যই বা কী হতে পারে! অবশ্য একটা কারণ সানজিমাতাকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। আশ্রমের দোরগোড়ায় গাড়ির আনাগোনায় পরিবেশ দূষণ অনিবার্য হয়ে পড়ার আশঙ্কা। বা হয়তো মাতাজি বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর দর্শনের জন্য অল্প করে হলেও দুর্গমতার সঙ্গে সহবাস একান্ত জরুরি।

চাসু উপত্যকার কোনও এলাকাই এত শান্ত নয়। একটা আলাদা অনুভূতি হয় ধীর বিশ্বাসের। ঢালের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়েসবুজ ফসলের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। আলু, বিনস্, মটরশুটি, রাইশাক ছাড়াও টম্যাটো ফলানোর বৃথা চেষ্টা নজরে এল তার। টম্যাটো বোধহয় পাহাড়ি মাটিতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে না। অন্যান্য এলাকা প্রায় বৃক্ষহীন বলেই আশ্রমের চতুর্দিকের সবুজের ছোঁয়া এমনিতেই মনে আনন্দের জোয়ার তোলে। সাচ্চুধুরা যাওয়ার পথে দিরাং পুজো দেওয়ার আর্জি না জানালে সম্ভবত সানজিধাম তার কাছে অধরাই থেকে যেত। এতদিন ওখানে না আসার জন্য নিজের প্রতি বিরক্ত হল ধীর। আসলে হানাহানি স্বার্থ-দ্বন্দ্ব যেখানে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার সেখানে এমন অপূর্ব স্থান থাকতে পারে তার ধারণায় আসেনি। উপত্যকার ময়লা সম্ভবত আশ্রমে ঢুকতে পারে না। ইরিকা টোর ও আপাং কেনি তার জন্য আশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। থাকতে পারলে দারুণ হত। অথচ সেই নিয়ে কী কাণ্ডই না

ঘটে গেল। নিজের প্রতি আর একবার বিরক্ত হল ধীর।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার। ইরিকা ম্যাডাম গতরাতেই তার সঙ্গে এক যুবকের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। কী যেন নাম — মানজু সালান। সে আবার সম্পর্কে সানজিদেবীর ভাই। কাল তার সঙ্গে ধীর মৃদু সৌজন্য বিনিময় করেছিল মাত্র। একটু খেলিয়ে আলাপটা করে রাখলে পারত সে। বলা যায় না, কাজে লাগতে পারত। মাতাজির ভাই বলে কথা। হঠাৎ দেখে সেই মানজু সালান। ধর্মস্থানের লীলা সত্যিই বোঝা ভার!

সুঠাম স্বাস্থ্য মানজু সালানের। মাথায় ঘন চুলের হুড়োহুড়িতে কপালের ঘের অনেকটা ছোট মনে হয়। হালকা গোঁফের রেখা। গোঁফওয়ালা মানুষ এলাকায় কম দেখা যায়। বয়স তিরিশ থেকে আরও দু'এক বছর বাড়ানো যায়। ভাল গাইড মানজু, ইরিকাই বলেছিলেন। কিন্তু চেহারার মধ্যে চোয়াড়ে আদলের অভাব। বেশ পরিপাটি দেখনদারি গেটআপ। সুন্দরী মহিলার দঙ্গলে চমৎকার মানায়। খুব ব্যস্ত মনে হল তাকে। হনহন করে নামতে গিয়ে হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

— নমস্তে সাব্!

— নমস্তে সালানভাই!

— আপকা বারে মাতাজিকো ম্যায় সব কুছ বাতা দিয়া। জরুর মিলনা উনসে। থোড়া জলদিমে হ্যায়! ফির মিলেঙ্গে সাব্।

ধীরের উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে দ্রুত নামতে থাকে । মানজু সানজিমাতার সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দিয়ে গেল বটে কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব তা বুঝতে পারল না ধীর । যা গুরুগম্ভীর পরিবেশ। কুণ্ড থেকে জল নিয়ে বারোয়ারি পুজোমণ্ডপে অপেক্ষা করছিল দিরাং। মিনিট পনেরোর মধ্যে পুজো শেষ হওয়ার কথা। মিনিটি কুড়ি পরও দিরাং-এর দেখা নেই। আধঘন্টার বেশি আশ্রমে থাকলে উপরে এগোতে সমস্যা হতে পারে। পুজো দেওয়ার ব্যাপারে রাজি হয়ে ঠিক করেনি ধীর। কম করে ছ'ঘন্টার কঠিন পথ সামনে। দিরাং-এর তো সেটা না জানার কথা নয় ।

এদিক ওদিক যে ঘুরে দেখবে তারও উপায় নেই । সর্বত্র মেরুন আলখাল্লায় মোড়া মহিলাদের নজরদারি । নামেই আশ্রম। কেমন যেন ঘেরাটোপের মধ্যে সব । সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক । ম হিলাদের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় পুরুষদের যাতায়াত অবাধ হবেই বা কেন। সানজিদেবী সহসাই তার কাছে বেশ মহার্ঘ মহিলা হয়ে উঠেছিলেন, টের পেল ধীর । যথেষ্ট এলেমদার মহিলা এই সানজিমাতা, মানতেই হয়। ঝুড়িভর্তি বদ মানুষের খাসতালুকে থেকেও তিনি আশ্রমকে তার ছোঁয়া থেকে দূরে রেখেছেন। সর্বোপরি, চাসু উপত্যকা ছাড়াও অন্যান্য এলাকার মানুষজনের কাছে সানজিধামকে মর্যাদামণ্ডিত করে তুলেছেন।

হঠাৎ দিরাং এসে হাজির! খুব খুশি হল ধীর। দিরাং দেরি করায় তার উদ্বেগ বাড়ছিল। স্যাক পিঠে তুলে এবার উঠে পড়ার অপেক্ষা। কিন্তু ঘটনা অন্য। পুজো না সেরে হন্তদন্ত হয়ে দিরাং-এর তার কাছে আসার কারণ সানজিমাতা ধীরের সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি প্রধান উপাসনাগৃহের কোনও একটা কক্ষে তার সঙ্গে কথা বলবেন। এই খবরটা দেবার জন্য তার সহসা আগমন। অবাক হওয়ারও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল ধীর। বলে কী দিরাং! সানজিমাতা তার সঙ্গে দেখা করতে চান!

পুজোর কাজে ফিরে যাওয়ার আগে দিরাং কয়েকটা জরুরি কথাও জানিয়ে দিয়ে গেল। সানজিমাতা মঙ্গল ও শনিবার মৌনী থাকেন। সেদিন ছিল শনিবার সুতরাং যা কিছু উনি বলবেন বা জানতে চাইবেন তা উনি লিখে দেবেন। কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করা চলবে না। ধীর কেবল উত্তর দিতে পারে। চড়া রহস্যের ঘ্রাণ তার নাকে এসে হঠাৎ ধাক্কা মারল ।

দিরাং ফিরে যাওয়ার পরই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এক মহিলা এলেন। মুখ ছাড়া তাঁর সারা শরীর অন্যান্যদের মতোই মেরুন আলখাল্লায় আবৃত। পনেরো মিনিট টানা হাঁটার পব প্রধান উপাসনাগৃহের পিছনে গিয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়লেন। পিছন ফিরে ইশারায় ধীরকে তিনি জুতো খোলার নির্দেশ দিলেন। জুতো খুলে সে দাঁড়াতেই মহিলাটি শরীর ঝুঁকিয়ে শোয়ানো কাঠের পাল্লা টেনে উপরে তুললেন। ওই পাল্লার উপরে তারা কয়েক সেকেণ্ড আগেই দাঁড়িয়ে ছিল । খোলা পাল্লার মুখ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে হয়। অর্থাৎ আণ্ডারগ্রাউণ্ড চেম্বার । হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন চেম্বার সে আগেও দেখেছে। তবে সানজিধামের আণ্ডারগ্রাউণ্ড চেম্বার দেখলে চমকে যেতে হয়।

ছিমছাম হয়েও রাজকীয়। দৈর্ঘে- প্রস্থে বিশাল। সব সুন্দরভাবে সাজানো। একপাশে পালিশ করা কাঠের চেয়াব সাবি দিয়ে পাতা। প্রতিটি চেয়ারের উপব পশমী কুশন। অন্যদিকে একটা ডিভান সাইজের খাট। উপরে আগুন রঙের তোষক পাতা। তার দু'ধারে দুটি একই মাপের প্রস্তরদণ্ডের উপর দুটি পিতলের কলস। চেম্বারের সিলিং মেরুন রঙের মোটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। পাতলা কার্পেট দিয়ে সারা মেঝে মোড়ানো। ফায়ারপ্লেসের অংশটা ছাড়া দেওয়ালময় দর্শনীয় রঙিন কারুকার্যে ভরা । সমতলের মধুবনী পেন্টিং-এর সঙ্গে ওই কারুকার্যের প্রভূত মিল খুঁজে পেল ধীর। পিছন ফিরে দাঁড়ানো মেয়েটিকে আর দেখতে পেল না সে । কোনও শব্দ হল না অথচ একটা আস্ত মানুষ গায়েব! বুঝল, মাতাজির কৃপায় সবই সম্ভব।

উপর থেকে নীচে নেমে ধীর ও মেয়েটি চেম্বারের যেদিক দিয়ে ঢুকেছিল ঠিক তার উলটো দিকের দরজা সে সময় খুলে গেল । দরজা লেগে গেলে মনেই হয় না ওখানে কোনও দরজা আছে । খোলা দরজা দিয়ে সেই একই মেরুন আচকান পরিবৃতা হয়ে দু'জন মহিলা ঘরে ঢুকলেন। একজন দীর্ঘাঙ্গী অন্যজন স্বাভাবিক উচ্চতার । দীর্ঘাঙ্গী মহিলাটি কোনওদিকে

না তাকিয়ে সোজা ডিভানে এসে বসলেন । তাঁর শরীরের চারপাশে মেরুন আলখাল্লা ওভারকোটের মতো ছড়িয়ে থাকল । অন্য মহিলাটি ডিভান থেকে ফুট দশ দূরে একটা চেয়ার রেখে ধীরকে ইশারায় বসতে বললেন। ওই চেয়ারে বসে সামনে তাকালে ডিভানে বসা মহিলার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকতে হয় । কম আলোর মধ্যেও ব্যাপারটা অস্বস্তিকর।

ধীরের বুঝতে অসুবিধে হল না ডিভানে বসে থাকা মহিলাটিই সেই বহু আলোচিত সানজিদেবী। মুখের সামনের অংশ ছাড়া দেখার কিছু না থাকলেও ধীর নিষ্পলক নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু সানজিদেবীর দৃষ্টি অন্যত্র পর্যবেক্ষণ-ভঙ্গিমায় প্রসারিত । ভারী মিষ্টি মুখ তাঁর। ধর্মের বাতাবরণে এমন মুখের উপস্থিতি অনেক কিছুই এক লহমায় বদলে দিতে পারে। ঘরের মধ্যে তারা তিনজন অথচ ধীরের মনে হল যেন প্রচুর মানুষ সানজিমাতার দর্শনের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

অন্য মহিলাটি দুটি পিতলের কলস থেকে হাত ঢুকিয়ে সুন্দর দুটি ধূপদানি বের করে কলসমুখে স্থাপন করলেন। প্রস্তরদণ্ডের আড়াল থেকে ধূপকাঠি নিয়ে ধূপদানিতে জ্বেলে দিলেন। মহূর্তের মধ্যে ভুরভুরে জুঁইফুলের গন্ধে সারা ঘর আমোদিত হয়ে গেল। ডিভানের তলা থেকে একটা হাফ-টুল বের করে মহিলাটি সানজিমাতার বামদিকে রেখে বসলেন। মিনিট দুই বিড়বিড় করে চোখবন্ধ অবস্থায় কোনও মন্ত্র পাঠ করলেন দুই সন্ন্যাসিনী। তারপর নতমস্তক হলেন। ধ্যানপর্ব শেষ হতেই মহিলাটি মাতাজির পাশে এসে দাঁড়িয়ে হালকা চিৎকারে আওয়াজ তুললেন—জয় দেবীমাতাকি জয়! কেউ না বললেও সেই চিৎকারে ধীরও শামিল হল। তার পরই দেবীমাতার চোখের ইশারায় ইনটারভ্যু শুরু হয়ে গেল। মাতা মৌনী সুতরাং তাঁর কথা কাগজ থেকে পড়ে শোনানো হল। ধীর ও দেবীমাতার মধ্যে ভাঙাচোবা হিন্দিতে যে কথা হল তার সংলাপ বাংলায় তর্জমা করলে কিছুটা এরকম দাঁড়ায়।

— সানজিধামে আপনাকে স্বাগত জানাই।

— আপনার দর্শনলাভ সৌভাগ্যে আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ আপনাকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর আবার প্রশ্নপাঠ।

— গতকাল এখানে আপনি কেন আসতে পারেননি আমি খবর পেয়েছি। এখন আমার মনে আর কোনও ক্ষোভ নেই।

— আপনার সহানুভূতির জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কোনও এক সময় আশ্রমে আপনার অতিথি হওয়ার বাসনা রইল।

তার মতো অতি ক্ষুদ্র একজনের সানজিধামে না আসার জন্য দেবীমাতার ক্ষোভের কারণ কী হতে পারে বুঝে উঠতে পারল না ধীর। উটকো একজন পুরুষমানুষ আশ্রমে থাকতে

চাইলে তো অসুবিধে হওয়ার কথা। ইরিকা বলেছিলেন, সানজিদেবীকে অনেক বলেকয়ে রাজি করাতে হয়েছিল। উনি প্রথমে কিছুতেই রাজি হতে চাননি। অথচ সে না আসায় প্রথমে উনার ক্ষোভ হয়েছিল। এমন কি হতে পারে — উনি সাগ্রহে রাজি হয়েছিলেন কিন্তু তাকে অন্য গল্প শোনানো হয়েছিল? উদ্দেশ্য ছিল যাতে সে আশ্রমে রাত্রিবাস করতে বাধ্য হয়। তা না হওয়াতে হঠাৎ আপাং কেনি যেভাবে বদলে গেল তাতে সে সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে পারল না ধীর।

— বহুদিন ধরেই আপনি এদিকে আসছেন। গত দশ বছর ধরে আমি আশ্রমে আছি কিন্তু এখানে আপনি কখনও আসেননি।

কী বলবে ভেবে পেল না ধীর। কোনও প্রশ্ন করেননি সানজিদেবী তাও ওই আপাত নিরীহ মন্তব্যে প্রচুর ক্ষোভ ধরা ছিল। অকারণে তাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলছিলেন। আসল কারণটা চেপে যেতে চাইল ধীর।

— হাতে কম সময় অথচ অনেক জায়গা ঘুরতে ইচ্ছে করে। শেষদিকে আর সময় থাকে না। তাই হয়তো আশ্রমে আসা সম্ভব হয়নি।

বোধহয় সন্তুষ্ট হননি। কাগজে কী যেন লিখলেন সানজিদেবী। তার মানে লিখিত প্রশ্নে কিছু যোগ হল। মহিলাটি সেটা পড়ে দিলেন।

— আমি শুনেছিলাম মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত আশ্রম বলেই আপনি এদিকে আসতে চান না।

তার আড়াল করা কথা কি সামনে চলে এল? অনেকটাই। তবু ব্যাপারটা খোলসা করে দিতে চাইল ধীর। সানজিদেবীর বিশাল প্রভাব ও পরিচিতি এদিকে। অনর্থক চাপে পড়তে সে রাজি নয়। তাঁকে সন্তুষ্ট করাই তখন তার প্রধান দায়।

— একদিক দিয়ে সেটা সত্যি। তবে কারণ ভিন্ন । আমার ধারণা, মহিলা পরিচালিত আশ্রমে পুরুষদেব অবাধ প্রবেশ প্রায়শই অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই আশ্রমকে এড়িয়ে যেতাম।

ফের কাগজে নতুন কথা লিখে দিলেন দেবীমাতা। সেটি পড়া হল।

— আপনি আশ্রমে এলে আশ্রমবাসিনীরা খুশি হবে। আশ্রমের মূল কাজ শান্তি ও সেবাধর্মের প্রতি মানুষের অবিচল আস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এ ব্যাপারে আপনি কি আমাদের সাহায্য করতে পারেন?

আচমকা এমন একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে ভাবেনি ধীর। কী সাহায্য চান

সানজিদেবী তার কাছে! সীমিত ক্ষমতা হলেও সে আশ্রমের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করতেই পারে। সুন্দর পরিবেশকে আরো সুন্দর করার স্বার্থে সেটা এমন কিছু নয়।

— অবশ্যই। ফিরে গিয়ে আমার সাধ্যমত অর্থসাহায্য পাঠিয়ে দেব। আপনি তা গ্রহণ করলে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব।

হঠাৎ উজ্জ্বল আলোয় সারা ঘর পরিপূর্ণ হয়ে গেল। যে মেয়েটি তাকে সঙ্গে করে চেম্বারে নিয়ে এসেছিলেন সহসা তাঁর প্রবেশ। তিনি ধীর পদক্ষেপে দেবীমাতার কাছে এসে তাঁর শরীর থেকে লংকোট খুলে নেওয়ার ভঙ্গিতে মেরুন আলখাল্লা খুলে নিলেন। ফলে তাঁর হস্তযুগল বাহুমূল থেকে দৃশ্যমান হয়ে পড়ল। রেশমি কেশদাম শীর্ষমূলের হালকা খোঁপা থেকে কাঁধ ও পিঠের চারিদিকে আকর্ষণীয় ব্যঞ্জনায় ছড়িয়ে পড়ল। শরীরের রঙে পরিধেয় ঘিয়ে রঙের স্নিগ্ধ জৌলুসে তখন অনিন্দ্য আভা। ওইদিন সানজিদেবী কি নিজেকে আরও বেশি সুন্দরী করতে চেয়েছিলেন? তার অনুমান সত্যি হলে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে সানজিদেবী সফল হয়েছেন। ধীর জীবনে এত সুন্দরী মহিলা দেখেনি।

এবাব প্রশ্নপাঠের দায়িত্ব বদল হল। এতক্ষণ যিনি ওই কাজে সাহায্য করছিলেন তিনি অদৃশ্য হলেন।

— আশ্রম আপনার কাছে কোনও অর্থসাহায্য প্রত্যাশা করে না। আপাতত তার প্রয়োজন নেই। অন্য কীভাবে আপনি আশ্রমকে সাহায্য করতে পারেন তা নিয়ে পরে, আপনি ফিরে এলে, আলোচনা করা যেতে পারে।

অন্য আর কীভাবে সে আশ্রমের সাহায্যে লাগতে পারে বুঝতে পারল না ধীর। জানার ইচ্ছে থাকলেও প্রশ্ন করা বারণ তাই চুপ করে থাকল সে। তবে পরের প্রশ্নে তাকে বিষম খেতে হল।

— ইরিকা টোর আশ্রমের আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে অর্থ সাহায্য করতে চান। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত জানতে চাই।

একটু নড়েচড়ে বসতে হল ধীর বিশ্বাসকে। খুব কাছের মানুষ না হলে তো কেউ অভিমত চায় না। মাত্র মিনিট পনেরোর পরিচয় তার সানজিদেবীর সঙ্গে। তাও শুধু মুখোমুখি দু'চার কথার লিখিত আদানপ্রদান মাত্র। এমন অকারণে গুরুত্ব চিন্তা বাড়ায়। রহস্যকে বেশি বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

— ম্যাডাম ইরিকার সঙ্গে আমার পরিচয় বলতে মাত্র দু'দশ মিনিটের আলাপচারিতা। মানুষ এবং তার কাজ সম্বন্ধে অভিমত দিতে হলে পরিচয় গভীর হতে হয়।

আবার তাঁর নতুন প্রশ্ন কাগজে লিখে দিলেন সানজিদেবী।

— কিন্তু ইরিকা টোর তো আপনাকে অত্যন্ত বিচক্ষণ মানুষ বলে মনে করেন।

ধীর বুঝল সানজিদেবী শুধু সুন্দরী মহিলাই নন, তিনি একজন দক্ষ প্রশাসকও বটে। প্রয়োজনে উকিলের মত জেরা করে ঘুরিয়ে উত্তর আদায় করতে পারেন।

— এটা ওনার মহানুভবতা। কাউকে ভালোভাবে জানতে হলে আমার সময় লাগে। উনি হয়তো দু'চারকথা বলেই সবকিছু বুঝতে পারেন।

সানজিদেবীর চোখ হঠাৎ ধীরের মুখের উপর নিবদ্ধ হল। পঁয়তাল্লিশ বছরের এক প্রৌঢ়ের ঘোলাটে চোখের উপর যখন পঁয়ত্রিশ বছরের এক পরমা সুন্দরী মহিলার চোখ স্থির হয় তখন ভূমিকম্প হওয়ার কথা কিন্তু হল না। সম্ভবত প্রথম গেমটা অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হল। কারণ দেবীমাতার মুখের মধ্যে স্মিতহাস্য ধীরের চোখে ধরা পড়ার মুহূর্তে তিনি নিজেকে সংযত করে নিলেন। ঠিক সেই সময় আবার প্রশ্ন পড়া শুরু হল। তবে নতুন কোনও প্রশ্ন যোগ হল না।

— পাহাড় ঘুরে এ পথে ফিরতে ক'দিন লাগবে বলে আপনার মনে হয়?

— দশদিন।

এবার প্রশ্নকারী মেয়েটি হঠাৎ ঘরের জোরালো আলোগুলি নিভিয়ে দিলেন। পুনরায় সেই ডিম আলোর আবছা অন্ধকার ঝপ্ করে সারা ঘর দখল করে নিল। প্রশ্ন শেষ মনে করে উঠতে যাবে ধীর এমন সময় আবার প্রশ্ন ভেসে এল।

— আপনার সম্প্রদায়?

পাহাড়-হিমালয়ে অনেকেই দু'পাঁচ কথার পরেই একজন কোন জাতিভুক্ত তা জেনে নিতে চায়। অন্য কোথাও হলে বিস্তর বিপ্লবী কথাবার্তা বলতে পারত ধীর কিন্তু ওখানে তা অবান্তর। সানজিদেবীর সবকিছুই বেশ মানানসই, ঢাকনায় মোড়া। সরাসরি তার জাতি না জানতে চেয়ে সম্প্রদায় কথাটা ব্যবহার করেছেন। এমন প্রশ্ন ওখানকার মানুষজনের কাছে খুবই স্বাভাবিক অনুসন্ধান। সে যে নিম্নতম সম্প্রদায়ভুক্ত অর্থাৎ পাহাড়ি পরিভাষায় জনজাতি সেটা বলে দিলে অনিবার্যভাবেই তার গুরুত্ব হ্রাস পাবে। সেই সুযোগ হঠাৎ তার সামনে। প্রথম পরিচয়েই তার ধারণা হয়েছে দেবীমাতা বড় কঠিন ঠাঁই। দূর থেকে সে আশ্রমকে নমস্কার জানাতে চায়। মাতাজির স্নেহধন্য হওয়ার তার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই। সুযোগটা তাই সে হাতছাড়া করতে চাইল না।

— জনজাতি!

— সানজিধামকো আপ আপনা ঘর সমঝ্ কর আইয়েগা। ইসকা দরওয়াজা আপকা

লিয়ে হামেশা খুলা রহেগা।

— এমন উলটো ঘটনা ঘটতে পারে ধীর মোটেই ভাবেনি। তার হিসাব মিলল না। অবাক হল সে — সানজিধামে জনজাতির কদর!

তার বিস্ময় কাটার আগেই অতর্কিতে একটা তৃতীয় কণ্ঠস্বর ধারাবিবরণীর স্টাইলে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়ে দিল। এক, দেবীমাতা এবার ধীর বিশ্বাসকে তাঁর একজন ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হিসাবে সম্মান জানাবেন। দুই, সম্মান জানানোর পদ্ধতি হল, দেবীমাতা পিছনে দাঁড়িয়ে ধীরের কণ্ঠে তাম্রধার পরিয়ে দেবেন। তিন, গত দশ বছরে এমন সম্মান এর আগে মাত্র চারজন পেয়েছেন। ধীর হবেন পঞ্চম ব্যক্তি। চার, এই সম্মান একান্তই গোপনীয় অর্থাৎ কোনও অবস্থাতেই অন্যত্র আদান প্রদানের বিষয় নয়। পাঁচ, তাম্রধার কণ্ঠে পূর্ণ একদিন ও একরাত ধারণ করার পর খুলে কোনও পবিত্র জলধারায় দান করার নির্দেশ দেওয়া হল।

তার পরের ঘটনা ধীরের পুরোটা স্মরণে নেই। শুধু তাব মৃদু মনে পড়ে, তাম্রধার পরানোর সময় সানজিদেবীর হস্তযুগল ও বক্ষদেশ ধীরের শরীর ঈষৎ স্পর্শ করেছিল। এর কারণ তিনটি হতে পারে বলে তার ধারণা। এক, একজনের বন্ধুত্ব লাভ করতে তিনি অসম্ভব তাড়াহুড়ো করেছিলেন তাই কিছুটা অস্থির ছিলেন। দুই, আবছা আলোয় দেবীমাতা সবকিছু ঠিকঠাক ঠাহর করতে পারেননি। তিন, বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতাকে তিনি মুহূর্তের জন্য হালকা গভীরতা প্রদান করতে চেয়েছিলেন। এর মধ্যে কোনটা বা সবগুলোই একটু একটু করে ঠিক কি না তা ধীরের পক্ষে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত ইন্টারভ্যু-পর্ব সত্যি সত্যি শেষ হল। মুহূর্তেব মধ্যে ঘর ফাঁকা। যেমনভাবে একজন তাকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড চেম্বারে নিয়ে এসেছিলেন ঠিক সেভাবেই অন্য আর একজন তাকে উপরে নিয়ে এলেন। উপরে উঠে আসার সময় তাকে অতিরিক্ত সম্ভ্রম দেখানো হয়েছিল বলে মনে হল ধীরের। এতে তার কী লাভ হল ঠিক বুঝতে পারল না ধীর। তবে কিছুটা ঘোরের মধ্যেই সে তার রুকস্যাকের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘোর কাটতে দেখে পুজোর ফুল হাতে দিরাং তার সমনে। ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা অর্থাৎ ইন্টারভ্যু চলছিল প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে।

"চলো সাব্, বহত রাস্তা পার করনা হ্যায়।"

পিঠে স্যাক তুলে নীরবে দিরাং-এর পিছনে হাঁটতে থাকে ধীর। বারে বারে আশ্রমবালা সানজিদেবীর মুখ তার সামনে ভেসে উঠছিল। এমন একজন সন্ন্যাসিনী খোদ চাসু উপত্যকায় বসে আর্ত মানুষের সেবায় নিয়োজিত এটা ভাবলে তাব অবাক লাগে। পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে কল্পনা বলে মনে হল। মহিলা আশ্রমের স্বার্থে যে কোনও মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিতে অনেক দূর যেতে পারেন। তবে তিনি সুযোগ সন্ধানী এমন ভাবার কোনও

কারণ দেখতে পেল না ধীর। আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব সামলানো খুব কঠিন কাজ। চাসু উপত্যকার মতো অনাসৃষ্টির মহামুলুকে সে দায়িত্ব প্রায় অসাধ্যসাধন। কিছুটা কৌশলী ও করিৎকর্মা না হলে যে সমূহ বিপদ তা ভালই জানেন দেবীমাতা।

একটা ব্যাপারে ধীর অবশ্য এখনও বেবাক বিস্ময়ে। ওই সময় সে যে ওখানে এসে উপস্থিত হতে পারে এ খবর তো আশ্রমের কেউ জানত না। নেহাত দিরাং পুজো দিতে চাইল তাই তার আসা। এত দ্রুত তৈরি করা প্রশ্নের সামনে তাকে ফেলতে হলে আগাম ব্যবস্থা নিতে হয়। তা হলে কি এসব গতকালই সানজিধামে তার রাত্রিবাসের সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে আগাম তৈরি করে রাখা ছিল? সানজিদেবী কি তাকে আশ্রমের সীমানায় টেনে আনার জন্য কারও সাহায্য নিয়েছিলেন?

আগন্তুক

বেশ কিছুটা দূরে দিরাংকে দেখতে পেল ধীর। বিনা নোটিশে এমন এক জব্বর নাটকে একমাত্র পুরুষ চরিত্রে তাকে অভিনয় করতে হল। অথচ তার কোনও অসুবিধে হল না। অনায়াসে উতরে গেল। সম্ভবত ওই নাটকের দৃশ্যে বুঁদ হয়ে তার চলার গতি ব্যাহত হয়ে পড়ছিল। দ্রুত পা চালিয়ে সে বাঁকের মুখে দিরাংকে ধরে ফেলল।

— ক্যায়া বাত সাবজি. আপ ইতনা ঢিলা চল রহা? কোই মুসিবতি?

— না না , কোনও মুসিবত নেই। আমি সানজিদেবীর কথা ভাবছি।

সানজিদেবীর প্রসঙ্গ আসতেই দিরাং খুশিতে উপচে পড়ল।

— মাতাজি দেবী হ্যায় সাব্। ইনকি কহনা হমলোগ বহত মানতে। মাতাজি আপকা লিয়ে বহত দিন সে ইন্তেজার মে থি। বাত হুয়া সাব্?

অবাক হল ধীর! সানজিমাতা তার জন্যে অনেকদিন ধরে অপেক্ষায় ছিলেন। তার মানে?

— মাতাজি যে আমার সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষায় ছিলেন, এটা তুমি জানলে কী করে, দিরাং ভাই?

— বিনতিনে মুঝে বোলা।

— বিনতি সেটা কীভাবে জানল?

— লালানে বোলা হোগা।

একটু ভাবতে হল ধীরকে। কেনি অর্থাৎ লালাজি তাকে তো একথা কখনও বলেনি। এ ব্যাপারে এত গোপনীয়তারই বা কী থাকতে পারে। অবশ্য যে নাটক কিছুক্ষণ আগে মঞ্চস্থ হল তারপর ভাবা স্বাভাবিক যে কারণ থাকলেও থাকতে পারে।

— ভাল কথা। কিন্তু লালাজি এটা কার কাছে জানল?

— সায়েদ মাতাজি খুদ বাতায়ি হোগি।

এবার কিছুটা ধোঁয়াশা কাটল ধীর বিশ্বাসের। আশ্রমে তার হঠাৎ পৌঁছে যাওয়ার ব্যাপারে অনেকে একযোগে কাজ করে গেছে। মাতাজি কেনিকে বলেছেন। তারপর সেই কথা বিনতির কাছ হয়ে দিরাং-এর কাছে আসে। দিরাং তাকে আশ্রমে এনে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছে। পুজোকে পুজোও হল এবং সাক্ষাৎকার ঘটানোর কাজটাও চমৎকার ভাবে ঘটে

গেল। এর মধ্যে মূল কৌশলী যে কেনি—এ বিষয়ে তার কোনও সন্দেহ নেই। কিছু ভূমিকা ইরিকা ম্যাডামেরও থাকতে পারে। বিনতি ও দিরাং এ পালায় আজ্ঞাবহ মাত্র।

আপাং কেনির হোটেলে হঠাৎ তার থাকার মতো জায়গা হল না এটা কি তাহলে একটা ছক? আর মালপত্তর না দেওয়াটা সেই ছক ভেস্তে যাওয়ার ফলে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ মাত্র? ঘটনা যাই হোক তার বিস্ময় অন্য কারণে। সেই বহু প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎকার ঘটল। মাত্র মিনিট চল্লিশ কথাবার্তাব মধ্যে সানজিদেবী কী এমন আবিষ্কার করলেন যে ধীর বিশ্বাসকে তাম্রধার প্রদান করে সম্মান জানাতে বাধ্য হলেন? বিশ্বাসে কোথায় যেন টাল খায়। মৃদু, কিন্তু খায়।

দিরাং তার ঠিক পিছনে পাথরের উপর পা তুলে জুতোর ফিতে বাঁধার সময় জানতে চাইল।

— মাতাজিকি সাথ ক্যায়া বাত হুয়া সাব্?

মাতাজির সঙ্গে সাহেবের কী কথা হয়েছে দিরাং তা জেনে নিতে চায়। যার সঙ্গে স্বয়ং মাতাজি কথা বলতে চান দিরাং-এর কাছে সে মোটেই সাধারণ মানুষ নয়। বানানো কথা বলে দিরাং লাকা-র মধ্যে কিছুটা মানসিক চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়ে গেল ধীর।

— মাতাজি তোমার উপরে খুব অসন্তুষ্ট। হয়তো তোমাকে ডেকে পাঠাতে পারেন।

হঠাৎ তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সরল মানুষ দিরাং। মাতাজির প্রতি ভক্তি তার এতই অবিচল যে, এটা যে নিছক মনগড়া কথা তা তার মনেই হল না।

— কিঁউ, ম্যায়নে কিয়া ক্যায়া?

— তুমি দারু খেয়ে হল্লা কর, বিনতিকে গালাগালি দাও, ভয় দেখাও এসব তো সবাই জানে। তাছাড়া রোজগার-কামাই না করে মাতাল হয়ে টোটো করা তো আছেই। মাতাজিকে খুব বিরক্ত মনে হল।

চুপ করে থাকে দিরাং। সাহেবের সব কথাই ঠিক কিন্তু তা যে শেষ পর্যন্ত মাতাজির কানেও চলে যেতে পারে এটা কখনও তার মাথায় আসেনি। কারও বিচ্যুতি এভাবে সামনে এসে দাঁড়ালে সে অসহায় বোধ করে। দিরাং-কে দেখেও ধীরের তাই মনে হল।

— ক্যাযা করেঁ সাব, ইয়ে শালে লালানে মুঝে অ্যায়সা বানায়।

আপাং কেনি যে দিরাং-এর এখন একনম্বর শত্রু এটা বিনতির মুখে শুনেছিল ধীর। কিন্তু তেমন গুরুত্ব দেয়নি। সরল নির্বিরোধী মানুষ দিরাং। সে রাগের মাথায় হুংকার ছাড়তে পারে তার বেশি কিছু নয়। তবু ব্যাপারটা সহজ করতে চাইল ধীর।

— এর সঙ্গে লালাজির কোনও সম্পর্ক নেই। কাজ তো তুমিই করতে চাও না। মাতাজি অবশ্য এও বলেছেন মন দিয়ে কাজ করতে চাইলে তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।

— মাতাজি মুঝে মদত করেগে! সাচ্ সাবজি?

— সত্যি কথা দিরাং। মাতাজি সত্যিই সাহায্য করতে চান।

— অওর আপ?

— আমি তো তোমার সঙ্গেই আছি দিরাংভাই।

দিরাং লাকা-র সারা মুখে মিহি আনন্দের ঢেউ উঠল। চুপসে যাওয়া মানুষ হঠাৎ চাঙ্গা হলে ভোজবাজির মতো দৃশ্যপট বদলে যায়। হঠাৎ তার মনে পড়ল তারা সাচ্চুধুরা অভিযানে শামিল।

— চলো সাব, বহত সারি চড়াহি কাটনা হ্যায়।

ঠিক কথা, প্রচুর চড়াই ভেঙে উপবে ওঠার কাজ তাদের সামনে। তারপর আর তাদের মধ্যে কোনও কথা হয়নি। প্রায় পাঁচঘন্টা পর মাতরা নালা পেরিয়ে সামান্য পথ যাওয়ার মাঝে দিরাং কোমরের ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ে। এমন ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। প্রথম দিন ট্রেক করার পরেই দিরাং কখনও কখনও কোমরের ব্যথায় ভোগে কয়েক ঘন্টা। তার পরদিনই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। এবার ঘটল ট্রেক শেষ হওয়ার আগেই। চিন্তা বেড়ে গেল ধীরের। তার হিসেবে আরও ঘন্টা দুয়েকএগিয়ে গেলে ক্যাম্প করার উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যেত। যে ঢালে তারা দাঁড়িয়ে সেখানে তাঁবু ফেলে রাত কাটানো যথেষ্ট ঝুঁকির। মূলত উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার ভয়।

মাতরা নালা পেরোতে দেরি করে ফেলেছিল তারা। পাহাড়ি নালা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খরস্রোতা হতে থাকে। অনেক সময় নিয়ে দড়ির সাহায্যে তারা এপার থেকে ওপারে গিয়েছিল। জলের তলায় পিছল পাথর সারা শরীরকে টাল খাওয়াতে চায়। ভারসাম্য হারালেই গড়িয়ে পড়া অনিবার্য। সব মিলিয়ে খুব সমস্যায় পড়ে গেল ধীর। ক্যাম্প থেকে জল নিয়ে ফিরতে প্রায় একঘন্টা লেগে যাওয়ার কথা। সমস্যার কথা সরিয়ে দিরাংকে দ্রুত বিশ্রাম দেবার ব্যবস্থা করল ধীর। তার যন্ত্রণা বাড়ছিল। সে সুস্থ না হলে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁবু লাগানোর জন্য একটা জায়গা বেছে নিতে হল। বাতাসের ঝাপটা ও পাথরের আঘাত থেকে কিছুটা রক্ষা পেতে একটা বড় বোল্ডারের গা ঘেঁষে তাঁবু লাগাল ধীর। দিরাং-কে তাঁবুতে শুইয়ে দিয়ে মালপত্তর এনে সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করল। জল পেতে তাকে সাচ্চুধুরা যাওয়ার পথে যে ছোট্ট হিমবাহ পড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা নালার কাছে যেতে হল। প্রথমে উৎরাই, তারপর জল নিয়ে চড়াই ভেঙে তাঁবুতে ফিরতে

ঘন্টা পেরিয়ে গেল।

বিকেল চারটের সময় চাসু উপত্যকার মূল ভূ-খণ্ডে রোদ্দুর না থাকলেও তাদের অস্থায়ী শিবিরে পড়ন্ত রোদ হেলে থাকল আরও কিছুক্ষণ। স্টোভ ধরিয়ে কড়া চা বানাল ধীর। সঙ্গে চানাচুর। দিরাং-এর কোমরে মলম ডলে দেওয়ার সময় পাথর পড়ার আওয়াজ হল। বোঝা গেল জায়গাটা যতটা নিরাপদ ভেবেছিল সে ততটা মোটেও নয়। অর্থাৎ বিপদের আশঙ্কা মাথার উপর খাঁড়ার মতো ঝুলে থাকল।

ক্যাম্প থেকে ইটু গ্রাম নাক বরাবর দক্ষিণে। সেখান থেকে গ্রামের মানচিত্র নিখুঁতভাবে ধরা দেয়। ওই গ্রামেই সানজিদেবী জন্মগ্রহণ করেন। এমন কঠিন গ্রাম্য পরিবেশে যাঁর জন্ম, যাঁকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঝঞ্ঝার মোকাবিলা করে বড় হতে হয়েছে তিনি কী করে এত স্মার্ট হন — ভেবে পেল না ধীর। তাঁবুর বাইরে বসে ইটু গ্রামের বিভিন্ন ঘর থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে ওঠার বৈচিত্র তাকে স্থির করে রেখেছিল। স্থানমাহাত্ম্যে অতি সামান্য ঘটনাও সহসা কেমন যেন মনোরম মনে হয়। অথচ ওখানে তাদের তাঁবু পড়ার কথাই নয়। ভাল লাগার সত্যিই কোন ঠিকানা থাকে না।

সাড়ে সাতটা পাহাড়ে বড়জোর পড়ন্ত বিকেল। তবু তার আগেই সারাদিনের একমাত্র বড় খাবার অর্থাৎ ডিনারের তোড়জোড় শুরু করে দিল ধীর। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই দুরন্ত গতির বাতাসের ঝাপটায় নাজেহাল হতে হবে, জানে সে। ডিনার সেরে তার অপেক্ষায় থাকা ছাড়া আর তার হাতে কোনও কাজ নেই। দিরাং-এর সাড় না থাকলেও তাকে নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই। অন্যান্য বারের মতো এবারও সকালেই সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে বলেই তার ধারণা। রান্নার জিনিসপত্র সাজিয়ে বিনস্ আর আলু কেটে মেসটিনে রাখল ধীর। অল্প মটরশুঁটি ছাড়িয়েই স্টোভ ধরিয়ে নিল। মিনিট পনেরো পর সবজির ভুরভুরে গন্ধে জিভে জল এসে গেল তার। সবজি ঢেলে রেখে স্টোভ ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য কিছুটা সময় দিতে হল। বহু ব্যবহারে ছোট্ট সুইডিশ স্টোভ বেহাল হওয়ার মুখে। তবু তাকে গত দশবছর ধরে কখনও বিপদে পড়তে হয়নি। ভাত বসিয়ে কুকারে সিটি পরাতে যাওয়ার সময় দিরাং উঠে বসল। হাতের ইশারায় তাকে তাঁবুর মধ্যে আসতে বলে সে। কাছে যেতেই ধীরকে সে খবরটা দেয়। তার ফ্যাকাসে মুখ আরও ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। শুয়ে থাকার সময়ই হঠাৎ দিরাং টের পায়।

কয়েক বছর আগে নাংগেলজির কাছে একবার শুনেছিল ধীর। সত্যি কথা বলতে কি তার বিশ্বাস হয়নি। পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষজনের কাছেও সে কখনও এমন ঘটনার কথা শোনেনি। সাচ্চুধুরার পথে না গেলেও এর আগে সে আলাপানি ও মাতরা হিমবাহে ঢুকেছিল। এমন ঘটনা তো তখন ঘটেনি। তবে দিরাং পাহাড়ি মানুষ —

সে যখন তার যন্ত্রণার মধ্যেও তাদের গন্ধ ও শব্দ শুনতে পেয়েছে বলে সন্ত্রস্ত বোধ করে তখন সে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না। অতি দ্রুত খেয়ে নেওয়ার জন্য তাড়া দিতে থাকল দিরাং। প্রেসার থেকে সিটি খুলে খাবার নিয়ে বসে গেল দু'জনে। গিরিশিরার আড়ালে তাদের ক্যাম্পে তখন অন্ধকার না থাকলেও আলোর চিহ্ন ছিল না। সন্ধে আড়-ভাঙার পূর্ব মুহূর্ত। তাদের খাওয়ার পাট শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ থেমে গেল।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল ধীর! অনেকের চেয়ে তার ভয়ডর কিছুটা কম বলেই পাহাড়ে একা একা এগিয়ে যেতে সে পিছিয়ে আসে না। দিনের পর দিন পাহাড়ি প্রত্যন্ত এলাকায় তার পাশে কোনও সঙ্গী থাকেনি। তবু তার কোনও অসুবিধে হয়নি। হলেও তা মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। কিন্তু ওই সময় সঙ্গে দিরাং লাকা-র মতো একজন দুরন্ত সাহসী সাথী থাকা সত্ত্বেও সে বিচলিত বোধ করল। প্রায় প্রতিটা বোল্ডারের আড়ালে কোনও হিংস্র জন্তুর উপস্থিতি টের পেল ধীর। ঘটনার আকস্মিকতা তাকে তুলে আছড়ে ফেলতে চায়, মনে হল তার। ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু ভেবে দেখার সে সময় পেল না। আইস অ্যাক্স হাতে তাঁবুর মুখে সান্ত্রি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়া ছাড়া তার কাছে আর কোনও উপায় থাকল না। তাড়াহুড়োয় মেসটিনের খাবাব ছড়িয়ে ছিটিয়ে একসা। তবু সেদিকে তাকানোর মতো সময় থাকল না। যেদিকেই তাকায় মনে হয় কোনও জন্তু যেন আচমকাই তাদের আক্রমণ করতে পারে। তাঁবু তাক করে তেড়ে আসেতে পারে।

প্রমাদ গুনল ধীর। অন্ধকারের শুরুতেই যদি এমন অবস্থা হয় তা হলে গভীর রাতে তো বেদম হয়েও সে কূল পাবে না। দিরাং-এর মতো মানুষ সঙ্গে থাকলেও তাঁবুর বাইরে সে আসতে পারবে না। যা করার তা তাকেই করতে হবে। ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে ক্যাম্প ও মানুষ মিলিয়ে যাওয়ার নয়নাভিরাম ভেলকিবাজি দেখাব পূর্ণমুহূর্ত তার কাছে অধরা থেকে গেল। আপাতত অন্য মাপের হিংস্র ভেলকিবাজের দল তাদের সামনে। ওই জঙ্গি আক্রমণ কোনও মতে প্রতিহত করতে পারাই তার কাছে তখন মূল অভিযান।

এমন দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যেও বেশ কয়েক বছর আগে নাংগেল তাফা-র কাছে শোনা কাহিনী তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কাহিনীর শুরু গৃহপালিত কুকুর নিয়ে। কুকুর মাত্রই প্রভুভক্ত। নিজের পরিচিত এলাকায় অপরিচিত মানুষজন ও অন্যান্য জন্তুজানোযারের প্রবেশ রুখতে জান কবুল করতে তারা দ্বিধা করে না। অপরিচিত মানুষ মানেই তাদের কাছে অবাঞ্ছিত মানুষ। পাহাড়ি এলাকায় পাঁচ-সাতটা কুকুর বিশাল ছাগ ও মেষবাহিনীকে আগলে রাখতে পারে। প্রত্যন্ত পাহাড়ি বুগিয়ালে অতর্কিতে হিংস্র জন্তুর হানা রুখতে মেষপালকরা কুকুরবাহিনী সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করে। সেই সব পেল্লায় কুকুর দেখলে শরীরে হিম ধরে যায়। আকৃতি ও দাপটে তারা সময় সময় হিংস্র নেকড়েকেও হার মানাতে পারে। তবে ওই কুকুর প্রয়োজনে যতটুকু হিংস্র হওয়া দরকার তার বেশি কখনও হিংস্রতা দেখায় না। এমনকী কোনও অপবিচিত মানুষ তার কাছে মোটেই ক্ষতিকর নয় এটা বুঝতে পারা মাত্র সে অনায়াসে

তার অনুগত হতে পারে। এ এক অদ্ভুত নমনীয় সম্প্রসারধর্মী প্রবৃত্তি — স্বভাবে সহজাত প্রক্রিয়ায় গ্রোথিত। বুদ্ধিতে যার সহজ ব্যাখ্যা মেলে না।

কর্তব্য পালন করতে গিয়ে এমন অতন্দ্র প্রহরীও অবস্থার ফেরে খাদ্য বনে যায়। কোনও শত্রুদলকে তাড়া করে এগিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা একটা ঘটনা ঘটে। পাঁচটা কুকুরের মধ্যে চারজন যখন তাদের কাজ শেষ ভেবে হঠাৎ থেমে যায় একটা তার গতি বাড়িয়ে দেয়। কেন এমন ঘটে তা বোঝা কঠিন। হয়তো ওই একটা কুকুর বেশি মরিয়া বা মাত্রায় বেশি তেজি। অসামান্য তৎপরতা ও তেজ-এর জন্যই সম্ভবত সে ফাঁদে পড়ে যায়। ওদের সঙ্গে ব্রাজিল ফুটবল দলটার বেশ মিল পাওয়া যায়। রোনাল্ডো, রোনাল্ডিনহো ও রিভাল্ডো-র সঙ্গে আক্রমণে উঠে আসে দুই সাইড ব্যাক কারলোস ও কাফু। এর ফলে ব্রাজিল দল প্রায়ই বিজয়ী হয়ে মাঠ ছাড়ে। কিন্তু দুই ব্যাকবাবুর অতিতৎপরতায় কখনও সখনও প্রতি আক্রমণের মুখে ব্রাজিলের রক্ষণ ভেদ করে গোলও হয়ে যায়। এমন ফাঁদে পড়ে একদা ওই দলটাই বেহাল হতে বসেছিল। তবু ওদের অভ্যাসে তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। পাহাড়ি কুকুরের স্বভাবেও কোনও পরিবর্তন দেখা যায় না। ফাঁদে পড়া পাহাড়ি কুকুরকে খাদকের নখদন্তে ফালাফালা হতে ধীর অবশ্য কখনও দেখেনি। তবে তাড়া করতে গিয়ে একটা কুকুর আর ফিরে আসেনি এমন ঘটনার অকুস্থলে সে হাজির ছিল বেশ কয়েকবার।

চব্বিশ ঘন্টাই শুধু পরিশ্রম; বিনিময়ে খাবার মেলে যৎসামান্যই। তবু তাদের কর্তব্যকর্মে বিচ্যুতি ঘটার কথা শোনা যায় না। খাদে আটকে পড়া, পা মচকে যাওয়া, পাথরের আঘাতে আহত বা আক্রমণে মৃতপ্রায় রক্তাক্ত মেষ বা ছাগের পাশে ঘন্টার পর ঘন্টা অভুক্ত অবস্থায় নজরদারি জারি রাখা এদের নিত্যিকার কাজ। অবাধ্য শাবককুলের লাগামছাড়া বেয়াদপি কপট তেজি কৌশলে সামলে অনায়াসে ঠিকানায় পৌঁছে দিতে এদের জুড়ি মেলা ভার। এদের সার্ভিস রেকর্ডে কোনও দাগ থাকে না। এসব সত্ত্বেও সিন্ধুতে বিন্দুর মতো অবাক করার মতো ঘটনাও নাকি ক্কচিৎ ঘটে যায়, বলেছিলেন নাংগেলজি।

কোনও এক দঙ্গল কুকুরের মধ্যে দু'একটার ক্ষেত্রে দৈবাৎ ঘটে যেতে পারে এমন ঘটনা। এর মূলে থাকে কোনও কিছুর অভাব বা তাড়না। সেই অভাব থেকে ধীরে ধীরে তৈরি হয় ক্রোধ। অনেকের ধারণা পরিমিত খাবারের জোগান দিনের পর দিন মুখের কাছে না পেলে দু'একটা কুকুর অন্যভাবে খাবার সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়। সেটা করতে গিয়ে তারা বিস্তর বাধার সামনে পড়ে। ফলে ক্রোধ বাড়তে থাকে। বাঁধা গণ্ডির মধ্যে থাকার অভ্যাস ও নির্দেশ মেনে কাজ করার আনুগত্য তারা ধীরে ধীরে হারাতে থাকে। অবশ্য একেবারে ভিন্ন কারণেও যেমন যৌন অতৃপ্তি থেকেও স্বভাবে উগ্রতা জন্ম নিতে পারে। শুধু মেষপালকদের প্রহরী কুকুর কেন ঘরোয়া কুকুরের ক্ষেত্রেও অবস্থার ফেরে এমন ঘটনা ঘটে। এমন বোহেমিয়ান কুকুরের সঙ্গীও জুটে যায়। এমন একজোড়া কুকুর হঠাৎ একদিন সীমানা ছাড়িয়ে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দেয়। তাদের আর কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানাই থাকে না। পরিচিত আশ্রয় ও নিরাপত্তার

অভাব তাদের করে তোলে পুরোদস্তুর জংলি স্বভাবের। লোকালয়ে ফিরে গেলেও তারা তাড়া খেতে থাকে। যেমনটা ক্ষ্যাপা কুকুরের ক্ষেত্রে ঘটে। ফলে শিকার করে তাদের খাবার সংগ্রহ করতে হয়। তখন সেই কুকুরের দল জঙ্গি কৌশলে দুর্বল প্রতিপক্ষের উপর আঘাত হানতে তৎপর হয়ে ওঠে।

নাংগেলজি বলেছিলেন, পাহাড়ে বুনো কুকুর বলে কিছু নেই। পুরনো জংলি কুকুরই স্বভাবে বুনো হয়ে যায়। মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে সাধারণত এরা যায় না। কিন্তু খাবার না পেলে বুনো কুকুরের কাছে কোনও মানুষ মানেই মাংস। ধীরের সামনে আগুয়ান যারা তারা ঠিক কেমন স্বভাবের সেটা বোঝার জন্য তাকে অপেক্ষা কবতে হল।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল ধীর বিশ্বাসের। তখনও পর্যন্ত চোখে সে কোনও জন্তু দেখেনি। জেগে থাকা দু'জন মানুষকে গভীর অন্ধকার নেমে আসার আগে আক্রমণ করা খুব সহজ কথা নয়। জংলি কুকুর হলে তাদের খাবার দরকার। সেটার জন্য কৌশল করতে হয়। কৌশল করতে হলে তাদের অন্ধকার চাই। মানুষ কেন পৃথিবীর সব জীবই অন্ধকারে বেশি দুর্বল। সুতরাং তারা অপেক্ষা করতে বাধ্য। সেই সুযোগে ধীর ছোট ছোট পাথর সংগ্রহ করার কাজে লেগে পড়ল। দিরাং উঠতে চাইলেও তাকে সে উঠতে দিল না। দিরাং পূর্ণ বিশ্রাম না পেলে ভোগান্তির শেষ থাকবে না। পাথর কুড়িয়ে তাঁবুর সামনে জড়ো করতে করতে দিরাং-কে আশ্বস্ত করতে চাইল ধীর। তার কথাগুলো কেমন যেন রাজনৈতিক দলের শ্লোগান-এর মতো হয়ে গেল।

"আজ মেরা বারি, কল তুমহারি—দিরাং ভাই"

দিরাং মোটেই হাসল না। উদভ্রান্তি ও শঙ্কায় মুখ কালো করে উবুড় হয়ে থাকল। কিছু না বললেও তার মুখের ভাষা পড়তে অসুবিধে হল না ধীরের। — আগামী কালের সূর্য ওঠা দেখতে হলে জবরদস্ত সংগ্রাম তোমার সামনে। পারবে তো সাবজি?

এমন এক সংগ্রাম যা তাকে আগে কখনও করতে হয়নি। এ সংগ্রামেব পদ্ধতি ও প্রকরণও তার অজানা। সুতরাং জবরদস্ত তো বটেই।

পাশাপাশি পাথর প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকলে হঠাৎ-ই অন্ধকার গাঢ় হয়ে যায়। বুঝতে পারা যায় না। অন্ধকারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বুঝল ধীর গরগর আওয়াজ আগুয়ান—ঠিক মুখোমুখি দুই জন্তুর লড়াই যেন। ভয়ে সন্ত্রস্ত করার কৌশল। কম পরিশ্রমে কাজ তুলতে সে আওয়াজ লক্ষ্য করে টর্চ জ্বেলে থাকল। আলো জ্বালার পদ্ধতি হঠাৎ ধীর বদলে দিল— কখনও উপরে তাক করে কখনও বা তা বাম ও ডান প্রান্তে প্রসারিত করে এবং চতুর্দিকে ফোকাশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে চাইল। আলোর এমন কারিকুরি খেলা সম্ভবত আগন্তুক বাহিনীর মধ্যেও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছিল। এমন পদ্ধতি কেন হঠাৎ তাব মাথায়

এল তা ধীর জানে না। বোধহয় মরিয়া মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার অবস্থায় এমন ঘটনা হঠাৎ ঘটে যায়। ক্ষণিকের জন্য নিঃসাড় স্তব্ধতা। এক হাত থেকে অন্য হাতে টর্চটা বদল করার সময় আলোর বিরতি ঘটল। তারপর ফোকাশ করতেই দেখতে পেল সে। এতক্ষণ প্রচুর চেষ্টা করেও দেখতে পায়নি। সম্ভবত বেশি সাহসী হওয়ার ফলেই ওরা আলোর সামনে পড়ে যায়। দ্রুত পাথরের আড়ালে সরে গেলেও কোন আকৃতির জন্তুর সামনে তারা বোঝা গেল।

দিরাং এর আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত হল। নাংগেলজির বিবরণের সঙ্গে যথেষ্ট মিল পাওয়া গেল। ছাই ছাই ধূসর রং সঙ্গে কালো কালো দাগের ডোরাকাটা চিহ্ন। নেকড়ের মতোই সাইজ ও আকৃতিতে। স্বভাবে নেকড়ের মতো হিংস্র হলেও জেগে থাকা মানুষকে এরা এড়িয়ে চলে, নাংগেলজি বলেছিলেন। অথচ তাকে রণংদেহি মূর্তিতে দেখেও ওরা এগিয়ে আসতে চায়। তা হলে ওরা কি স্বভাবে বন্য প্রকৃতির? অবশ্য এমনও হতে পারে ওরা ক্ষুধার্ত। উদরপূর্তির তাড়না মানুষ-জন্তু উভয়কেই মরিয়া করে তোলে। এমন পাথর আর জুনিপার ঘেরা ঢালে ওদের কাছে খাবার বলতে লেজবিহীন ধেড়ে বাদামি ইঁদুর আর পাহাড়ি ছাগল অর্থাৎ ভরাল। বাদামি ইঁদুর ধরা কঠিন। বিভিন্ন সুড়ঙ্গ পথের ঠিকানায় মুহূর্তে হদিশ হয়ে যায় এই ইঁদুর। অন্যদিকে ভরাল এলাকায় প্রচুর হলেও পাথরের ঢালে স্বচ্ছন্দ না হলে কোনও জন্তুর পক্ষেই তাদের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়।

হঠাৎ সেই বাতাস! শিন-শিন খর-খর ঝুস্‌ঝুস্‌! পাথরের গায়ে তীব্র গতির বাতাস ঘসা খেলে এমন শব্দ হয়। এতক্ষণ ওই বাতাসের কথা মনে পড়েনি ধীরের। পড়বেই বা কী করে। আক্রমণের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত মানুষ বাতাসের তীব্রতা নিয়ে বিহ্বল বোধ করার অবসর পায় না। তীব্র বাতাস তার কাছে আপাতত বিপদ হলেও কিছুটা বলও বটে। বাতাসের বেগে গড়িয়ে পড়া পাথরের মৃদু আঘাতেই মৃত্যু অনিবার্য। মানুষের মতো জন্তুও ওই সময় গুটিয়ে থাকে। মানুষের মতো জন্তুকেও তখন নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে হয়। বাতাসের বেগ উপেক্ষা করে ধীর তবুও কিছুক্ষণ অন্ধকারে অপেক্ষা করে থাকল। পাথরের আড়ালে হলেও ফাঁকফোকর দিয়ে তীব্র গতির বাতাস যেন বেসামাল করে দিতে চায়। তাঁবুতে ঢুকে টর্চ জ্বালতেই শোয়া অবস্থায় দিরাং তার দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাল। বাইরে কী ঘটছিল তা সে বিলক্ষণ টের পেল। শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে মানসিক কষ্টও তার বাড়তে থাকল। ধীর তার মাথায় হাত রাখল।

— আপ ঠিক হ্যায় সাব্‌?

— সব ঠিক, দিরাং ভাই। চিন্তার কোনও কারণ নেই।

— ফিন আনেওয়ালা সাব্‌। বহত্‌ খতরনাক হ্যায় ইয়ে জানবার।

কোনও উত্তর দিল না ধীর। হাসি পেল তার। হিংস্র তো ওদের হতেই হয়। ভালবাসার কালেও ওরা মোটেই ভাল ছিল না। এখন ওদের ভয় ও হিংস্রতা দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হয়। ওদের এলাকায় এসে মাস্তানি করতে হলে বুকে বল চাই দিরাং ভাই, ভাবল ধীর। হঠাৎ-ই ফের তাকে কান খাড়া করে শব্দের অপেক্ষায় থাকতে হল । কিন্তু বাতাসের তীব্র শন্‌শন্‌ রন্‌রন্‌ শব্দের মাঝে অন্য কোনও শব্দ সে শুনতে পেল না।

একটা ব্যাপারে নিজের পিঠ চাপড়ে দিতে চাইল ধীর। তাড়াহুড়োর মধ্যে দ্রুত ক্যাম্প করতে হলেও খাসা জায়গা নির্বাচন করেছিল সে। ঢালের উপরে জায়গাটা সামান্য অসমতল হলেও বিপুল বাতাসের বেগ থেকে তাঁবু কিছুটা আড়ালে। দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ ঝটকা খেলেও তাঁবুর শরীরে বাতাস পিছলে যায়। অল্প এদিক-ওদিক হলেই মুহূর্তের মধ্যে তাঁবু ফাটা বেলুন হয়ে পড়ত। বিক্ষিপ্ত পাথর পড়ার শব্দ হলেও উপর থেকে পাথর গড়িয়ে তাঁবুতে পড়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সেই শ্বাপদকুলের উদ্দাম চকিত আঘাত হানার কোনও চিহ্ন তার চোখে পড়ল না। তবু সে সতর্ক থেকে তাঁবুর মুখে পাথরগুলোর সামনে সরে বসল।

কিছুক্ষণের জন্য ধীর কি বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল? বিদ্যুতের ঝটকায় সে যেন শক খেল। সতর্ক প্রহরী একজন অসুস্থ সাথীকে আগলে রাখার কথা বেমালুম ভুলে গেল। আসলে ক্লান্তি কোনও হিসেবের ধার ধারে না । প্রায় আঠারো ঘন্টা ধরে এক নাগাড়ে অমানুষিক পরিশ্রমে শরীর অল্প বিশ্রাম চায়। তাঁবুর ফ্ল্যাপ খুলে বুঝল বাতাসের দাপট কিছুটা কম। হঠাৎ তার চক্ষু স্থির! তাঁবুর সামনে , মাত্র দশ বারো ফুট দূরে, এক-দুই-তিন-চারটি ভীষণ আকৃতির জন্তু গ-র-র শব্দ করতে করতে কী একটা বস্তু নিয়ে কাড়াকাড়িতে মহাব্যস্ত। ডান হাতে অ্যাক্‌স আর বাম হাতে টর্চ ধরা থাকলেও তাকে স্থির হয়ে থাকতে হল। কারণ হঠাৎ তার দিকে ওরা যৌথ ভাবে এগিয়ে এলে সব আশা ধুলিসাৎ। আশ্চর্য, তাঁবুর মুখ থেকে টর্চের প্রথম ঝলকে ওদের ধীর দেখতে পেল অথচ ওরা তেড়ে এল না! কাড়াকাড়ির বস্তুটির প্রতি ওদের এতই আগ্রহ যে অন্য সব কিছুই যেন তুচ্ছ। ওই বস্তুটির জন্য সম্ভবত তারা তখনও জন্তুগুলির কোপে পড়েনি।

অন্ধকারের মধ্যে সে আর বেশি অপেক্ষা করতে চাইল না। যে কোনও উপায়ে সে জন্তুগুলোকে তাঁবু থেকে কিছুটা দূরে নিয়ে যেতে চাইল। অপেক্ষা ছেড়ে প্রতি আক্রমণে যাওয়াই উচিত পন্থা বলে মনে হল তার। হাতের কাছে পাথর পেতে হলে তাঁবুর মুখ থেকে দু'ফুট হাত বাড়ানো দরকার। পাথর ছুঁড়ে কাজ তুলতে গেলে বিপদ বেড়ে যেতে পারে, ভাবল ধীর। খোলা ফ্ল্যাপের বাইরে হাত বাড়াতেই হাতে এল চায়ের মগ। মগটা ধরে সজোরে নীচে ছুঁড়ে ফেলতেই শব্দের রহস্য ভেদ করতে হুড়মুড়িয়ে কয়েকটা জন্তু নীচের দিকে দৌড়ে গেল। সবাই নীচে না গেলেও যে বা যারা থাকল তাদের সে দেখে নিতে পারে। তড়াক করে সে বাইরে বেরিয়ে এল। অসম্ভব ঠাণ্ডা সঙ্গে মাঝরি মাত্রার বাতাসের বেগ। কাল বিলম্ব না করে আলোর খেলা শুরু করে দিল ধীর। তাঁবুর সামনে কোনও জন্তু না থাকায় তার সাহসও

বেড়ে গেল। আলোর খেলা এবার আর তেমন কাজে এল না। আলোর ঝলকানির মধ্যেই তারা তীক্ষ্ণ ঔদ্ধত্যে তার দিকে তাক করে ছিল। পাথরে অ্যাক্স ঠুকে ধীর তাদের আহ্বান জানাল। এক হাতে পাথর অন্য হাতে টর্চ আর কোমরউঁচু পাথরের উপর শোয়ানো অ্যাক্স— তৈরি সে। কিন্তু সেই চারজোড়া চোখ গ-র-র আওয়াজ করতে করতে সামান্য আগে পিছনে করলেও তার দিকে স্থির হয়ে থাকল।

বোল্ডার থেকে বোল্ডারের আড়ালে ক্রমাগত সেই কুঁ-উ-উ, গর-গর আওয়াজ। যখন অপেক্ষা করার তর সহ্য হয় না তখনই এমন বিরক্তির প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ এবার অতর্কিত হানাদারির সামনে পড়ার সম্ভাবনা। ঘটনাটা পাহাড়ের ঢাল না হয়ে জঙ্গলে হলে অনেক আগেই দু'টো আস্ত মানুষের শরীর খুবলে খাক হয়ে পড়ত, জানে ধীর। সানজিমাতার কৃপা কি না সে জানে না। তবে ঢালের উপরও কাজটা সহজ নয়। হঠাৎ তাঁবুর উপরের ঢালে আওয়াজ পেল ধীর। বুনো কুকুরবাহিনী কি কৌশল বদলে নিল? চারদিক থেকে চারটে জন্তু দুরন্ত গতি নিয়ে আক্রমণ করতে চাইলে রকের উপরে চড়ে সে বাঁচলেও দিরাংকে বাঁচানো সম্ভব হবে না।

পাহাড়ে পাথর সাজিয়ে টিপ প্র্যাকটিশের অভ্যাস আছে তার । একা থাকলে অনেকটা সময় কাটানো যায়। একাগ্রতাও বাড়ে। একবার চেষ্টা করে দেখতে চাইল ধীর। ছোট্ট বিদেশি টর্চ হলে কি হবে দুটো পেনসিল ব্যাটারিতে এন্তার জ্বালালেও তেজ ফিকে হয় না। টর্চ ঘোরাতে গিয়ে মনে হল উপর থেকে কিছু একটা চুপিসাড়ে তাঁবুর দিকে ধাবমান। আধকিলো ওজনের পাথরটা ফোকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাক করে ছুঁড়লো ধীর। অব্যর্থ লক্ষভেদ। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার করে নীচে দৌড়। নিজের প্রতি বিরক্ত হল ধীর। মনে মনে সেও বিকট চিৎকার করে ভর্ৎসনা করল — তোমার মতো ঘৃণ্য ও অধঃপতিত মানুষ এর আগে আমি কখনও দেখিনি, মি. বিশ্বাস। তুমি কি সেটা জান? উত্তরটা সে নিজেই দিল — বিলক্ষণ জানি বিবেকদা। আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কৃতকর্মের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত!

হঠাৎ তার মনে হল, ফের তাঁবুর আশেপাশে কোনও জন্তুর উপস্থিতি। কী কারণে এত বাধা সত্ত্বেও ওরা তাঁবুর কাছে আসতে চায় বুঝতে পারল না ধীর। আচমকাই পাথর তুলে আক্রমণ। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ শান্ত। এমন প্রত্যাঘাত আক্রমণকারীরা হয়তো আশা করেনি। যুদ্ধে সাময়িক বিরতি ঘটল। আধঘন্টা পর আবার সেই শব্দ। এবার নীচের ঢালে। অর্থাৎ ফের কৌশল পরিবর্তন। দু'দিক থেকে আক্রমণ করে নাজেহাল করার চেষ্টা। নিচ থেকে আক্রমণ করার অসুবিধা হল চড়াই ভেঙে উঠতে হয়। জন্তু হলেও কাজটা পরিশ্রমসাধ্য এবং গতিতে হেরফের ঘটানোর অসুবিধে। আক্রান্ত মানুষকে বিব্রত করতে এই গতির হেরফের যথেষ্ট কার্যকরী পদ্ধতি। উপরে ক্রমাগত পাথর ছুঁড়ে সে দু'দিক থেকে আক্রমণের কৌশল বানচাল করতে চাইল। তার অনুমান সে সফল হয়েছিল। কারণ কিছুক্ষণ পর সব তৎপরতা নীচের ঢাল থেকেই শুরু হল। ঘন অন্ধকারে দৌরাত্ম্য বাড়িয়ে কাজ হাসিল করতে চায় ক্ষুধার্ত

জঙ্গিবাহিনী। নীচের দিক তাক করে কয়েকবার দিশাহীন পাথর ছুঁড়ে কাজ হল। ফের সব শান্ত। তারই মধ্যে ইটুগ্রামের এখানে ওখানে দু'একটা আলোর রেখা তার নজরে এল। শুনতে পেল অনামা নালার পাথর কেটে বয়ে চলার ছলছল খলবল শব্দ।

টর্চ না জ্বেলেও ধীর চারজোড়া চোখের দাঁত খিচিয়ে গ-র-র আওয়াজ তুলে তার দিকে ধেয়ে আসা টের পেল। পাথরে শোয়ানো অ্যাক্স তুলে নিতে বাধ্য হল ধীর। মাত্র পনেরো ফুটের ব্যবধান খাদ্য ও খাদকের মধ্যে। হঠাৎ মনে পড়ল তার। এমন মরিয়া আক্রোশের কারণ কি সেই বস্তুটি হতে পারে? টর্চ জ্বেলে সামনে ফেলতেই দেখতে পেল সে। নাড়িভুঁড়ি ও রক্তে মাখামাখি কিলো তিনচার ওজনের কোনও প্রাণীর খুবলে খাওয়া শরীর। চকিতে অ্যাক্সে জড়িয়ে সেটাকে নীচের ঢালে ফেলতে গিয়ে ঘুরে এসে মাংস পিণ্ডটা তার শরীরের মধ্যে আছাড় খেল। নাড়িভুঁড়ি পিচকে তার উইণ্ডপ্রুফে মাখামাখি হলেও হাতে করে সেটাকে ধীর ফের নীচে ছুঁড়ে দিল। কিছুক্ষণের জন্য আওয়াজ হলেও স্থির চক্ষুর সে আর হদিশ পেল না। তবু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আর কী কী ঘটতে পারে সে ভাবতে থাকল।

হয়তো অনেক কিছুই ঘটতে পারত কিন্তু তখন ঘটানোর মতো সময় আর হাতে ছিল না। ইটু গ্রাম আবছা অন্ধকার কেটে ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হচ্ছিল। অর্থাৎ হঠাৎ করে জঙ্গি হাঙ্গামা অবশেষে অবসানের পথে। কোনও প্রান্তেই কোনও হাঙ্গামা বা হিংস্র আক্রমণের চিহ্ন আর দেখা গেল না। জড়তা কাটিয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ার পর আর কিছু মনে পড়ল না ধীর বিশ্বাসের।

সাচ্চুধুরা

দিরাং-এর চেঁচামেচিতে যখন ধীরের ঘুম ভাঙল তখন সকাল সাড়ে সাতটা। তাঁবুর চতুর্দিকে দস্যিপনার প্রচুর চিহ্ন দেখে দিরাং অসম্ভব ঘাবড়ে যায়। ধীরের পড়ে থাকা উইণ্ডপ্রুফে রক্তের দাগ দেখে সে ধরেই নিয়েছিল বুনো কুকুরের আক্রমণে তার সাহেব মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন। আড়মোড়া ভেঙে তাঁবুর বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখল ধীর। ঘোলাটে চোখে দিরাং ধীরকে পর্যবেক্ষণ করল। দু'চোখে বিস্তর প্রশ্ন তার।

— ম্যায় বিলকুল ঠিক হুঁ দিরাং ভাই। আভি গরম চায় লাগাও।

আশ্বস্ত হলেও দিরাং-এর চোখ থেকে উৎকণ্ঠা তখনও যায়নি।

— মগর ইয়ে কপড়া?

— দারুণ জমাটি গপ্পো, পরে বলব সব।

— আপ সাচমুচ শের হ্যায় সাব্।

— বাঘের এখন চা দরকার। চায লাগাও।

— ক্যায়সে বানায়ে সাব্, মেসটিনা অওর মগ্গা লা-পাত্তা।

মগটা সে ছুঁড়ে দিয়েছিল মনে পড়ে কিন্তু মেসটিন তো যেখানে ছিল সেখানেই থাকার কথা। অনেক নীচে গিয়ে মগ ও মেসটিন ধীর উদ্ধার করে নিয়ে এল। মেসটিন চেটেপুটে পরিষ্কার কিন্তু তুবড়ে তার বেঢপ আকৃতি।

অনেকটা পথ সামনে। দিরাং সুস্থ, স্বাভাবিক। চিন্তার আর কোনও কারণ নেই। দিরাং-এর মুখে শুনেছিল হিমবাহের মুখে বুনো কুকুর বড় একটা যায় না। ঝামেলা এড়াতে তারা ডেঞ্জারজোন ছাড়িয়ে আরও ভিতরে ঢুকে পড়তে চায়। ব্রেকফাস্ট সেরে তাঁবু গুটিয়ে পৌনে ন'টায় ঢালের পথ ধরল তারা দু'জন। আড়াআড়ি টানা দু'ঘন্টা হাঁটার পর বিশ্রাম নিতে হল। তারপর একাদিক্রমে আড়াই ঘন্টা চড়াই ভেঙে সাচ্চুধুরার মূল ভূ-খণ্ডে এসে থমকে দাঁড়াল ধীর। দক্ষিণ প্রান্ত থেকে দু'টি গিরিশিরা এঁকেবেঁকে সাচ্চুধুরায় গিয়ে মিশেছে। দুই গিরিশিরার মাঝখানে যে ছোট্ট হিমবাহ তা থেকে বেরিয়ে এক অনামা নালা ইটু নালায় গিয়ে মিশেছে। নালা ধরে এগিয়ে গেলেই সংকীর্ণ পরিসর থেকে হিমশীতল ঠাণ্ডা বুকে চাপ দেয়। পায়ের তলায় পিছল নুড়ি ও স্লেট পাথর। চড়াই কিছুতেই যেন শেষ হতে চায় না। ঘন্টা সাত পর তাদের প্রায় বেহাল অবস্থা। মূল হিমবাহ তখনও প্রায় পাঁচ ঘন্টার পথ। সেদিন তারা ওখানেই ক্যাম্প করার তোড়জোড় শুরু করে দিল।

পথ খুব বেশি নয় কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। পিঠের ভারী বোঝা পথের বাধাকে দ্বিগুণ করে তোলে। প্রথম ক্যাম্প অনেক আগে হওয়ায় তাদের সব হিসাব ভেস্তে যায়। মাত্র দু'হাজার ফুট উঠতে তাদের সাড়ে তিন হাজার ফুট নীচে নামতে হয়। মাচদা ছ'হাজার ফুট হলে তারা দ্বিতীয় দিনে খুব বেশি হলে সাড়ে আট হাজার ফুট উচ্চতায় ক্যাম্প লাগিয়েছিল। সাচ্চুধুরার উচ্চতা ষোলো হাজার ফুটের কাছাকাছি হলে তখনও প্রায় আট হাজার ফুট ওঠা বাকি। পাহাড়ে অল্প ওঠাই কঠিন কষ্টকর হতে পারে। সাচ্চুধুরা পর্যন্ত বাকি আরও প্রায় আট হাজার ফুট কেমন বাধার প্রাচীর তোলে তাই-ই এখন দেখার। নাংগেল তাফা বেশ কয়েক বছর আগে সাচ্চুধুরা সম্বন্ধে কিছু কথা বলেন। দিল্লীর কোন একটা দলকে নিয়ে তিনি ওই পথে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য সাচ্চুধুরাকে সাধারণ ট্রেকারদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলা। তাঁর অভিজ্ঞতা মোটেই ভাল হয়নি। তিনি সাচ্চুধুরায় পৌঁছাতে পারেননি। তাঁর মতো দক্ষ গাইড যে গিরিবর্তে যেতে সমর্থ হন না পরবর্তীকালে আর কেউ সেখানে যাওয়ার সাহস দেখায়নি। ফলে সাচ্চুধুরা অভিযান শুরুতেই শেষ হয়ে যায়। ধীরেরও তেমন আগ্রহ হয়নি। মুখে না বললেও সে জানত সাচ্চুধুরা কোনও গিরিবর্তই নয়। গিরিবর্ত বলতে বোঝায় দু'টি উপত্যকার সংযোগকারী উচ্চভূমি। একই উপত্যকার অন্তর্ভুক্ত একটি ছোট হিমবাহের মধ্যবর্তী গিরিশিরা বা রিজ টপকে অন্য আর একটা হিমবাহে পৌঁছানোর পথকে গিরিবর্ত বলা যায় না। সঙ্গত কারণেই মানচিত্রেও তার কোনও হদিশ নেই। তবু এসেই যখন পড়েছে তখন নাংগেলজির কথা মিলিয়ে দেখছিল ধীর। অনেকটাই মিলে যায় যদিও তখনও অনেক পথ তাদের সামনে।

সামান্য বিশ্রাম নিতেই শরীরের বেদম ভাবটা কেটে গেল। নুড়ি ও স্লেট পাথর সরিয়ে তাঁবু পাতা হল। দিরাং তার সাহেবকে আর কুটো পর্যন্ত নাড়তে দিতে চায় না। জল এনে মারফা (কোমরে বাঁধা ভেড়ার লোমের দড়ি) নিয়ে নিচু থেকে শুকনো জুনিপার ডাল আনতে রওনা দিল সে। আসলে অসহ্য ঠাণ্ডা থেকে কিছুটা পরিত্রাণের উপায় ওই কাঠ, ওখানে উত্তাপের একমাত্র উৎস। তা ছাড়া আগুন জ্বালাতে পারলে আরও অনেক আপদ দূরে সরিয়ে রাখা যায়।

তাদের ক্যাম্প থেকে আর ইটু গ্রাম দেখা যায় না। বাঁকের মুখে অদৃশ্য। সামনে এক কিলোমিটার দূরে মোরেন স্তুপ। বহু বছর আগে হিমবাহ সম্ভবত ওই পর্যন্ত ছিল। তার ঠেলায় পাথর-মাটি-বালি স্তুপাকার হয়ে দাঁড়িয়ে, যুগযুগান্ত ধরে। মোরেনস্তুপের ওপারে কী অবস্থা তা ধীর বুঝতে পারে না। দু'পাশের গিরিশিরা থেকে পাথর পড়লেও ক্যাম্প পর্যন্ত আসার পথ বন্ধ। ক্যাম্পের পশ্চিমে নালা এবং পূর্বে এক প্রমাণ সাইজের খাদ। ঘন্টা দেড় মতো আয়ু সূর্যের আলো অনেক আগেই উধাও; ফলে পাল্লা দিয়ে ঠাণ্ডা জাপটে ধরতে এগিয়ে আসে। অবশ্য বাতাসের বিষাক্ত ঝাপটা অনেক কম। দু'পাশের রিজ ভেদ করে তা ভিতরে ঢুকতে পারে না। অন্ধকার আসার মুখে তারা ডিনার শেষ করে নেয়। অসহ্য ঠাণ্ডা এড়াতে সাড়ে সাতটা নাগাদ ধীর তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ে। তাঁবু থেকে ধীর দ্যাখে দিরাং কম্বল

গায়ে আগুনের পাশে বসে। একটা করে কাঠ দেয় আর ফুঁ মারে। কতক্ষণ পরে জানে না ধীর। দিরাং তাকে ঠেলা দেয়।

— লো সাব, আপকা মেহমান লোগ পহুঁছ গ্যায়া। জেরা মু বাড়াহাকে দেখিয়ে।

আশ্চর্য, ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজলেও মোটামুটি দেখা যায়। চারজন নিভুনিভু আগুনের পাশে বাবু হয়ে নিশ্চিন্ত আরামে। কোনও হিংস্রতা বা হুড়োহুড়ি নেই। যেন খাবার তৈরি হলেই পাতে পড়বে। পাহাড়ি কুকুরের চেয়েও বৃহদাকার। ধূসর রঙে ডোরা কাটা দাগ থাকায় বীভৎস বলে মনে হয়। মজবুত গঠন। পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করলে যে কোনও হিংস্র জন্তুকে ওরা চারজন বেকায়দায় ফেলতে সক্ষম। আগুনের পাশে এমন আয়েসি আড্ডার তাপ সংগ্রহ ছাড়া অন্য কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? হাতের কাছে অ্যাক্স মজুত আছে কি না ধীর দেখে নিল। সামান্য মুখ বাড়িয়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা বিফলে গেল। ধীরকে ওরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল। কেন জানি তার মনে হল, ওরা ওইদিন তাদের সাহসী পদক্ষেপকে স্বাগত জানাতে চায়। তা না হলে ওদের এতদূর পর্যন্ত আসার কোনও কারণই থাকতে পারে না। তা না হয় হল, কিন্তু গার্লফ্রেণ্ড সঙ্গে নিয়ে ঘোরার এটা কোনও জায়গা হল!

মাত্র পঁচিশ ফুট দূরে আগুন। ওদের অভ্যর্থনা জানাতে বেশ কিছু বিস্কুট টর্চ জ্বেলে ছুঁড়ে দিল ধীর। সে কী দৌড়াদৌড়ি আর গর্জন! জোর যার সব তার। ওটাই ওদের কাছে নিয়ম। দিরাং এমন আদিখ্যেতার কোনও মানে বুঝতে পারল না। বিড়বিড় করে যা বলল তার বাংলা করলে দাঁড়ায় — কাল যারা তোমায় প্রায় শেষ করে দিচ্ছিল, আজ তুমি তাদের বিস্কুট দিচ্ছো! আজব মানুষ তো তুমি!

বিস্কুট দখলের লড়াই বড়ই নির্মম। দেখতে ভয় করে। তাই দ্বিতীয় বার বিস্কুট বিতরণ বাতিল হল। কী পরিস্থিতি জানতে সে টর্চ জ্বেলে দেখল। কখনও একে অপরের গা পরিষ্কার করে দিচ্ছে তো একটু পরেই একজনের গলার উপর মুখ রেখে অন্যজন গভীর চিন্তায় মগ্ন। দিরাং-এর নাকে সর্ষের তেল ফলে ধীরকে জেগে থাকতে হল। সকালে উঠে দেখা গেল ভুল করে ফেলে আসা আটার পুটুলি ও সামান্য নুন তাঁবুর ফ্ল্যাপ থেকে উধাও। ওই রাজকীয় চেহারায় এমন ছিঁচকেমি সত্যিই বেমানান!

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ভোর চারটের বদলে তারা ক্যাম্প তুলে ছ'টায় বেরল। ডাঁই করা মোরেনস্তুপ পার হতে তাদের দেড় ঘন্টা লেগে গেল। কনকনে ঠাণ্ডায় শরীর হিম হয়ে যায়। পাথরে ঠুকে পায়ের আন্দাজ নিতে হয়। স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ তার উপর চাপা ছোট্ট জায়গা — সর্বদাই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখনও যে দিরাং বেঁকে বসেনি ধীরের ভাগ্য বলতে হয়। আরও তিন ঘন্টা এগিয়ে যাওয়ার পর দম ফেলার মতো এক টুকরো শুকনো পরিসর পাওয়া গেল। অল্প বিশ্রাম নিয়ে দেড় ঘন্টা টানা চড়াই ভাঙার পর নালা শেষ হল অর্থাৎ হিমবাহের শুরু। খুবই ছোট্ট হিমবাহ। খুব বেশি হলে চারটে ফুটবল মাঠ। দিরাং-এর দিকে

তাকাল ধীর। মালপত্র রেখে হিমবাহের শেষ পর্যন্ত যেতে তার আপত্তি নেই। জমাট শক্ত বরফের উপর এগিয়ে যেতে তাদের তেমন কোনও অসুবিধেই হল না।

হিমবাহ ধরে যেতে যেতে ধীর নালার পূর্ব প্রান্তের গিরিশিরার ঢাল খুঁটিয়ে দেখল। ওই ঢাল ধরে তাদের গিরিশিরার মাথায় উঠতে হবে। নাংগেলজির ধারণা, নালার পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তের দু'টি গিরিশিরার সংযোগস্থলই হল সাচ্চুধুরা। উপরে উঠলেই জানা সম্ভব নাংগেল তাফা-র ধারণা নির্ভুল কি না। কিন্তু যে ঢাল ধরে উপরে তাদের উঠতে হবে ওই ঢাল আরোহণের জন্য মোটেই উপযুক্ত বলে মনে হল না ধীরের। পচা পাথরপ্রাচীর ধরে ওঠার চেষ্টা করলে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। নাংগেল তাফা কেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহীর পক্ষেও ওই ঢাল এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। ধরা বা পা রাখার মতো শক্ত জায়গাই তার নজরে পড়ল না। সুতরাং ভোর হলেই চাসুর পথে পা বাড়ানো ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। দিরাং-এর চোখ কিন্তু ওই ঢালের চতুর্দিক তখনও নির্ভীক পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত। একটু বাজিয়ে দেখতে চাইল ধীর।

— তো দিরাং সাব, খেল খতম। সুব্‌বে তুরন্ত নীচে ভাগনা।

ঘুরে তাকাল দিরাং। ধীরের কথায় অবাক হল সে।

— কিঁউ সাব, নীচ্‌চে ভাগনা কিস লিয়ে! থোড়া কৌশিস তো জরুর করেঙ্গে।

এমন কথা দিরাং লাকাকেই মানায়। দেখার কোনও প্রয়োজন নেই অথচ সে একবার চেষ্টা করে দেখতে চায়। এমন অনমনীয় মনোভাবই অসম্ভবকে সম্ভব করে। এই না হলে গাইড! মাচদা ছাড়ার পর এই প্রথম সমতল ভূমিতে তারা ফিরে এল। অবশ্য তলায় শক্ত বরফ। তাঁবু লাগিয়েই স্টোভের উপর মেসটিন বসানো হল। শক্ত বরফের টুকরো মেসটিনে ফেলে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে হল। কুড়িমিনিট পর চায়ের সঙ্গে পেঁয়াজ কুচি ও কাঁচালঙ্কা সহযোগে চানাচুর। দারুণ জমাটি স্ন্যাক্‌স দিরাং হাতে তুলে দিল। আপাতত চুলোয় যাক সাচ্চুধুরা!

পণ্ডশ্রম মনে হলেও পূর্বঢালের বিভিন্ন জায়গা ধরে উপরে ওঠার চেষ্টা চালিয়ে গেল তারা দু'জন। কসরত করে কিছুটা উঠলেও ঝুরো নুড়ি ধরে ফের নীচে। ঘন্টা দুই পর বেকার পরিশ্রমে বিরক্ত হয়ে দু'জনই ক্যাম্পে ফিরে এল। আধঘন্টা পরই দিরাং ফের বেরিয়ে গেলেও ধীর ভাবতে থাকল। আচমকা একটা মানুষ কীভাবে বদলে যায়! স্রেফ মালবাহক হয়েও সে উপরে ওঠার পথ খুঁজে পেতে চায়। দিরাং তাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছে। তাঁবু থেকে বেরিয়ে ঢালের কোথাও সে দিরাং-কে দেখতে পেল না। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঢালের কোথাও তার চিহ্ন নেই। বড় জোর এক ঘন্টা তার মধ্যেই সে অদৃশ্য! ঝুরো মাটিতে চাপা পড়ে যায়নি তো — ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক!

একটা বড় পাথরের উপর রক ক্লাইম্ব করে উঠে ঢালে আতিপাতি করে খুঁজতে থাকল

ধীর। ওই সময় চোখের ভুল হয় খুব। কিছু দেখলেই মনে হয় মানুষ — এই নড়ছে তো এই দাঁড়িয়ে পড়ছে। চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে ঢালের উত্তর প্রান্তে গিয়ে তার চোখ হঠাৎ থেমে গেল। মনে হল কেউ যেন শ'খানেক ফুট উপরে দাঁড়িয়ে কিছু দেখতে ব্যস্ত। ওই বড় বোল্ডার থেকে অল্প নেমেই সে বরফে লাফ দিল। তার পর দড়ির কয়েল আর ন্যাপস্যাক নিয়ে দৌড়ল ধীর। সামনে গিয়ে দেখল — দিরাং-ই দাঁড়িয়ে। অতটা উপরে দিরাং! ওই সময় অযথা চেঁচামেঁচিতে বিপদ হয়। পড়লে দিরাং তলায় যেখানে পড়তে পারে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল সে।

নীচে দাঁড়িয়ে দেখল ধীর। পূর্বঢালের আশিভাগই নুড়িপাথর তার উপরে নরম বরফ। বাকি বিশভাগ শক্ত পাথরের দেওয়াল। পাশাপাশি থাকায় আলাদা করে বোঝা যায় না। দিরাং উপরে উঠে ওই শক্ত ঢাল পরীক্ষা করছিল। ওখান দিয়ে অল্প আগে ভাল করে দেখেও ধীর ব্যাপারটা ধরতে পারেনি। দিরাং তাকে সত্যিই অবাক করে দিয়েছিল। একজন নিছক মালবাহকের চোখে আরোহণের এই সুক্ষ্ম অনুভূতি থাকে না। ওই রুট ধরতে পারলে গিরিশিরার উপরে ওঠা হয়তো সম্ভব। তবে কিছু কিন্তুও থেকে যায়। প্রথম কিন্তু, ওই পাথরের ঢাল যথেষ্ট মজবুত কি না; দ্বিতীয় কিন্তু, তাদের পিঠে কী পরিমাণ ওজন থাকবে; তৃতীয় কিন্তু, দড়ির সাহায্যে দিরাং ওই ঢালে ঠিক কতটা তৎপর হতে পারে; চতুর্থ কিন্তু, সব ঠিকঠাক চললেও কম করে বারো থেকে চৌদ্দো ঘন্টা এক নাগাড়ে ওঠা নামা করা তাদের পক্ষে সম্ভব কি না; এবং শেষ কিন্তু, অতটা সময় ধরে ঢালে থাকার জন্য আবহাওয়া আদৌ ঝলমলে থাকবে কি না।

দিরাং তাকে দেখে ইশারায় উপরে আসতে বলল। চমৎকার রুট বেছে উপরে উঠেছিল দিরাং। ধীর অতি দ্রুত তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। নীচে থেকে পাথরপ্রাচীরকে দুরতিক্রম্য বাধা বলে মনে হয়। সামনে দাঁড়ালে ততটা মনে হয় না। মোটামুটি সঠিক রুট বাছার কৃতিত্ব দিরাং-এর হলেও সমস্যা দিরাং-কে নিয়েই। দিরাং অত্যন্ত শক্তিশালী মানুষ। কিন্তু তার মনের জোর সম্বন্ধে ধীরের কোনও ধারণা নেই। এমন ঝামেলার পথে যেটা থাকা অত্যন্ত জরুরি। পাহাড়ি অভিযান যে মাপেরই হোক দুর্জয় মানসিকতার কোনও বিকল্প হয় না। বিপদ ও অসহনীয় পরিস্থিতির মুখে অনেক শক্তিশালী মানুষকে অতীতে সে ভেঙে পড়তে দেখেছে। দিরাং লাকা-কে সঙ্গে নিয়ে ওই রুটে যাওয়ার ব্যাপারে সে বেশ দ্বিধায় পড়ে গেল। ঝুমঝুমে অন্ধকারে তারা যখন ক্যাম্পে ফিরে এল ঘড়িতে তখন প্রায় আটটা। ওই কঠিন শীতল পরিবেশে যথেষ্ট গভীর রাত।

ক্যাম্পে ফিরতে না ফিরতেই নীচে থেকে উঠে আসা সাদা মেঘে সব ঢেকে গেল। পাহাড়ের উচ্চতায় নিচ থেকে উপরে মেঘ উঠে আসা খুবই পরিচিত দৃশ্য। ওই মেঘ থেকে প্রায়শই দুর্যোগপুর্ণ অবস্থা তৈরি হয়। পরদিন ফের ঝকঝকে আকাশ দেখা যায়। কখনও কখনও ওই মেঘবলয় এক নাগাড়ে দুর্বিষহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। টানা দু'সপ্তাহ

সংকটজনক পরিস্থিতির সামাল দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে ধীরের। তবে তেমন কিছু ঘটলে পাহাড়ি মানুষ হলেও দিরাং-এর সঙ্গে থাকা যথেষ্ট ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

গভীর রাতে তাঁবুর চাপে ঘুম ভেঙে যায় ধীরের। তার পাশে দিরাং ঘুমে আচ্ছন্ন। টর্চ নিয়ে সে বাইরে এসে দাঁড়ায়। চারপাশ নিঝুম, স্তব্ধ। চতুর্দিক বরফে একাকার। টর্চ জ্বেলে অ্যাক্স দিয়ে তাঁবুর উপর ও চারধার থেকে ধীর জমা বরফ সরাতে থাকে। নিঃশব্দে এমন ভারী তুষারপাতে সে যথেষ্ট বিব্রত বোধ করে। একদিকে বরফ সরায় তো অন্যদিকে বরফ জমে থকথকে হয়ে পড়ে। এত কম উচ্চতায় এমন অস্বাভাবিক তুষারপাত যথেষ্ট শঙ্কার কারণ বলে মনে হয় ধীরের। কিছুক্ষণ পর শরীর থেকে বরফ ঝেড়ে সে তাঁবুর মধ্যে আসতে বাধ্য হয়। কিছু সময় পর পর ভিতরে বসে সে ফ্ল্যাপ ঝেড়ে তাঁবু হালকা করতে থাকে। ওইভাবেই সকাল হয়। দিরাং এসবের কিছুই বুঝতে পারে না।

সকালবেলাও বরফ পড়া কমার কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। ইচ্ছে করলেই তারা নীচে নেমে যেতে পারে। নামার সময় কিছুটা সমস্যা হলেও অনায়াসেই ফিরে যাওয়া যায়। আসলে তারা দু'জনেই অপেক্ষা করে দেখতে চায়। সেই অপেক্ষায় থাকতে গিয়ে তারা আড়াই দিন তাঁবুবন্দি হয়ে পড়ে। শেষদিকে দিরাং ক্রমশ বিরক্ত হয়ে পড়ছিল। প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করাই একজন অভিযাত্রীর মূল পরীক্ষা। মাথা ঠাণ্ডা রেখে নির্বিকার চিত্তে পরিস্থিতির সামাল দিতে হয়। তাকে সইতে হয়, বিরক্ত হওয়ার কোনও উপায় থাকে না। নিজের প্রতি আস্থা হারালে তখন বিপদের গন্ধ তীব্র বলে মনে হয়। অতি সামান্য সমস্যাও দুরতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দু'তিন কিলোমিটার নীচে নামলেই খটখটে ভূমি পায়ের তলায়। কিন্তু উপরে উঠতে হলে সবদিক ভাল করে ভাবা দরকার।

মাচদা থেকে বেরনোর ছ'দিনের দিন সকালে তারা কুয়াশা ঘেরা অবস্থা থেকে মুক্ত হল। চতুর্দিকের বরফ ধীরে ধীরে গলে পাথর ও মোরেন দেখা গেল। আগেকার অবস্থার অনেকটাই ফিরে এল। সারাদিন ধরে তারা আধা রোদ্দুরে তাপ সংগ্রহ করে নিল। তবে উপরে ওঠা বা নীচে নামার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনও কথাই হল না।

পরদিন রাত থাকতেই উঠে পড়ল ধীর। তাঁবুর মুখ খুলে দিতেই ঝকঝকে আকাশে অযুত নক্ষত্রের খুশির জোয়ার তাকে ছুঁয়ে গেল। হঠাৎ খেয়াল হল তার। আরও একটা মাথা তার হাতের ফাঁক দিয়ে বাইরে — তারার মেলা দেখতে ব্যস্ত।

— দিরাং ভাই, নীচে নামবে নাকি?

খুব বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল সে।

— নেহি, তুরন্ত আগে বাড়না হ্যায়।

এমনি বিরক্ত যে 'নেহি'-র সঙ্গে 'সাব্' কথাটাও যোগ করল না দিরাং।

তড়াক করে উঠে বাইরে এল ধীর। তার আর মোটেই ঠাণ্ডা লাগছিল না। দিরাং বাইরে বেরিয়ে তাঁবু খুলতে লেগে গেল। মাচদা থেকে মাচদা দশদিন ধরে দশের জায়গায় বারোটা বড় খাবার সঙ্গে নিয়েছিল তারা। তার মধ্যে আটবারের খাবার খাওয়া হয়ে যাওয়ায় মাত্র চারটে তাদের সঙ্গে মজুত। ফিরে আসার সম্ভাবনা মাথায় রেখে একটা খাবার পাথরের আড়ালে গচ্ছিত রাখা হল। তিনটে খাবার পিঠে করে তারা অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল। এত দ্রুত সব গুছিয়ে বেরনোর ঘটনা আগে খুব একটা ঘটেছে বলে মনে হল না ধীরের। ঢালের সামনে কোমরে দড়ি বাঁধার সময় ঘড়িতে সময় দেখল সে — চারটে বাজতে দশ মিনিট।

ঠাণ্ডায় জমে গেলেও ধীর চড়াই ভাঙা শুরু করল। সে জানে মিনিট দশ পরে আর ঠাণ্ডার কথা মনে হবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, বারো-চৌদ্দো ঘন্টার এক মরিয়া সংগ্রাম তার সামনে। ঢালের পর ঢাল পিছনে ফেলে তারা এগিয়ে চলল।

পাথরের শক্ত ঢালে পৌঁছতে যে এত সময় লাগতে পারে সেটা সে বুঝতে পারেনি। সামনে ধীর পিছনে দিরাং। অতি সতর্ক থেকে সঠিক পথ খুঁজে নিতে হচ্ছিল। ভাঙাচোরা আলগা ঢাল হলে প্রচুর সময় লাগে। মারাত্মক ঝুঁকি না থাকলেও এক-পা এক-পা করে হিসাব করে এগিয়ে যাওয়া। টুকটাক দাঁড়াতে চায় দিরাং অর্থাৎ বিড়ি-ব্রেক। ফুকফুক করে বিড়িতে টান মেরে লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে চাঙ্গা হয় সে। পাঁচঘন্টা পর তারা শক্ত পাথরের ঢালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ফুট পঁচিশ পাথরের দেওয়াল ধরে উপরে উঠলে তবেই তারা আরও এগোতে পারে। ধীরের কাছে এই চড়া তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু দিরাং কী করবে সে ব্যাপারে সে চিন্তায় থাকল। দিরাং-এর হাতে দড়ি ধরিয়ে ধীর ওঠার মতো একটা রুট ধরল। শক্ত পাথরের ঢাল ধরে ওঠাকে পর্বতারোহণের ভাষায় বলে 'রক ক্লাইম্বিং' এবং দড়ির সাহায্যে উপর থেকে নীচে নামাকে বলে 'র‍্যাপেলিং'। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্লাব ফি-বছর শীতকালে রক ক্লাইম্বিং শিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে থাকে। দিরাং-এর কোনও ট্রেনিং নেওয়া না থাকলেও ব্যাপারটা সে জানে। অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

সত্যিই কোনও অসুবিধে হল না দিরাং-এর। উপর থেকে দড়ি ধরে বিলে করে দিরাং-কে নিয়ে আসার আগেই দড়িতে বেঁধে তাদের মাল তোলা হল। মজবুত ভাবে দড়ি ধরে যে একজনকে উপরে উঠতে বা নীচে নামতে সাহায্য করে তাকে 'বিলেম্যান' বলা হয়। রক ক্লাইম্বিং-কে নিরাপদ করতে বিলেম্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাথরপ্রাচীরের পিঠ শক্ত হলেও পেট ও বুক অসম্ভব ভাঙচুর, নড়বড়ে। একটু অসতর্ক হলেই পাথর গড়িয়ে নীচের মানুষকে আঘাত করতে পারে। চারঘন্টা ধরে তারা ওই ভাঙাচোরা পাথবস্তুপের মধ্যে পথ খোঁজার কাজে মরিয়া সংগ্রাম চালাল। ওই চারঘন্টায় একবারের জন্যও দিরাং-এর

মুখে বিড়ি দেখা যায়নি। ওখান থেকে বেরনোর পথ খুঁজে বের করতে গিয়ে ধীর বার বার ব্যর্থ হচ্ছিল। তাই দেখে দিরাং হয়তো ঘাবড়ে গিয়েছিল।

— সাবজি, বাহার নিকালনে কো রাস্তা নেহি মিলা, ক্যায়া?

ওই দমবন্ধ করা পাথরের বিশাল জঞ্জাল থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়তে চায় দিরাং। তাই সে জানতে চায়, ওখান থেকে বেরনোর উপায় তার সাহেব বের করতে পেরেছে কি না। না পারেনি। শক্ত ঢাল যে কিছুটা উপরে ওঠার পর এভাবে ভেঙে যেতে পারে তা ধীর ভাবেনি। এতই ভাঙা যে তার উপর হাঁটা চলা করাই বিপজ্জনক। তাই কোনও বিকল্প রাস্তা বের করতে চায় ধীর।

— না পাওয়া যায়নি। তবে পেয়ে যাব। চিন্তার কোনও কারণ নেই।

দিরাং সাহেবের উত্তরে মোটেই খুশি হল না। গুম মেরে বসে থাকল। আসলে দিরাং বুঝে গিয়েছিল ওখান থেকে বেরোতে না পারলে তারা বিপদে পড়ে যাবে। সুতরাং যথেষ্ট চিন্তার কারণ সে দেখতে পেয়েছে।

স্যাকের ভিতর থেকে ছাতু ও গুড় বের করে জল দিয়ে মাখল ধীর। কিছুটা দিরাং-কে দিয়ে বাকিটা সে খেতে থাকল। খাওয়া শেষ হতেই সে কাজে লেগে পড়ল। আধঘন্টা পর ধীর একটা উপায় বের করল। কিছুটা ঝুঁকির কিন্তু ওটা ছাড়া সে অন্য কোনও উপায় দেখল না। ভাঙা পাথরস্তূপে চড়ে একটা ছোট্ট ফাঁক দিয়ে দড়ির সাহায্যে সে দক্ষিণের ঢালে নামার চেষ্টা করল। পাথরের মধ্যে ফাঁস দিয়ে তার মধ্যে ডাবল করে দড়িটা গলিয়ে নীচে ফেলল। দড়ি নীচের বরফের ঢাল পর্যন্ত পৌঁছালো না। ফুট দশ কম হল। অর্থাৎ প্রথম জন বাকি দশ ফুট ঝাঁপ দিয়ে নীচে নামবে। শেষ যে নামবে সে ঝাঁপ দেওয়ার সময় দড়ির একটা দিক ধরে তলায় ঝাঁপ দেবে। নীচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দড়িও নীচে নেমে আসবে।

উপায় না দেখে দিরাং শেষ পর্যন্ত ওই পথে যেতে রাজি হল। দিরাং অসম্ভব শক্তিশালী মানুষ। প্রথমটা ভয় পেলেও পিঠে স্যাক নিয়ে দশ মিনিটের মধ্যেই ঝাঁপ দিয়ে সে নীচে। বরফে কিছুটা মাখামাখি হয়ে সে দিব্যি দাঁড়িয়ে পড়ল। কোমরের হাড় ভেঙে যাওয়ার কথা কিন্তু তার কিছুই হল না। কিছুক্ষণ পরেই ধীর এক হাতে দড়ি নিয়ে সটান নীচে। তার পায়ে ট্রেকবুট থাকায় সে আর গড়াগড়ি খেল না। পায়ের তলায় এবার তাদের নরম বরফ। ধীরের স্থির বিশ্বাস, ওই বরফ ঢাল ধরে উপরে উঠলে তারা গিরিশিরার মাথায় পৌঁছে যেতে পারে। দিরাং কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও বিশ্রাম নিতে চায়নি। সাড়ে চারটের সময় তারা দু'জন গিরিশিবার উপরে এসে দাঁড়ল। সেখানথেকে মাত্র পনেরো মিনিট উত্তরে দুই গিরিশিরার সংযোগস্থল। অর্থাৎ সাচ্চুধুরা। এতক্ষণ দুমড়ে থাকা দিরাং লাকা-র দৌড়াদৌড়ি দেখবার মতো। উপরে মুহুর্মুহু বাতাসের ঝাপটা উপেক্ষা করে মুখে আঙুল দিয়ে সে সিটি বাজাল

কয়েকবার। এমন আনন্দ করার অধিকার আছে তার। এ তার অর্জিত সাফল্য।

অভাবনীয় দৃশ্য তাদের সামনে। দক্ষিণে ইটু ছাড়িয়ে গাবুং, এমনকী পিতসি জনপদের কিয়দংশও দেখতে পেল ধীর। ওখান থেকে কি তাদের সাফল্য কারও নজরে পড়তে পারে? মনে হয় না সেটা সম্ভব। পূবদিকে আলাপানি ও আলাপানি হিমবাহ বলতে গেলে হাতের কাছেই। উত্তর-পশ্চিমে তাকাতেই মাতরা হিমবাহের দুটি ভাগই সে পরিষ্কার দেখতে পেল। দু'বার সামান্য এগিয়ে গিয়ে যা দেখেছিল অবিকল তেমনিই আছে। বিধ্বংসী প্রাকৃতিক কারুকার্যের জমাট মানচিত্র বলে ভুল হয়। মাতরা হিমবাহের শরীর ছুঁয়ে থাকা মাতরা রেঞ্জকে খুঁটিয়ে দেখল ধীর। সোনাম ওই রেঞ্জ টপকে ইরিকা ম্যাডামকে ডোলি উপত্যকায় নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কীভাবে সেটা সম্ভব তা একমাত্র সোনাম চিকুই বলতে পারে। দুরন্ত মাপের পর্বতারোহীদের কাছে অবশ্য অসম্ভব বলে কিছু নেই।

ক্লান্ত শরীর বাতাসের ঝাপটায় নাজেহাল হওয়ার আগেই তারা গিরিশিরা ধরে দক্ষিণে অনেকটা নেমে এল। সাচ্চুধুরার অবস্থান দুই গিরিশিরার সংযোগস্থলে, নাংগেলজি বলেছিলেন। তবে গিরিশিরা থেকে পূর্বে আলাপানির দিকে নামার সময় একটা পথ সে খুঁজে পেল। কেউ কখনও ওই পথ ধরে আলাপানির দিক থেকে গিরিশিরায় উঠেছে কি না তা সে জানে না। অবশ্য এটার যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ নেই। কিছুটা নেমে আসার পর ধীর থেমে গেল। দিরাং-ও। সত্যিই তাদের পা আর চলছিল না। হাতের কাছে পাথরের একটা চাটান দেখে তারা দু'জন বসে পড়ল। কথা নেই বার্তা নেই দিরাং পুজোর ব্যবস্থা করে ফেলল। সানজিমাতার মঙ্গল কামনায় রীতিমতো মন্ত্রপাঠ করে পুজো। ধীব ভোগ পেল — তিলের নাড়ুর মতো দেখতে — খেতে অতি সুস্বাদু।

পুজো শেষ হতেই বরফ তুলে স্টোভে চা বসাল ধীর। নরম চানাচুর আর চিঁড়েভাজা সঙ্গে ঠাণ্ডা চা। কে কতটা ক্ষুধার্ত, ডিনার কখন বসবে এসব আলোচনা হল না। ধীর দেখল দিরাং কম্বলমুড়ি দিয়ে এবং সে স্লিপিংব্যাগের মধ্যে, খোলা আকাশের নীচে। তাঁবু যেমন প্যাক করা ছিল তেমনই পড়ে থাকল। প্রায় পনেরো ঘন্টা দাপাদাপির পর রাত্রিবাসের জন্য জায়গাটা খুব একটা মন্দ ছিল না।

পরদিন চাসু উপত্যকার প্রথম রোদ্দুর তাদের দু'জনের জন্য বরাদ্দ করা ছিল। এত সকালে রোদ — তাও আবার চাসু উপত্যকায়! উঠতে ইচ্ছে না করলেও শরীরে তাপ পড়তেই তারা নড়েচড়ে উঠল। বরফ গলিয়ে চা হল — এমনকী আধসিদ্ধ চাল-ডাল নামিয়ে ব্রেকফাস্টও সারা হল। কোনও রকমে জিনিসপত্র প্যাক করে তারা নীচে নামতে শুরু করল। আলাপানি হিমবাহকে বামদিকে রেখে পাঁচ ঘন্টার মধ্যে ধীর আলাপানির ধারে পৌঁছে গেল। দিরাং পিছিয়ে পড়ার ফলে আরও প্রায় পৌনে এক ঘন্টা পর আলাপানি এসে পৌঁছাল। ঘড়িতে তখন সওয়া বারোটা। ইচ্ছে করলেই আরও এগিয়ে যাওয়া যায়।

আলাপানি মাঝারি মাপের জলাশয় হলেও ইটু নালার উৎস। হিমবাহের জল এসে আলাপানিতে জমা হয়। এ ছাড়াও, চাসু উপত্যকার অধিবাসীদের কাছে এটি একটি পবিত্র কুণ্ড। বৈশাখি পূর্ণিমার একদিন আগে দলবেঁধে মেয়েরা এই দুর্গম পথে পাড়ি দেয়। চাসু উপত্যকায় ওই সময় অথর্ব বৃদ্ধা ও বাচ্চা ছাড়া কোনও মেয়েই ঘরে থাকে না। কুণ্ডে নেমে স্নান করার বিধি নেই। পাত্রে জল তুলে স্নান করতে হয়। স্থানীয় জনগণের বিশ্বাস দেবাদিদেব মহাদেব কমণ্ডুলের আঘাতে আলাপানি কুণ্ড তৈরি করেন। তারপর কুণ্ডে স্নান সেরে মহিলারূপ ধারণ করে সানজিধামে পার্বতীকে প্রতিষ্ঠা করে যান। স্থানীয় মানুষজনের বিশ্বাসের হাত ধরেই আলাপানি ও সানজিধাম পীঠস্থান হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

মহাদেবের কমণ্ডুল ছিল, তার আছে আইস অ্যাক্স। দেবতা হিসাবে তাঁর তুলনা মেলাই ভার। এমন মেজাজি ও ভক্তবৎসল দেবতা সত্যিই বিরল। সারা হিমালয় তাঁর কাছে অবাধ বিচরণক্ষেত্র। আইস অ্যাক্স হাতে ধীর আলাপানির ধারে গালে হাত দিয়ে বসে থাকল যদি প্রভু প্রীত হয়ে দর্শন দেন। দিলেন, কিন্তু তিনি মহাদেব নন, শ্রীযুত দিরাং লাকা। তাকে ফেলে ধীর দ্রুত এগিয়ে আসায় তার খুব গোঁসা হয়েছিল। সরাসরি জেরা করল ক্ষিপ্ত দিরাং।

— ইয়ে কোই দৌড়নেকা জগহ হ্যায়! কাঁহা ভাগ রহে থে আপ?

খুব অন্যায় হয়েছিল। রাস্তা সহজ হলেও তার সঙ্গে থাকা উচিত ছিল। সপ্তাহ ঘুরতে চলল তার পেটে দারু পড়েনি। এখন দিরাং-এর মেজাজ ঠিক থাকার কথা নয়। ধীর বুঝল একমাত্র ভক্তিরসই পারে তাকে শান্ত করতে।

— এখানে পুজো দিতে চাই। ব্যবস্থা করা যায় না?

অবাক হল দিরাং। সাহেব পুজো দিতে চায়! তার রাগ মুহূর্তের মধ্যে গলে জল। তবে সাহেব মজা করছে কি না জানতে ধীরের মুখের দিকে তাকাল সে। ধীরের মুখ সর্বদাই ভক্তিরসের আধার। সন্তুষ্ট না হয়ে পারে।

— জরুর জরুর। আপ পানি ডালো — ম্যায় পূজা তৈয়ার কর রহা হুঁ।

মেসটিন ধুয়ে আলাপানির পবিত্র জল তুলে রাখল ধীর। দিরাং-ও চটজলদি পুজোর ব্যবস্থা করে ফেলল। ওই ফাঁকা মনোরম পরিবেশে দিরাং-এর কণ্ঠ গমগম আওয়াজে ধ্বনিত হচ্ছিল। পুজোর পর প্রসাদ এল হাতে — এক টুকরো গুড়। অবজ্ঞা না করে তাই-ই মুখে চালান করে দিল ধীর। সব গুছিয়ে স্যাক পিঠে তুলে অপেক্ষা করছিল দিরাং। হঠাৎ ধীর জানাল সে আলাপানিতে থাকতে চায়। দিরাং কিছুটা এগিয়ে যেতে চায়। তবে সাহেবের জোরাজুরিতে শেষ পর্যন্ত তাকে থাকতে হল। সেই দিনটা ধীরের দারুণ কেটেছিল, আজও তার মনে পড়ে।

খাবার কমিয়ে ফেলতে গিয়ে হুড়োহুড়িতে কিছু দরকারি জিনিসও ছেড়ে এসেছিল ধীর। যেমন নুন, মসলা আর দুধের প্যাকেট তাদের ভাঁড়ারে ছিল না। খিদের মুখে আলুনিখাবারই দারুণ লাগে। এসব আয়েসি কথাবার্তার সঙ্গে দিরাং একমত নয়। কোনও রেয়াত না করে সময় পেলেই সাবজিকে দু'কথা শুনিয়ে দেয়। নুনের শোকে প্রায় পাগল হওয়ার জোগাড় দিরাং। কোনও মানে হয়! সারা পৃথিবীতে যখন এত অভাব এত সমস্যা তখন আধ প্যাকেট নুনের জন্য পুত্রশোকে কাতর সত্যিই হাস্যকর। তার দুঃখ হয় দিরাং লাকা-র জন্য। বেচারা জীবনের গূঢ় রহস্যই ধরতে পারল না। বই থেকে মুখ তুলে তাঁবুর মুখে গুম হয়ে বসে থাকা দিরাং-এর দিকে তাকাল ধীর। একেবারে চোখে চোখ। হঠাৎ-ই সে মুখ খুলল। কিন্তু এ কী কথা তার মুখে!

"মেরা জিন্দেগি মে নিমক্ বহত কম হ্যায় সাব্। ইসকি বজেসে মেরা অ্যায়সা বুরা হাল। সায়েদ আপকা পাততা হ্যায়।"

মনে মনে যে সব কথা ভাবছিল ধীর তা কি পড়তে পেরেছিল দিরাং? তার জীবনে নুনের খুব অভাব। এবং সেই জন্যই যে তার এমন বেহাল অবস্থা তা সত্যিই জানে ধীর। হঠাৎ কোথাকার নুন কোথায় চলে গেল! জীবনের রহস্য দিরাং না সে নিজে — ঠিক কে ধরতে পারেনি তা আর ভাবতে চাইল না ধীর।

মাত্র ষোলো কিলোমিটার রাস্তা ধীরে ধীরে নেমে গেছে মাচদা পর্যন্ত। মাথায় জল দিয়ে টেরি কেটে সাত সকালেই দিরাং তৈরি। সে এগিয়ে গেলেও ধীর অল্প অপেক্ষা করে রওনা হল। সারা রাস্তায় কোথাও দিরাং-কে সে দেখতে পেল না। আগের দিনের বদলা বলে মনে হল তার। বেলা বারোটা নাগাদ মাচদা ঢোকার মুখে একটু ভাবল ধীর। ওই সময় তার দিরাং না আপাং কার কাছে গিয়ে ওঠা উচিত। আপাং কেনির হোটেলে যাওয়াই সাব্যস্ত করল সে। ধীরে ধীরে শেষ ঢাল-এর হালকা চড়াই ভেঙে উপরে উঠতেই আপাং-এর হোটেল দেখতে পেল সে। কিন্তু সেখানে এত মানুষের জটলা কেন! দ্রুত পা চালায় ধীর।

দুর্ঘটনা

কেনির হোটেলের সামনে এত মানুষের জটলার কারণ যে ধীর নিজেই এটা জেনে সে অস্বস্তিতে পড়ে গেল। সমবেত জনতা তাকে অভিনন্দন জানাতে হাজির। আপাং কেনি একেবারে অন্য মানুষ। সবার হয়ে সেই নেতৃত্ব দিচ্ছিল। দিরাং লাকা-ও দলের মধ্যে শামিল। সবার মধ্যেই একটা উৎসব-উৎসব ভাব। কেনি খুব খুশি। তার দুর্ব্যবহার ভুলে পাহাড় থেকে ফিরে বিশওয়াস দাদা যে সটান তার হোটেলে চলে আসতে পারে এটা সে আশাই করেনি। কথার ফাঁকে ফাঁকে সে তার অন্যায় ব্যবহারের জন্য বারবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছিল। চাপের জন্যই যে এমন ঘটনা ঘটে গিয়েছিল সেটাও সে স্বীকার করে নিল। তবে এসব কথা ধীরের কানেই এল না। এমন মাতামাতির খবর নাংগেলজি শুনলে কী মনে করবেন—চিন্তায় পড়ে গেল সে। পাহাড় থেকে ফিরে এসে ঢোল বাজানোর উদ্দামতা তার স্বভাবের সঙ্গে মেলে না।

আসলে প্রথমে কেউ বিশ্বাস করেনি। তারা যখন সাচ্চুধুরার উপর দাপাদাপিতে প্রচণ্ড ব্যস্ত তখন হঠাৎ করে তারা ধামি আজান-এর নজরে পড়ে যায়। পতাকা হাতে দিবাং-এর দৌড়াদৌড়ি দেখে তার বুঝতে অসুবিধে হয় না এতদিন পর সাচ্চুধুরায় কোনও দল উঠতে সমর্থ হয়েছে। বলতে গেলে সারা ইটু গ্রামের লোকজন তাদের দেখতে পায়। তবে তারা ভেবেছিল সোনাম আর ইরিকা টোর-ই ওই দু'জন। দিরাং ও ধীর চাসু ছাড়াব পরদিন তারাও মাতরা অঞ্চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে উপরে ওঠে। সবাই জানত ধীর আলাপানি ঘুরতে গিয়েছে কারণ সে সেই কথাই বলে গিয়েছিল। তারা সবাই সোনাম ও ম্যাডামের ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষায় ছিল। ধামি এসে বলার পর আপাং বিনতির কাছে জানতে পারে, ওই দু'জন বিশওয়াস দাদা আর একদা তার খাস নোকর দিরাং লাকা। উপত্যকার মানুষজনের কাছে মাতরাও যা সাচ্চুধুরাও তাই। সবই প্রভু মহেশ্বরের দান।

দেড় ঘন্টা আগে ফিরে পাড়া ফাটানোর এমন সুযোগ দিরাং হাতছাড়া করতে চায়নি। সাচ্চুধুরা ওঠার তিলমাত্র ঘটনাকে সে বৈতাল বানিয়ে ফেলেছিল। উন্মাদনার ঘোরে মানুষ মুখের লাগাম হারিয়ে ফেলে। যা ওখানে ঘটেনি দিরাং তাও ঘটিয়ে ফেলেছিল। প্রচারের মধ্যে থাকার বা অন্যান্যদের কাছে বিভিন্ন কৌশলে নিজেকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার মোহ সহজে যায় না। সমাজের অর্ধ ও পূর্ণ স্বীকৃত মানুষজন এ ব্যাপারে সবার আগে থাকেন। দিরাং সে তুলনায় অতি সাধারণ মানুষ। এমন একটা দুরন্ত মুহূর্ত সে হয়তো আর দ্বিতীয়বার পাবে না। তার দিক থেকে ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক। দিরাং-এর কথা ভেবে সে চুপ করে থাকে। সে বুঝতে পারে যারা কোনও দিন তাকে চিনতই না তারাও তাকে খুব সম্ভ্রমের চোখে দেখতে শুরু করেছে। পাছে তাকে কোনও ভাষণ দিতে হয় সেই আশঙ্কায় সে দিরাং-কে সঙ্গে নিয়ে উঠে পড়ে। এ সময়ে কেনি তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

"সোনাম আর ম্যাডামের কাল মাচদায় ফিরে আসার কথা ছিল। এটা কি চিন্তার

ব্যাপার দাদাজি?" জানতে চায় কেনি।

কেনিকে কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না ধীর। সোনাম ম্যাডামকে নিয়ে ঠিক কোথায় গেছে তা সে জানে না। গতকাল ফেরার কথা ছিল তাদের। কিন্তু ফেরেনি। পাহাড়ে হিসাব মতো ফেরা যায় না। দু'একদিন দেরি হতেই পারে। তা ছাড়া, দুর্যোগে পড়ে তাদের যেমন সময় বেশি লেগেছিল ওদের ক্ষেত্রেও তেমন হতে পারে। সুতরাং চিন্তার কোনও কারণ নেই।

"না, চিন্তার কোনও কারণ নেই। দু'এক দিনের মধ্যেই মনে হয় ওরা ফিরে আসবে।"

কেনি চলে যেতেই ধীর দিরাং-কে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। চলতে চলতে ভাবছিল সে। মাতরা রেঞ্জ টপকে ডোলি উপত্যকায় যারা যেতে চায় তারা আবার মাচদায় ফিরে আসবে কেন? সঙ্গের দু'জন মালবাহক ফিরে এলেও সোনাম আর ম্যাডামের তো এপথে ফিরে আসার কথা নয়। তা হলে সোনাম কি ভাল করেই জানে কাজটা কঠিন, প্রায় অসম্ভব। ম্যাডামকে লেজে খেলিয়ে কিছু রোজগার করে নিতে চায়। তাতে অবশ্য দোষের কিছু নেই। যার টাকা থাকে কৌশল করে সেই টাকা পকেটে তোলার বুদ্ধি থাকা দরকার। সোনামের হয়তো সেই বুদ্ধি আছে। তবে একজন দক্ষ গাইডের পক্ষে সেটা শোভন নয়। টাকা রোজগার করার ক্ষেত্রে বোধহয় আজকাল অমন বোধের কেউ ধার ধারে না। এমনকী দক্ষ গাইডও না।

দিরাং-এর ঘরে এসে সাচ্চুধুরার হিসাবটা মিটিয়ে দিল ধীর। সে জানে দিরাং তার কাছে কোনও দাবি করবে না। যা করার তাকেই করতে হবে। কোনও হিসেবে গেল না ধীর। আগাম পাঁচশ টাকা বাদ দিয়ে সে দিরাংকে যা ধরে দিল তা তার প্রত্যাশার বেশিই। খুব খুশি দিরাং। এমনকী বিনতিও।

সাচ্চুধুরা চড়ে আসার পর দিরাং-এর কদর হঠাৎ বেড়ে যায়। ফের সে লালাজির খুব কাছের লোক হওয়ার মুখে। এটা সত্যিই সুখবর। তবে আবেগের জোয়ারে ভাটা পড়লে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় তা-ই দেখার। উঠে পড়ার সময় বিনতি ধীর ও দিরাং-এর মাঝে এসে বসল। বিনতি সাধারণত একটু দূরে বসে। অত কাছে আসে না।

"লালাজি কহ রহা থা, সোনাম মেমসাব কি নুকসান পহুঁছা স্যাকতা। সোনাম আচ্ছা আদমি নেহি হ্যায়।"

কেনির মনে হয়েছে সোনম ইরিকার ক্ষতি করে দিতে পারে। সোনাম মোটেই সুবিধের লোক নয়।

এসব কথা বিনতি হঠাৎ তার সামনে বলল কেন বুঝতে পারে না ধীর। সোনাম মেমসাহেবের ক্ষতি করে দিলে তার কী এসে যায়? এ কথা বিনতির কেবল দিরাং-কেই বলা

উচিত ছিল। মেমসাহেব বা সোনাম দু'জনই তার কাছে নোবডি—পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় অপরিচিত। তাদের ব্যাপার নিয়ে তার মাথা ঘামানোর কোনও সময় নেই। সে কোনও কথা বলে না। কিন্তু বিনতি তার কথা বলে যায়।

" খতরা ভি পয়দা হো স্যাকতা। লালাজি মেমসাব কো বহত সমঝায়া মগর বহ শুনতি নেহি।"

খতরা! চমকে ওঠে ধীর। পর মুহূর্তেই নিজেকে সংযত করে নেয়। তার অনুমান সোনাম ইরিকা টোর-এর কাছের লোক হওয়ায় কেনির অঢেল কামাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই এমন মনগড়া আশঙ্কা। তাছাড়া মেমসাহেবকে ধীরের যথেষ্ট শক্ত মহিলা বলে মনে হয়েছে। এবারও সে বিনতির কথায় কোনও গুরুত্ব দিল না।

দিরাং এতক্ষণ চুপ করে ছিল। হঠাৎ তার মুখটা শক্ত হয়ে গেল।

"মেমসাবকি বাত ছোড়িয়ে সাব্, সোনাম আপকা লিয়ে ভি খতরা বন স্যাকতা।"

অবাক হল ধীর। বলে কী দিরাং!

"সোনাম আমার কাছে বিপদের কারণ হতে পারে—কী বলছ তুমি?"

"জি হ্যাঁ, আপকা লিয়ে। ম্যায় বিলকুল সহি বাতা রহা হুঁ।"

আচমকাই ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে পড়ল। কী কারণে দিরাং এমন কথা জোর দিয়ে বলল সেটা তার বোধগম্য হল না। সোনামের সঙ্গে শুরুতে তার কিছু গরম কথাবার্তা চালাচালি হয়েছিল, ঠিক কথা। কিন্তু তাদের মধ্যে বন্ধুত্বও হয়েছে। এটা ঠিক, সোনামের মস্তানি করার অভ্যেস আছে। অল্পতেই তার মেজাজ চড়ে যায়। শের হয়ে থাকতে চায়। নাংগেলজির কাছে তার পাহাড়ে চড়ার হাতেখড়ি হলেও সে এলাকার মানুষ নয়। তবু এমন মস্তানির জোরটা সে পায় কী করে! এই একটা ব্যাপার তার কাছে পরিষ্কার নয়। সোনাম তার সঙ্গে বেশি ঝামেলায় জড়াবে বলে মনে হয় না ধীরের। কারণ নাংগেল তাফা। স্বভাবে দু'জন ভিন্ন ধরনের হলেও ওই মানুষটা তাদের দু'জনেরই গুরু। অর্থাৎ তারা গুরুভাই। তবু ঝামেলা হলে হিসাব করতে ভালই জানে ধীর।

সিঁড়ি দিয়ে খোলা বারান্দা থেকে নীচে নেমে পিছনে ফিরে তাকাল ধীর। ঠিক তাব দু'কদম পিছনে দিরাং।

"ম্যায় আপকা সাথ হুঁ সাব্। মুঝে ভি থোড়া-বহত হিসাব চুকানা হ্যায়।"

মুচকি হাসল ধীর। তবে রহস্যটা থেকেই গেল। তার সঙ্গে দিরাং আছে বোঝা গেল। কিন্তু কার সঙ্গে তার কী হিসাব চুকানো বাকি আছে সেটা ধীর বুঝতে পারল না। সেটা কি

সোনামের সঙ্গে? তবে কে তার কাছে কতটা বিপজ্জনক তা নিয়ে ভাবার আপাতত কোনও প্রয়োজন দেখতে পেল না ধীর।

মুখিলাল তার মনিবের কথায় ওঠে বসে। তবু দিন দশ আগে হঠাৎ তার মনিব বাঙালি দাদার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিল তা তার ভাল লাগেনি। ফের আগের মতো সব ঠিকঠাক। সে খুব খুশি। খুশি ধীরও। মুখি থাকলে তাকে কোনও কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। তার বরাদ্দ করা ঘরে এমনকী সে গন্ধওয়ালা ধূপকাঠি জ্বেলে রাখতেও ভুল করে না। ঘরে ঢুকে মনটা ভরে গেল ধীরের। খুব চা খায় সে। আধ ঘন্টা পর পরই তার ঘরে চা এনে রাখে মুখি। সব চায়ের হিসাবও থাকে না। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মুখি চা এনে রাখল।

"উপ্পর যা কর আপলোগ ক্যায়া কিয়া দাদাজি? ক্যায়া আপ চাঁদ পকড় কর লায়া?"

মাচদার মানুষজন তাদের সাচ্চুধুরা ওঠা নিয়ে প্রচুর শোরগোল তোলে। মুখির কাছে ব্যাপারটা বোধগম্য হয় না। কেউ কোথাও উঠে পড়লে এত হল্লা করার কী আছে? সামান্য রোজগারের ভৃত্যমাত্র মুখি। এসব করে যে প্রচুর ফায়দা তোলা যায় তা সে জানে না। হিন্দি ভাষায় একটু মজা করতে ইচ্ছে হল ধীরের।

"নেহি, চাঁদ নেহি মুখি—ম্যায়নে তুমহারি লিয়ে উপ্পরসে এক পরী পকড়কে লায়া।"

পরীর কথা শুনে মুচকি হেসে জব্বর জবাব দিল মুখি।

"আপ ক্যায়া পরী পকড়োো দাদা—পরী তো সচমুচ মেরা ভাইসাব নে পকড়কে লায়া।

মুখির কাছে ঘটনাটা শুনে চিন্তায় পড়ে গেল ধীর। আপাং কেনি এখন অন্য পরী ধরেছে! বিনতিকে বোধহয় তার আর মনে ধরছে না। সপ্তাহ খানেক হল এসে জুটেছে এক উদ্ভিন্ন যৌবনা যুবতী। মেয়েটির বয়স নাকি ষোলো-সতেরো। সন্ধের পর ঘন্টা কয়েক মেয়েটি নাকি তার হেপাজতেই থাকে। পঞ্চাশ পার করা কোনও প্রৌঢ়ের এমন কাহিনী চাসু উপত্যকায় কোনও খবরই নয়। তবে কেনির পক্ষে এমন লাগামছাড়া হওয়ার অসুবিধে প্রচুর। তবু ভাবতে হল ধীরকে।

ঘটনাটা সত্যি হলে সমস্যায় পড়তে পারে বিনতি। নারী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে শেষ কথা বলে বোধহয় কিছু নেই। এই ভাব তো এই আড়ি। আড়ি শুরু হলেই গড়াগড়ি অবস্থা। অবশ্য যদি হৃদয়ের ব্যাপার থাকে তবেই। শুধু শরীরও কম নয়। অনেকটা হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ধরেন তিনি। তাও হঠাৎ আলগা হয়ে যেতে পারে। একজনকে মন দিয়ে সারাজীবন নিবেদিতপ্রাণ হয়ে থাকার অভ্যাস এখন সম্ভবত কমার মুখে। কখন কে

কার বুকে ছাপ মেরে বসে তার হিসেব মেলাই ভার। বিনতি হেলাফেলার মেয়েমানুষ না হলেও মুখির বিবরণ থেকে উঠে আসা যুবতীর কাছে যথেষ্ট পিছিয়ে। কী করবে বিনতি এখন? ভাবে ধীর।

এর আগে বিনতির সঙ্গে তার সামান্য আলাপ ছিল। সেটা কেনির সৌজন্যেই। এবার সে তাকে খুব কাছ থেকে দেখল। প্রয়োজনের চেয়েও বেশি কথা হয় দু'জনের মধ্যে। বেশির ভাগটাই অবশ্য দিরাং-এর অভ্যাস ও ব্যবহারকে কেন্দ্র করে। মনে হয়েছিল এক অসহায় মহিলা তার সাহায্য চায়। দিরাং-কে কিছুটা মেরামত করতে বিনতি তার সাহায্য চেয়েছিল। একজন বিবাহিতা মহিলার অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেই সে নষ্ট মেয়ে এটা ধীর বিশ্বাস করে না। যৌবনের প্রারম্ভে রাঁচি, বণ্ডামুণ্ডা, বীরমিত্রপুর, খাপরখেডা ও মোতিবাগে কুলির কাজ করার সময় সে এসব আকছার ঘটতে দেখেছে। এসব ঘটনা ঘটে যায়। ভাললাগার চেয়েও তাৎক্ষণিক প্রয়োজন প্রায়ই বড় হয়ে দেখা দেয় সে সময়। যেখানে এসব ঘটে সেখানকার নিয়মেই হিসাব-নিকাশ চলে। অনিবার্যভাবেই কোথাও কোথাও মহীরুহের মূলোচ্ছেদ ঘটে আবার লতাপাতার জঙ্গলে সব ঠিকই থাকে।

আপাং কেনির সঙ্গে বিনতির সম্পর্ক আপাতত বাসি হওয়ার জোগাড় হলেও বিনতিকে সে সম্মান করে। হঠাৎ তার চিত্রপটে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম আভাস। এবার কী করবে বিনতি? তাই বোধহয় দিরাং-কে সে ফের আগের অবস্থায় ফিরে পেতে এত মরিয়া। তার একটা কাজ হলে বিনতি পায়ের নীচে জমি পায়।

চোখে চোখ লেগে গিয়েছিল। শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। খুব ক্লান্ত ছিল বুঝতে পারেনি ধীর। চোখ রগড়ে তাকিয়ে দেখে সামনে একটি মেয়ে।

"আপকা খানা সাব্।"

খানা! ঘড়িতে তাকিয়ে দেখে দশটা। হোটেল বন্ধ হলেও কেনির ঘরের অ্যান্টিচেম্বারে হালকা উল্লাস তখনও শোনা যায়।

"ঠিক হ্যায় রাখ দো।"

খাবার রেখে মেয়েটি চলে গেল। পরীকে দেখল ধীর। তার মনে ধরেনি। এই মেয়ের জন্য বিনতিকে বাতিল করার মতো উল্লুক আপাং নয়। যে কোনও কম বয়সী মেয়েই শরীরের ভারে সন্ধে নামাতে পারে। মেয়েটির মধ্যে তারও অভাব। শক্ত কাঠখোট্টা চেহারা — মেয়ে বলে মনেই হয় না। বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকে মুখি। অনেকদিন বউকে কাছে পায়নি। তাই মেয়ে দেখলেই পরী দেখে। অথচ বিনতির ক্ষেত্রে মুখির মধ্যে, আশ্চর্যভাবে, কোনও

বেচাল দেখা যায় না। বিনতিকে সে যথেষ্ট সম্মান দিয়ে কথা বলে। আর ওখানেই বিনতি সবার চেয়ে আলাদা।

ঘুম আসছিল না ধীরের। বাইরে বেশ হাওয়া। জানালা খুলতেই প্রচুর বাতাস ঢুকে ঘরটা এলোমেলো করে দিল। সেদিকে তার খেয়াল থাকল না। ইদরিনালার খলমল করে বয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে থাকল সে। হঠাৎ মনে হল, দরজায় কেউ টোকা মারছে। দরজা তার খোলাই থাকে। দরজা ঠেলে ঢোকে আপাং। অবাক হল ধীর। অর্ধ মাতাল অবস্থায় আপাং-কে সে কোনওদিন দেখেনি।

আপাং কেনি তার খাটের সামনে রাখা চেয়ারে এসে বসল। বেশ উদভ্রান্ত। ধীর কিছু জানতে চাইল না। কোনও কিছু বলার না থাকলে এত রাতে সে কিছুতেই তার ঘরে ঢুকত না। আপাং-এর কথাও সামান্য জড়িয়ে যাচ্ছিল। ঠিক কী সে বলতে চায় ধরতে পারছিল না। হঠাৎ তার খেয়াল হল, যে মেয়েটি তাকে খাবার দিয়ে গিয়েছিল তার কথাই বলছে সে।

— জান বিশওয়াস দাদা, মেয়েটা খুব দুঃখী। কথা বলতে পারে না।

খাবার দেওয়ার সময় মেয়েটিকে তো ধীর কথা বলতে শুনেছে। মেয়েটি যে বোবা এটা জানল কী করে আপাং! বলবে না ঠিক করেও কথাটা বলে ফেলল ধীর।

— আচ্ছা আপাং ভাই, মেয়েটি যে বোবা এ কথা তোমাকে কে বলেছে?

ধীর যে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করছে এটা আপাং-এর কানে এল না। সে তার কাহিনীতেই গাঁথা হয়ে থাকল।

— মেয়েটা অনাথ। বিচ্ছিরি দেখতে। আমি এখন কী করি বলতো?

ভাল করে শোনার পর পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারে ধীর। মেয়েটির নাম দিশ। কিছুদিন আগে সে একজন পথচারীকে ধাক্কা মেরে পাহাড়ের নীচে ফেলে দেয়। মানুষটি মারা যায়। সানজিধামে কয়েকদিন থাকার সময় দিশ হঠাৎ রেগে গিয়ে একজন আশ্রমিককে মারাত্মকভাবে জখম করে দেয়। সে অশুভ শক্তির প্রতীক। যে কোনও সময় অকারণে দিশ মানুষের ক্ষতি করে দিতে পারে। সানজিদেবীর অনুরোধে আপাং এক মাসের জন্য তার হোটেলে মেয়েটিকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছে। কেনির ওই হঠাৎ আগমনের উদ্দেশ্য হল, দিশকে নিয়ে সে এখন কী করবে সে ব্যাপারে ধীরের পরামর্শ নেওয়া।

ঘটনাটা এমনই অস্বাভাবিক যে ধীর পরামর্শ দেওয়ার জায়গাতেই নেই। কিন্তু সেটা কেনিকে বলা যায় না তাই আগ্রহ দেখাতে সে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে সবটা তার কাছে জেনে নিতে চাইল। ধীর যে তাকে দিশ-এর ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করতে চায় বুঝল কেনি। স্থির হয়ে প্রশ্নের অপেক্ষায় বসে থাকল সে।

— দিশ সানজিধামে এল কীভাবে মাতাজি তোমায় বলেননি?

— না। মাতাজিকে প্রশ্ন করা যায় না, বিশওয়াস দাদা।

— ওর বাবা-মা'র পরিচয়?

— তাও উনি আমায় বলেননি।

— তোমার কি মনে হয় দিশ এলাকার মেয়ে?

— আমার কোনও ধারণা নেই। তবে হলেও হতে পারে।

একটু সময় নিয়ে ফের শুরু করল ধীর।

— যতই হোক দিশ যুবতী মেয়ে। কোনও পরিবারে না রেখে মাতাজি হঠাৎ ওকে তোমার হোটেলে রাখতে চাইলেন কেন?

— সত্যিই অবাক ব্যাপার। তবে মাতাজির সিদ্ধান্ত মানেই আদেশ। নড়চড় হওয়ার উপায় নেই।

— দিশ যে অশুভশক্তির প্রতীক এমন সিদ্ধান্তে কারা কীভাবে এসেছে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল কেনি। মুখ তুলে ধীরের দিকে তাকালেও জবাবটা যেন মেঝের উপর পড়ল।

— আমাকে জানানো হয়েছে। কে জানিয়েছেন তা বলা বারণ। তুমি কিন্তু এতটা সাহসী হতে যেও না।

যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে ধীর পরের প্রশ্নে চলে গেল।

— একমাস পর মাতাজি কি দিশকে সত্যিই ধামে আবার ফিরিয়ে নেবেন?

— সেই প্রতিশ্রুতিই উনি আমাকে দিয়েছেন।

— দিশ-এর মধ্যে এই ক'দিনে তুমি কোনও অস্বাভাবিকতা দেখেছ?

— না, তেমন কিছু না। তবে পুরুষমানুষদের দিকে ও এমন করে তাকায় যে মাঝে মাঝে খুব ভয় করে।

— মেয়েদের ক্ষেত্রে ওর ব্যবহার কেমন?

— মেয়ে বলতে তো ও ছাড়া বিনতি। বিনতিকে ও খুব ভালোবাসে। ব্যবহারে অবিকল

যেন মা আর মেয়ে।

একটু সময় নিয়ে ধীর পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখল। পরামর্শ না দিয়ে একটা উপায় কেনির সামনে তুলে ধরল সে।

— দশদিন তো হয়েই গেছে। বাকি সময়টা দিশকে তুমি বরং বিনতির হেফাজতে রেখে দাও।

— তা হয় না বিশওয়াস দাদা।

চুপ করে থাকল ধীর। কেন তা হয় না সেটা তার জানার দরকার নেই। কোনও মহলের কোপে পড়ার শঙ্কা কেনির মধ্যে থাকতেই পারে। যারা ব্যবসা করে খায় তারা ধর্ম ও রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চায়। অতি তুচ্ছ ব্যাপার থেকেও মারাত্মক প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে চলতে চায় আপাং কেনি। তবে তার দুরবস্থার কথা ভেবে ধীর নিজে দিশকে এক প্রস্থ পর্যবেক্ষণ করে দেখতে চাইল।

— এক কাজ কর। মেয়েটার গায়ে হয় এমন এক সেট ঝলমলে পোশাক এক্ষুনি তুমি আমার কাছে রেখে যাও। সকালে চা দিয়ে দিশকে তুমি আমার ঘরে পাঠিয়ে দিও।

কোনও কিছু জানতে চাইল না কেনি। উঠে গিয়ে এক সেট রঙিন সালোয়ার কামিজ এনে ধীরের টেবিলে রেখে তার ঘরে চলে গেল।

একটু ভোর ভোরই দিশ তার ঘরে চা নিয়ে ঢুকল। তার ঘরের দরজা খোলাই থাকে। ধীর ভেবেছিল কালকের মতোই দিশের মুখে সে 'খানা'র বদলে শুনতে পাবে—চায় সাব্। তা কিন্তু হল না। চা হাতে নিয়ে ও দাঁড়িয়ে থাকল। উঠব উঠব করছিল ধীর। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ইশারায় টেবিলে চা রেখে দিতে বলল। দিশ চা রাখতেই ধীর কাপড়ের প্যাকেট আর একটা ক্যাডবেরি চকোলেট ওর হাতে তুলে দিল। এমন ঘটনায় মেয়েটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ভুলভুল করে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকল। জিনিসগুলো নিয়ে ও কী করবে যেন ভেবে পাচ্ছিল না। চায়ে চুমুক দিতে দিতে মিনিট খানেক ব্যাপারটা লক্ষ করল ধীর। তারপর মুকাভিনয়ের মাধ্যমে কাপড়টা যে ওকে পরার জন্য দেওয়া এটা জানিয়ে দিল। পর মুহূর্তেই সে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

প্যাকেট থেকে সালোয়ার কামিজ বের করে টেবিলে রেখেই দিশ ওর পরা কাপড় খুলে ফেলল। প্রায় আধমিনিট সময় ধরে ধীর দেখল একটি যুবতী মেয়ে উলঙ্গ অবস্থায় তার সামনে দাঁড়িয়ে। অবশ্য তার পর কালবিলম্ব না করে ও নতুন পোশাক পরে নিল। পুরনো কাপড় মেঝেতে ফেলে রেখে প্রায় লাফাতে লাফাতে বাইরে বেরিয়ে গেল দিশ। মিনিট দুই'র জন্য ধীর চায়ে চুমুক দিতে ভুলে গেল। তার পর উঠে দিশের পরা জামাকাপড় সরিয়ে রেখে

দিল। ফের বিছানায় এসে সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

প্রথমেই দিশের চেহারাটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। পাঁচ ফুট ছয়-সাত হতে পারে। চৌকো তামাটে মুখে প্রচুর পরিশ্রমের ছাপ। ঘন চুল হলেও কাঁধ ছাড়িয়ে নীচে নামেনি। এক কাঁধ থেকে আর এক কাঁধ পৌনে দু'ফুটের কম নয়। অথচ খুব ছোট্ট বুক। মেয়ে বলে মনেই হয় না। বুক থেকে নাইকুণ্ড পর্যন্ত সম্পূর্ণ মেদহীন। আরও গভীরে কোনও লোমের চিহ্ন তার নজরে পড়েনি। দুই পা চমৎকার সমান্তরাল রেখায় পেশির খেলা বলে ভুল হয়। মহিলা বক্সারদের চেহারা সম্ভবত এমনি হয়।

মূক ও বধির হলেও দিশ যা করল ওর বয়সের কোনও মেয়েরই সেটা করার কথা নয়। অথচ অবলীলাক্রমে ও সেটাই করল। বয়স্ক হলেও ধীর পুরুষমানুষ এবং দিশের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তা হলে এমন কি হতে পারে—বেশির ভাগ সময়টাই ও স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে থাকে? ক্বচিৎ, ক্ষণিকের জন্য স্বাভাবিকতা ফিরে পায়? ওযে অস্বাভাবিক কিছু করে গেল এটা ওর ব্যবহারে অন্তত ধরা পড়েনি। ক্যাডবেরিটা ও টেবিলেই ফেলে রেখে গেল। অর্থাৎ সেটার কথা ওর মাথাতেই ছিল না। নতুন কাপড় পরার পরই ওর কাজ শেষ।

ধীর মনোরোগবিদ্যায় পারদর্শী নয় কিন্তু তবু তার মনে হল, দিশ কঠিন মানসিক রোগের শিকার। ওর পরিচর্যা দরকার। ওকে সুস্থ করে তোলার জন্য দ্রুত মানসিক চিকিৎসালয়ে পাঠানো দরকার।

বাইরে বেরিয়ে এসে খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত কেনির ঘরে দিশকে পাওয়া গেল। হাত-পা ও নতুন পোশাক নেড়ে দিশ কেনিকে ওর খুশির কারণ জানাতে ব্যস্ত। কেনি বিছানার উপর বসে যেন এক অন্যমানুষ। মেয়েটা তার কাছে হাজার সমস্যার কারণ হওয়া সত্ত্বেও চোখে তার জল। সম্ভবত দিশকে খুশিতে উপচে উঠতে সে প্রথম দেখল। পিছন থেকে গিয়ে ধীর দিশের হাতটা তুলে ক্যাডবেরিটা ধরিয়ে দিল। সহসা ওর খুশির জোয়ারে বান এল। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য! না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ধীরেরও চোখে জল এল তবে কেনির মতো গড়িয়ে পড়ল না।

ওই দিন দুপুর বেলা হঠাৎ হইচই শব্দ শুনে ডায়েরির পাতা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে ধীর। হোটেলের বাইরে বেশ কিছু মানুষের জটলা। কী ঘটনায় জনতা এত চঞ্চল কিছুতেই বুঝতে পারে না সে। হঠাৎ তার সামনে কেনি—যেন বদ্ধ উন্মাদ। তার কাছেই ঘটনাটা জানতে পারে ধীর। সোনাম আর ম্যাডামের অভিযান দুর্ঘটনায় পড়ে পরিত্যক্ত। সোনাম চিকুর ভারী চোট। কোনও মতে তাকে মাতরা নালার মাঝখানে আনা সম্ভব হয়েছে। সেখানে অতি দ্রুত লোক পাঠানো দরকার। শোনা মাত্র দু'জনকে উপরে পাঠানোর ব্যবস্থা

করেছে কেনি। ধীরের কাছে সে জানতে চায়, আর কী কী সে করতে পারে। সামান্য সময় নিয়ে ভাবে ধীর। মাথা নামিয়ে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করতে যে সময় লাগে ততটুকুই। তার পরই সিদ্ধান্ত নেয়।

"তুমি শান্ত হও। দিরাং-কে সঙ্গে নিয়ে এখনই আমি উপরে উঠছি। দরকার মতো তোমার কাছে খবর পাঠাব।"

আপাং কেনির চিন্তা অনেকটা কমে গেল। চোস্ত হিন্দিতে সে বিশওয়াস দাদাকে ধন্যবাদ জানাল। ম্যাডামের চেয়েও সোনামের ব্যাপারে সে যে বেশি চিন্তিত এটা বুঝতে অসুবিধা হল না ধীরের।

দ্রুত তৈরি হয়েই দিরাং-এর কাছে ছুটল ধীর। দিবানিদ্রা থেকে তাকে তুলতে হল। কেনির কথায় এভাবে উপরে যেতে দিরাং-এর প্রবল আপত্তি ছিল। কিন্তু সাহেবের মুখের উপর সে 'না' বলতে পারল না। স্ট্রেচার বানাতে কয়েকটা কাঠের টুকরোও সঙ্গে নিল ধীর। মাতরা নালা লক্ষ্য করে হাঁটতে থাকল তারা দু'জন। প্রায় ন'কিলোমিটার পথ। তার মধ্যে তিন কিলোমিটার ভাল চড়াই। তবু তারা যথেষ্ট দ্রুত পৌঁছে গেল। সাতটার মধ্যেই অভিযানের তাঁবু দেখা গেল। সওয়া সাতটায় তাঁবুর সামনে। তাঁবুর মধ্যে মানুষ বা জিনিসপত্র ছিল না। আরও কিছুটা উপরে উঠতেই ব্যাপার কী বুঝতে পারা গেল। ম্যাডাম একজন মালবাহককে নীচে পাঠিয়েছিলেন। নীচের তাঁবুটি সে-ই লাগিয়ে যায়।

একজন মালবাহক আর ইরিকা ম্যাডাম অর্ধশায়িত সোনাম চিকুর সামনে দাঁড়িয়ে— সম্ভবত সাহায্যকারী দলের অপেক্ষায়। আপাং যাদের উপরে পাঠিয়েছিল তারা তখনও এসে পৌঁছায়নি। অথচ দেড় ঘন্টা পর রওনা দিয়ে দিরাং-কে সঙ্গে নিয়ে সে হাজির। ধীর বিশ্বাস ওখানে পৌঁছে যেতে পারে এটা ম্যাডাম স্বপ্নেও প্রত্যাশা করেননি। প্রথম যে কাজটা করা দরকার সেটাই করতে চাইল সে। সোনামকে পরীক্ষা করে দেখল ধীর। তার বাম পায়ের হাঁটু ও ডান পায়ের গোড়ালি অল্প ফোলা। কোন কিছু ভেঙে থাকলে যে তীব্র যন্ত্রণা হয় সোনামের মুখে তার প্রকাশ ছিল না। এমন একজন তেজি মানুষ দুর্ঘটনায় পড়ে চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লে তাকে খুব অসহায় লাগে। তার উপর সে সর্বদাই বাজিজেতার ঘোড়া হয়ে থাকতে চায়। তার পক্ষে ধীর বিশ্বাসের সাহায্য নেওয়া এক ধরনের মানসিক যন্ত্রণা। কোনও কারণ না থাকলেও ধীরকে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে।

সোনামের অস্বস্তি বাড়ে এমন কোনও কিছু করল না ধীর। পরীক্ষা করার পর উঠে দাঁড়িয়ে যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে কথাটা বলল সে।

"অ্যায়সা জাদা কুছ নেহি হুয়া। জলদি ঠিক হো জায়েগা।"

কাকে কেন কথাটা বলা হল বোঝা গেল না। কিন্তু কাজ হল। সোনামের মুখ অল্প নড়ে

উঠল। ধীরের কথাকে সমর্থন করতেই সম্ভবত সে বলতে চাইল।

"মুঝে ভি অ্যায়সাই লাগা।"

ধীর যেন তৈরি হয়েই ছিল।

"আপ বিলকুল সহি সমঝা, সোনামভাই।"

কিছুই হয়নি শীঘ্রই ঠিক হয়ে যাবে—ওই কথাটাই নাড়াচাড়া করে জড়তা কাটানোর কাজ অনেকটা এগিয়ে নেওয়া গেল। স্ট্রেচারের জন্য আড়াআড়ি কাঠের এক পিসকে আরও ছোট করল ধীর। হাড়ের অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো দু'টো কাঠ দু'পাশে দিয়ে সোনামের বামপায়ের হাঁটুকে নট নড়ন-চড়ন করে বেঁধে দিল সে।

ম্যাডামকে বাদ দিলে স্ট্রেচার কাঁধে তোলার মতো তিনজন মজুত—দিরাং ও ধীর ছাড়া একজন মালবাহক। ফলে ভি টাইপের স্ট্রেচার বানাল ধীর। দিরাং পায়ের দিকে একা এবং একজন মালবাহক ও সে নিজে সামনে। ধীর বিশ্বাসের দিরাং-কে সঙ্গে নিয়ে কাজ করা দেখছিলেন ম্যাডাম ইরিকা। ফ্যাকাসে মুখ ম্যাডামের অবয়বকে ওই ক'দিনেই আর একটু চোয়াড়ে করে দিয়েছিল। তার সঙ্গেও কোনও অযথা বাক্য-বিনিময় করেনি ধীর। দিরাং-ও আশ্চর্য রকম চুপচাপ। হয়তো ম্যাডামের অভিযানের ছন্নছাড়া হাল তাকেও অবাক করেছিল। স্ট্রেচার নিয়ে আরও দেড় কিলোমিটার নীচে নামলে কাজ এগিয়ে থাকে। ধীর সেটাই চাইছিল। স্ট্রেচার কাঁধে নিয়ে অতি সন্তর্পণে দেড় কিলোমিটার পথ ঘোর অন্ধকার নামার আগেই পৌঁছে গেল ধীরের দল। পাহাড়ে সন্ধে হতে অনেক দেরি হয় বলেই তাঁবুর কাছে আসা সম্ভব হয়েছিল। সোনামকে তাঁবুতে রেখে তারা তিনজন বাকি মালপত্র নিতে ফের উপরে উঠল।

জিনিসপত্র নিয়ে পৌঁছাতে অনেক রাত হল। ম্যাডামের জন্য আলাদা তাঁবু পাতা হল। মালবাহকটি সোনামের কাছে থাকল। দিরাং-কে সঙ্গে নিয়ে ধীর তাদের নিজের তাঁবুতে রাত কাটাল। তাড়াহুড়োর মধ্যে তারা কোনও খাবার সঙ্গে আনেনি। শুধু এক প্যাকেট ছাতু। তাই জলে গুলে খেল দু'জন। দিরাং অসম্ভব বিরক্ত। এবার সে সকাল হলেই ফিরে যেতে চায়। এভাবে সোনামকে ফেলে যাওয়া অমানবিক কাজ এটা ধীর অনেক করে দিরাং-কে বোঝাল। গোঁ মেরে থাকলেও সে প্রতিবাদ করল না। অর্থাৎ সাহেব যখন হুকুম করছে তখন তামিল না করে উপায় নেই। কিন্তু সকাল বেলায় ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল।

সকাল সাতটায় তিনজন মালবাহক এসে পৌঁছাল। ম্যাডামের পুরনো মালবাহক ছাড়া গতকাল যারা রওনা দিয়েছিল সেই দু'জন মিলে তিনজন। কিছুক্ষণ পরেই ইরিকা ধীরের কাছে এলেন। খুব অসহায় লাগছিল তাঁকে। তাঁর কাঁচুমাচু মুখে প্রচুর কিন্তু-কিন্তু ভাব।

— তোমাদের অজস্র ধন্যবাদ। এখন তো আমাদের লোক এসে গেছে তাই তোমাদের

আর আটকে রাখতে চাই না।

কথাগুলো বলার পর ইরিকা টোর মাথা তুলে ধীরের মুখের দিকে আর তাকাতে পারলেন না। হঠাৎ এমন পরিস্থিতিতে তাদের পড়তে হতে পারে বিশ্বাস হচ্ছিল না ধীরের। দুর্ঘটনায় আক্রান্ত অভিযাত্রীদের ফেলে এভাবে সরে যেতে হয় বলে তার জানা ছিল না। বলেন কী মহিলা! তিনজনের জায়গায় পাঁচজন থাকলে তো অভিযাত্রীরা আরও নিরাপদ বোধ করতে পারে। খুব রাগ হল ধীরের। সে খোলাখুলি জানতে চাইল।

— আপনি কি আমাদের চলে যেতে বলছেন?

অনেকক্ষণ কোনও উত্তর দিতে পারলেন না ইরিকা টোর। তারপর মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর শুকনো ঘোলাটে চোখ দুটি আশ্চর্যভাবে স্থির।

— হ্যাঁ ধীর, আমি তোমাদের নীচে নেমে যেতে বলছি। আসলে কী জান, সোনাম বেশ অস্বস্তিতে পড়েছে। সে...।

ম্যাডামের মুখের কথা কেড়ে নিল ধীর।

— আর আপনি? অভিযান আপনার—অস্বস্তিতে তো আপনারই পড়ার কথা।

কোনও উত্তর দিলেন না ইরিকা। অপেক্ষা না করে দিরাং-কে নিয়ে তাঁবু গুটিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ধীর। দিরাং অবাক। হঠাৎ কী এমন হল সাহেবের সে বুঝে উঠতে পারল না। তাঁবু গুটিয়ে ওঠার সময় ধীর দেখল ম্যাডাম তার সামনে। উঠে দাঁড়ানোর সময় প্রায় শরীরে ধাক্কা লেগে যাওয়ার মতো অবস্থা।

— তুমি কি আমাদের হয়ে একটা কাজ করবে? করলে খুব উপকার হয়।

— কী কাজ বলুন?

— সানজিদেবীর কাছে একটা খবর পাঠিয়ে বলবে, সোনামকে নিয়ে আজই আমি আশ্রমে পৌঁছে যাব।

— বেশ, খবর পাঠিয়ে দেব। আর কিছু?

— না, আর কিছু না।

— আপাং ভাই খুব চিন্তায় আছে। তাকে যদি কিছু বলতে চান।

— তার সঙ্গে আমি গিয়ে কথা বলব। শুধু লোক পাঠানোর জন্য আমার হয়ে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিও।

— বেশ, দেব।

দিরাং তখন দৌড়তে দৌড়তে অনেকটা নীচে। সে বরং বেশ খুশিই। নীচে নামার মুখে ম্যাডাম আবার ধীরের কাছে এলেন। সোজাসুজি কয়েক সেকেণ্ড তিনি তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

— তুমি জানতে চেয়েছিলে আমার মধ্যে কী ঘটে চলেছে। ইতিমধ্যে যা ঘটে গেছে তা আগে কখনও ঘটেনি।

অবাক হল ধীর। সে চিন্তায় পড়ে গেল।

— আমার সাহায্য লাগলে আপনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।

— তোমাকে ধন্যবাদ। কথাটা আমার মনে থাকবে।

— আপনাদের এভাবে ফেলে রেখে চলে যেতে আমার খুব খারাপ লাগছে।

— জানি আমি। কিন্তু তাও আমি তোমাকে যেতে বলছি। কারণ আমি নিরুপায়।

ধীর সামান্য নীচে নামতেই উপর থেকে গড়িয়ে পড়া মাতরা নালার ঢালে ইরিকা টোর হারিয়ে গেলেন। অন্যদিকে দিরাং লাকা দ্রুত পথ পিছনে ফেলে তখন চোখের বাইরে।

নগলি দাকাত

বলতে গেলে জোর করেই দিরাং-কে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ধীর। মানুষের বিপদে কোনও রাগ পুষে রাখতে নেই, তাকে বুঝিয়েছিল সে। দিরাং বুঝতে চায়নি। সোনাম চিকুর মতো দুর্জনের সঙ্গে কোনও সমঝোতা হয় না, এটাই সে মোক্ষম বোঝে। তবু সে বাধ্য হয়ে গিয়েছিল। সাবজির কথা ফেলতে পারেনি, তাই। লোকটা যে আপাদমস্তক বদ, এমনকী চরম দুরবস্থার মধ্যেও, সেটাই সে তার সাবজিকে বোঝাতে চেয়েছিল। তাও তার সাবজি সেধে গিয়ে এমন হেনস্তা হলেন বলেই তার যত রাগ।

আগেও দিরাং তার সঙ্গে পাহাড়ে গেছে। বিভিন্ন ধরনের চাপের মধ্যে পড়েও সে কখনও পিছিয়ে আসেনি। অন্যান্য মালবাহকদের মতো মজুরি বা সুযোগ-সুবিধে নিয়ে কখনও দর কষাকষি করেনি। তবু এতদিন ধীরের কাছে সে তেমন গুরুত্ব পায়নি। এমনকী মাত্র ক'দিন আগেও দুরূহ অভিযানে তার যোগ্যতা নিয়েও ধীরের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সাচ্চুধুরার পর দিরাং তার কাছে একেবারে অন্যমানুষ। একটু পা চালিয়ে তাকে ধরতে চাইল সে। তবু পারল না। সানজিধামে যাওয়ার রাস্তার মুখে শেষ পর্যন্ত তার দেখা পাওয়া গেল। কিট খোলা—কম্বল আর তাঁবু হাওয়ায় শুকোতে দিয়ে মুখ বেজার করে সে বসেছিল। ধীর তার পাশে গিয়ে বসল।

"থাপ্পড়টা ভালই খেলাম — তাই না দিরাং ভাই?"

কোনও কথা বলল না দিরাং। তার মানে রাগ তখনও পড়েনি। ধীর তাকে আর চটাতে চাইল না। চুপচাপ বসে থাকল। কিছুক্ষণ পর নিজের মনেই বলে উঠল ধীর : ম্যাডাম আজই সোনামকে নিয়ে আশ্রমে উঠবেন। খবরটা পাঠানো দরকার।

ওতেই কাজ হল। তাঁবু গুটিয়ে রেখে সানজিধামের দিকে দিরাং রওনা হয়ে গেল। ধীর তার আসার অপেক্ষায় বসে থাকল। ইদরি, চাসু ও ইটু নালার মহামিলন ক্ষেত্রের দিকে মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে থাকল ধীর। দক্ষিণে উপরের ঢালে বুয়ারা গ্রামের অবস্থান ভারী চমৎকার। সেখান থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে পশ্চিমে মাচদা ছুঁয়ে অল্প উত্তরে আসতেই থমকে গেল সে। এতদিন চাসুতে থাকা হল অথচ নগলির কাছে তার যাওয়া হয়নি। ফিরে যাওয়ার সময় নগলির সঙ্গে দেখা করে গেলে কেমন হয়, ভাবল ধীর।

বহু বছর হল তার পাহাড়ে ঘুরতে আসা। নানান পরিস্থিতির মধ্যে তাকে পড়তে হয়েছে। কিন্তু দুর্ঘটনায় পড়া অভিযাত্রীদের সাহায্য করতে গিয়ে কখনও এমন দুঃসহ অবস্থায় পড়তে হয়নি। সোনাম চিকু মানুষটা ঠিক কী ধাতু দিয়ে গড়া বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল ধীরের। দু'দিনের জন্য পাহাড়ে এসে এসব ঘটলে মনটা ভারী হয়ে যায়। বোঝা বেড়ে যায়। অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা বোঝা হয়ে থাকে। এসব ভুলতে সময় লেগে যায় খুব। পাহাড়-হিমালয় এত

মনোরম ভূমি কিন্তু সেখানকার মানুষও শেষমেষ ধীরে ধীরে সমতলের ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে শুরু করেছে। পাহাড়ের ঢালের উপর সেই অবাধ মুক্ত বিচরণ দিগন্তের ওপার থেকে আর তেমন ঢেউ তোলে না। পড়ে থাকে ব্যথা — আনন্দ যৎসামান্যই। তাই সময় সময় তাকে ফিরে তাকাতে হয়।

"খবর তো পহ্‌লেই আ চুকা থা। বেকার আপ মুঝে ভেজা।"

দিরাং-এর বিরক্তিতে হঠাৎ ধীরের সম্বিৎ ফেরে। আগেই খবর পৌঁছে গিয়েছিল! ইরিকা বোধহয় খবর পাঠানো নিশ্চিত করতেই এটা করেছিলেন। স্থানীয় লোকের উপর তাঁর সম্ভবত তেমন ভরসা নেই।

পাহাড় থেকে ফিরে এসে ধীর সানজিদেবীর সঙ্গে দেখা না করায় তিনি দিরাং-কে ক্ষোভ জানিয়েছেন, জানাল দিরাং। মাতাজি নিজে তার সঙ্গে কথা বলেছেন — চাট্টিখানি কথা! খুব খুশি সে।

"তুমি মাতাজিকে কী উত্তর দিলে?"

"ম্যায়নে বোলা, সাবজি বহত থকা হুয়া থা। বাদ মে আপসে জরুর মিল লেঙ্গে।"

দিরাং-এর পিঠে সজোরে এক থাপ্পড় লাগায় ধীর। সাহেব খুব ক্ষুব্ধ ভেবে সে ফিরে তাকায়। পকেট থেকে দুটো একশ টাকাব নোট বের করে তার হাতে দেয়।

"এই না হলে দিরাং! এটা তোমার বকশিশ।"

মহা আনন্দে নোট দুটো পকেটে ভরে নিল দিরাং। আসলে ধীর এক ঢিলে অনেকগুলো পাখি মেরে নিল। একদিনের পারিশ্রমিকের সঙ্গে মাতাজিকে চমৎকার উত্তর দেওয়ার পুরস্কার ছাড়াও দিরাং-এর মধ্যে জমে থাকা ক্ষোভও কিছুটা কমিয়ে ফেলা গেল।

এর পর ধীর নগলির কাছে যাবে শুনলে দিরাং অসন্তুষ্ট হলেও তার ধার কম হবে। অর্থের মহিমা সত্যিই অপার!

রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পরই পড়ল নগলির ধাবায় যাওয়ার সরু পথ। ধীরকে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে দিরাং-ও থেমে যায়। তীব্র জিজ্ঞাসা তার দৃষ্টিতে।

"ক্যায়া আপ নগলিকি পাশ জায়েঙ্গে?"

"ভাবছি। এই যাব আর আসব। এক্ষুনি গিয়ে তুমি লালাজিকে উপরের ঘটনা পুরো জানিয়ে দিও।"

আপত্তি সত্ত্বেও মাচদার রাস্তা ধরল দিরাং। এক-পা দু-পা কবে ধীর নগলিব ধাবার

দিকে এগিয়ে গেল।

উপত্যকার মানুষজন নগলিকে এড়িয়ে চলে। আশ্রমের সঙ্গে অবশ্য তার ভাল সম্পর্ক। এ ছাড়া ধামি আজান নগলির একমাত্র গুণগ্রাহী। যারা উটকো মানুষ, সস্তায় দেশি দারু পান করতে চায়, তারাই মূলত নগলির ধাবায় আসে। চাসু উপত্যকায় নগলির মতো তেজি মেয়ে কেউ দেখেনি। অসম্ভব সাহসী ও ধূর্ত সে। প্রয়োজনে সে ব্যাপক লোভী ও দুর্নীতিপরায়ণও হতে পারে। এলাকার জাঁহাবাজ পুরুষদেরও সে কান কেটে দেওয়ার ক্ষমতা ধরে। চল্লিশ ছুঁইছুঁই বয়স হলেও তার শরীরী আকর্ষণ কম নয়। বিশ বছর বয়সে বিধবা হওয়ার পর নগলির জীবনে আর দ্বিতীয় পুরুষ আসেনি। একমাত্র ধামি আজান ছাড়া অন্য কেউ তার পাশে ঘন হয়ে বসার সাহস রাখে না। মাফিয়াদের ঢঙে কথা বলা তার স্বভাব। নিচু তলার লোকজনকে নিয়ে তার কারবার বলেই হয়তো তার মুখটা মৃদু অপরিষ্কার। কিন্তু ধীর তাকে অত্যন্ত পরিষ্কার মনের মানুষ বলেই জানে।

ধীরের সঙ্গে নগলির সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠার মূলে নাংগেল তাফা। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি ভারী অসুখে পড়েন। তখন তাঁর পাশে ধীর নগলি ছাড়া আর কাউকে দেখতে পায়নি। নিজে উপস্থিত না থাকলেও ঢালাও চিকিৎসা খরচের প্রায় সবটাই নগলি জুগিয়েছিল। পাহাড়ে অকৃতদার মানুষ খুব একটা দেখা যায় না। এদিক দিয়ে নাংগেলজি ব্যতিক্রমী মানুষ। কেন তিনি বিয়ে করেননি অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধীর এক অদ্ভুত ঘটনার কথা জানতে পারে। তখন থেকেই নগলি তার কাছে অত্যন্ত দামি মানুষ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায়।

নাংগেল তাফা বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। ব্যবস্থাদিও সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আসল বিয়েটাই হতে পারেনি। কারণ মাত্র পনেরো বছরের এক কিশোরী সেই বিয়েতে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ওই কিশোরীটির নাম নগলি দাকাত। চল্লিশ বছরের নাংগেল তাফা ছাড়া নগলি আর কাউকে বিয়ে করতে রাজি নয়। শুধু তাই-ই নয়, অন্য কারও সঙ্গে সে নাংগেলের বিয়েও হতে দেবে না। তেমন হলে সে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করার হুমকি দেয়। নাংগেল তাফা ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসেন। সেই যে তিনি বিয়ের পিঁড়ি ছেড়ে উঠে এলেন তার পর থেকে আর ওমুখো হননি। সাতের দশকের শুরুতে পাহাড়ি এলাকায় এমন ঘটনা সত্যিই অভাবনীয়।

চার বছর নাংগেলের জন্য অপেক্ষা করার পর নগলি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে। কিন্তু সেই বিয়েও টেকেনি। বছর ঘোরার আগেই নগলি বিধবা হয়ে পড়ে। উপর থেকে গড়িয়ে পড়া পাথরের আঘাতে তার স্বামী চাসু নালায় পড়ে হারিয়ে যায়। তার পর নগলিও আর বিয়ের কথা ভাবেনি। তবে চল্লিশ বছরের এক পুরুষের প্রতি পনেরো বছরের এক কিশোরীর ভয়ঙ্কর প্রেমকাহিনী ধীরকে মুগ্ধ করে।

বিশ বছরের তরুণী নগলির তার পরের সংগ্রামের সাক্ষী নাংগেলজি নিজে। পরোক্ষে ধামির মতো তিনিও একদা তাকে সেই সংগ্রামে কিছুটা সাহায্য করেছিলেন। ইচ্ছে করলেই তখন তিনি নগলির খুব কাছে চলে আসতে পারতেন। তিনি সে পথে যাননি। অনেকের বিশ্বাস সেই সময় ধামি নগলির দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল। তবে সেই সুযোগ ঠিক কী ধরনের সে সম্বন্ধে কারও সঠিক ধারণা নেই। দশ বছর আগে ঘটনাটা জানার সঙ্গে সঙ্গেই ধীর নগলির সঙ্গে দেখা করে। কেনির প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করেও সেই সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়ে সে অশেষ লাভবান হয়েছিল। প্রথম আলাপেই নগলি তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হয়ে গিয়েছিল। কথাবার্তায় কিছুটা রূঢ়, রেগে গেলে প্রচণ্ড খিস্তি দিয়ে কথা বলে নগলি এটা ঠিক। মেয়েদের মুখে এমন ভাষা খুবই পীড়াদায়ক সেটাও ঠিক। কিন্তু সব মিলিয়ে প্রথম দিন থেকেই তারা উভয়ে উভয়ের কাছে চলে এসেছিল।

নগলির বাঙালিবাবুর প্রতি প্রীতি জন্মাবার আর একটা কারণ হল, জীবনের প্রথম দশটা বছর সে হাওড়ায় কাটিয়েছিল। তার বাবা হাওড়ার কোনও এক কারখানায় মাঝারি মাপের মিস্ত্রি ছিলেন। ছোট বয়সের কথা বলেই সবটা তার পরিষ্কার মনে নেই। তবে কারখানার স্কুলে যে সে ধোপদুরস্ত ফ্রক পরে পড়তে যেত তা তার বেশ মনে পড়ে। পড়াশোনার চেয়েও দস্যিপনায় বেশি পটু ছিল সে। কিন্তু স্কুলের বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে বাংলা ভাষাটা ভাঙচুর করে এতদিন পরেও সে বলতে পারে। তাতে ব্যাকরণের কোনও সম্পর্ক থাকে না। কয়েকটা শব্দ হাওয়ায় ভাসতে থাকে কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না। দু'জনের বন্ধুত্বের মধ্যে কোনওভাবে না থেকেও প্রবলভাবে থাকেন নাংগেলজি। তাদের দু'জনের কাছেই তিনি অসামান্য মানুষ।

নগলির ধাবা দূর থেকে দেখলে ছোটখাটো আশ্রম বলে ভুল হয়ে যায়। এখানে ওখানে প্রচুর গাছপালা। নালার ধারে হওয়ার ফলে বেশ সরস জায়গা। দশটা চারা পুঁতলে পাঁচটা ঠিক মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যায়। ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে সরু রাস্তা। তিনদিক ঘেরা। অন্যদিকে চাসু নালার চঞ্চল উপস্থিতি। বাসগৃহ থেকে ধাবা এক মিনিটের পথদূরত্বে। চাসু নালার প্রায় জল ছুঁয়ে নগলির নিজের ঘর।

লম্বা উঠোনের লাগোয়া দারুচেম্বার। এক ধারে কাঠের র‍্যাকে মাটির কলসি বা সাদা জেরিকেনে দারু থাকে। সেখান থেকে গ্লাসে মেপে খদ্দেরকে দারু সরবরাহ করে দুটি মেয়ে। সঙ্গে বাহারি সুস্বাদু চাট - ভেড়ার চর্বি আর নাড়িভুঁড়ি দিয়ে এমন উপাদেয় চটপটি নাকি নগলির ধাবার স্পেশালিটি। কোনও ঝুটঝামেলা তার ধাবায় সাধারণত হয় না। হলে একা নগলিই কাফি। তবু দু'জন তরতাজা সুঠাম যুবক খোলা বারান্দায় মোতায়েন করা থাকে। আদেশ পেলেই তারা ঘাড় মটকে রেখে দিতে পারে। মাতাল মানুষ নিয়ে কারবার তাই ব্যবস্থা করে রাখতেই হয়।

দারুপানের জায়গার কাছেই রান্নাঘর। সস্তায় খাওয়ার ব্যবস্থা। ডাল-ভাত মিল সিস্টেমে পাওয়া যায়। সবজি বা মাংস খেতে হলে আলাদা দাম দিতে হয়। তবু খুব সস্তায় খেতে পারে সাধারণ কৃষি-মজুর ক্লাসের মানুষ। কেনির হোটেলে দশটাকায় যা পাওয়া যায় নগলি সেই খাবারই দেয় মাত্র ছ'টাকায়।

আপাং মনে করে নগলির রোজগারের সিংহভাগ জোগান দেয় আঠারো কিলোমিটার দূরের মিলিটারি ও আই.টি.বি.পি ক্যাম্পের জোয়ানরা। তার চাট ও দারু জোয়ানদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। অসম্ভব ঠাণ্ডায় নাকি শৌখিন দামি মদ কড়া দারুর মতো কাজ দেয় না। ক্যাম্প থেকে গাড়ি এসে দাঁড়ালেই মুহূর্তের মধ্যে বোঝাই হয়ে মাল চলে যায়। এমন রোজগারের রাস্তা সুগম করতে দু-চার পিস বড় অফিসারকে খুশিও করতে হয়। দু'মাস অন্তর এসে তাঁরা নগলির খাস কামরায় নাকি খানাপিনা করে যান। নগলির ফাঁদে পড়ে কোনও কোনও অফিসার নাকি ধাবায় রাত কাবার করে ফেরেন। তারপর নগলির কোঁচড়ে নাকি শুধু টাকা আর টাকা।

নগলির বাসগৃহে তার পছন্দের মানুষ ছাড়া কারও প্রবেশাধিকার নেই। ধীর অবশ্য সেখানে গিয়ে নগলির সঙ্গে বেশ কয়েকবার গল্প করে সময় কাটিয়েছে। কোনও সমস্যায় পড়লেই ধীর নগলির কাছে গিয়ে হাজিব হয়। এটা ওটা কথার মাঝে চাসু উপত্যকায় কোথায় কী ঘটছে তা সে জেনে নিতে পারে। সোনাম চিকু ঠিক কতটা বিপজ্জনক সম্ভব হলে নগলির কাছে সে সেটাও জেনে নিতে পারে। সোনাম একরোখা, হামবড়া হয়ে থাকতে চায়, জানে ধীর। দুর্বল মানুষকে চমকে রাখতে চায়। কিন্তু তাকে কখনই ধীরের বিপজ্জনক বলে মনে হয়নি। যারা সর্বদাই চাপে থাকে তাবা প্রায়ই এমন ধরনের হয়। তবু সোনামকে আর এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। ঝামেলার মানুষকে ঝামেলা দিয়েই জবাব দিতে হয়। কিন্তু সোনাম কি আর তার আগেকার মেজাজে ফিরে যেতে পারবে?

বেলা বারোটায় ধাবার সরু পথ ধরে এগোতে গিয়ে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করল ধীর। বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছাড়াও বাথরুমের জন্য পৃথক জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বেসিনে নলের জল, সঙ্গে একটু অপরিষ্কার হলেও তোয়ালে রাখা। পাথর ঘিরে জলধারা এনে ফোয়ারা বানানোর ব্যর্থ চেষ্টাও তার নজর এড়াল না। আর দু'এক বছরের মধ্যে নগলি তার ধাবাকে থ্রি-স্টার হোটেল বানিয়ে ফেললেও অবাক হওয়ার কিছু নেই, ভাবল ধীর। এরই মধ্যে খাওয়ার ধাবায় লোকজনের এত ভিড় দেখে অবাক হল ধীর। নগলির ধাবা বলতে আগে মূলত তার পানশালাকেই বোঝাত। সেখানে মানুষজনের আনাগোনা শুরু হত শেষ বিকেল থেকে। নগলির খাওয়ার ধাবাও যে ইদানীং ভাল ব্যবসা দেয় সেটা জানত না ধীর। এ সময় নগলির ব্যস্ত থাকার কথা। ফিরে যাওয়াই উচিত কি না একবার ভাবতেই হল তাকে।

— বাঙালিবাবুর নগলিকো ইতনা দেরিতে ইয়াদ পড়ল।

হকচকিয়ে গেল ধীর। ঝোপের বুকচিরে হঠাৎ নগলির প্রবেশ। বাংলায় টান পড়লে

হিন্দিতে চলে যাওয়ার অভ্যাসটা দিব্যি আছে নগলির। হিন্দিও তার মাতৃভাষা নয়। সব মিলিয়ে চলে যায়। একটু মুটিয়ে গেলেও দারুণ সুদর্শনা মনে হল তাকে। কথাটা না বলে পারল না।

— দারুণ সুন্দরী হয়েছ নগলি। না এলে খুব মিস করতাম।

পাশে এত লোকজন। জাঁদরেল বস্ হলেও লজ্জাটা একটু বেশিই পেল। আসলে তাকে এমন কথা বলার লোক আছে কিনা সন্দেহ।

— খুবসুরত হলে কি ইতনা টাইম লিতে। ঘরকে চলো।

ধীর নগলির পিছনে হাঁটতে থাকে। বেশ কিছুটা এগিয়ে সোজা গেলেই তার ঘর। ঢুকেই চমকে গেল সে। দু'বছর আগে কী ঘর দেখেছিল আর চোখের সামনে কী দেখছে মেপে দেখল ধীর।

— আমার জন্য তোমাকে ধাবা থেকে উঠে আসতে হল।

— আমি কুছু দেখে না বাঙালিবাবু। কাজের আদমি দেখে। সাথমে উপ্পরবালা আছে।

— এত সাজিয়েছ। কেউ আসছে নাকি আজকাল?

কথায় নগলি অসম্ভব চটপটে। মোক্ষম জবাব দিতেও ওস্তাদ।

— আমি জানে তুমি আসবে। ইস লিয়ে কামরা সাফ সুতরা করলে।

হো হো করে হেসে উঠল ধীর আর নগলি খিলখিলিয়ে।

আগের চেয়ে ঘরের ভিতরে গোছগাছের চিহ্ন অনেক বেশি। তবে ওই ঘরে যে মাত্র একজন থাকে সেটা বোঝা যায়। এবং তিনি যে মহিলা সেটাও চোখ ঘোরালেই টের পাওয়া যায়। কাঠের হেলান দেওয়া লম্বা চেয়ারে কুশন পাতা। আরাম করে অনায়াসে তিনজন বসতে পারে। ছোট্ট একটা টেবিল ঘরের এক কোণায়। চেয়ারটা সরিয়ে জানলার কাছে রাখা। জানলার বাইরে চোখ রাখলে চাসু নালার উচ্ছল জলধারায় চোখ আটকে যায়। বেশ বড় খাট অথচ মাথার দিকে মাত্র একটা বালিশ। নাংগেলজি রাজি হলে অনায়াসে আরও একটা পাশাপাশি শোভা পেত।

এই একটা ব্যাপারে সে নাংগেলজিকে সমর্থন করতে পারেনি। এমন নিঃশর্ত প্রেম কেউ উপেক্ষা করে! তাঁর এক কথা : 'পঁচিশ বছরের ফারাক — সে তো মেয়ের বয়েসী। না না, তাকে বিয়ে করা যায় না।' প্রেম যে কখনও বয়স মেপে হয় না সেটা তিনি বুঝলেন না। এখনও চল্লিশ বছরের এক সফল চনমনে যুবতী পঁয়ষট্টি বছরের এক সৃষ্টিছাড়া বৃদ্ধের জন্য

আকুল। ভাবা যায়!

— তুমার গুরুজির কী হাল, খবর লিয়েছ?

চমকে ওঠে ধীর। টেলিপ্যাথি নাকি!

— তাঁর কথাই ভাবছিলাম। তোমাকে বিয়ে করলে কী সুখেই না থাকতে পারতেন।

— তুমার খালি আনসান বাত। গুরুজিকো পাস যাও। বহত দবদে আছ।

— তুমিও তো বহত দরদে আছ।

— ফিন আনসান বাত।

নগলির মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল বলার জন্যই বলা। এটা তার মনের কথা নয়। এমন কথা শুনলে এখনও তার শরীরে এক অবোধ আবেশ চুপিসাড়ে জায়গা করে নেয়। মেজাজি ও কটুক্তিতে পারদর্শী মেয়েটি হঠাৎ সোহাগী অনুরাগে শান্ত হয়ে পড়ে। ঠুকে দিল ধীর।

— আনসান বাত হবে কেন নগলি? নাংগেল তাফার জন্য চার বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকলে। সে এল না। নিজেকে শাস্তি দিতে রাগের মাথায় বিয়ে করলে। বিধবা হলে। তবু তো তোমার অপেক্ষা যায়নি।

নগলি উঠে চলে গেল। দশ মিনিট পর সুন্দর থালায় ভাত ডাল সবজি ও মাংস সাজিয়ে ঘরে ঢুকল।

— পহেলে খানা খাও, বাদমে বাত বানাও।

হাসল নগলি। খিনখিন আওয়াজ তাতে। খিলখিল স্ফূর্তির অনুরাগী উতরোল সেখানে আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত।

— খানা তো খাবই। জোর খিদেও পেয়েছে কিন্তু সত্যি করে বলতো, তুমি কি গুরুজিকে জোর করে এখানে এনে রাখতে পারতে না?

— ও বাত রাখো। তুমি দুসরা কুছ বোলো।

বলার ধরনে বুঝল ধীর নগলিও তার অবস্থান থেকে অনেকটা সরে এসেছে। প্রেম যত গভীরই হোক তাকেও পরিচর্যা করার প্রয়োজন হয়। একজন অবুঝ মানুষকে নিয়ে বেশি দিন ধরে স্বপ্ন দেখা যায় না। তা ছাড়া, নিজেকে ভাসিয়ে রাখার সংগ্রামে নগলিকে এত বেশি লড়াই করতে হয় যে, প্রেমের ধার ধীরে ধীরে তীক্ষ্নতা হারাতে থাকে। তারপরও থাকে বয়স।

সেটা কখনও কমে না। যা হওয়ার নয় এই বাড়ন্ত বয়সে বোধহয় আর সে আক্ষেপ করতে প্রস্তুত নয়।

যতক্ষণ খাচ্ছিল ধীর ততক্ষণই তার পাশে বসে, যেন নিজের কেউ, নজর রাখছিল নগলি। তবে কোনও কথা বলেনি। খাওয়া শেষ করে বাইরে হাত ধুতে যাওয়ার মুখে তাকে ইশারায় তার কাছে আসতে বলল নগলি। ধীর ভেবেছিল ছোট্ট দরজা চাসু নালায় যাওয়ার জন্য বানানো। গিয়ে দেখল বাথরুম। সম্পূর্ণ ব্যবস্থা সেখানে। আলোর ঝকঝকে আভা টাইলস থেকে ঠিকরে ওঠে। বাথরুমের অন্য দরজা দিয়ে পাশের ঘরে যাওয়া যায়। অর্থাৎ দুটো ঘরের সঙ্গেই সংযুক্ত। মানতেই হয় এবার নিজের হিসাবে সুন্দর করে বাকি জীবনটা কাটাতে চায় নগলি। কোনও কিছুরই তার অভাব নেই। শুধু একজন পুরুষমানুষ থাকলে দিব্যি জমে যেত। ধীরের মনে হল, নাংগেল তাফা-র পর তেমন মানুষ বোধহয় চাসু উপত্যকায় জন্মায়নি।

আলো নিভিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার সময় ধীরকে আগে রেখে পিছনে থাকল নগলি। ঘুরে গিয়ে ধীর নগলিকে কী যেন বলতে চাইল! এত কাছে দাঁড়িয়েছিল সে যে ধীরের কনুই তার বুক স্পর্শ করে গেল। অস্বস্তিতে পড়ে গেল ধীর। অসাবধানে ঘটে গেলেও তার কুণ্ঠা গেল না। সেটা আড়াল করতে গিয়ে একটা মজা করতে চাইল সে। বিছানায় দু'জন পাশাপাশি এসে বসল। নগলির মুখ দেখে অবশ্য কিছুই বোঝার উপায় ছিল না। ধীরের সাহস বেড়ে গেল।

— তোমার সবই আছে নগলি কিন্তু পাশে দাঁড়াবার মতো একজন পুরুষমানুষ নেই।

— আমি একলা আছে। বিলকুল ঠিক আছে।

— না, নেই। এখনও সময় আছে। ভাললোক দেখে এবার শাদিটা করে ফেল।

বোধহয় কথাটা মনে ধরল। হাসতেই নাকছাবিটা চিকচিক করে উঠল। চিবুকের তলায় ঈষৎ ফোলা অংশটা অকারণে হালকা কেঁপে উঠলে নগলিকে অপরূপ লাগে। তখন ঝুপ্ করে তার বয়স কমে যায়।

— কাঁহা আচ্ছা আদমি বাঙালিবাবু? তুমার পাশ আছে?

ধামি আজান বিবাহিত ছিল কিন্তু তার স্ত্রী গত হয়েছেন। তাই বলে তার মেয়েছেলে পেতে কোনও অসুবিধে হয় না। পঞ্চাশের উপর বয়স হলেও যথেষ্ট শক্তপোক্ত চেহারা। একটু বাজিয়ে দেখতে চাইল ধীর।

— কেন, ধামিজি।

— কৌন!

— তোমার দোস্ত ধামিজি। শুনেছি উনি তোমাকে খুব ভালবাসেন।

ধীরের সামান্য কথায় নগলি রেগে আগুন। বুঝল হিসাবে ভুল করে ফেলেছে সে।

— ধামি! মেরি দোস্ত! দো দিন পহেলে শালেকো আমি লাথ্ মারলাম। জানে তুমি?

চাসু উপত্যকায় লাথ্ মারার অর্থ যাচ্ছেতাই ভাবে তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু এমন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও শুভানুধ্যায়ীর সঙ্গে এ হেন ব্যবহারের কারণ।

— এই তোমার দোষ। ভাল কথা বলে যেটা করা যায় তার জন্য তুমি মুখখিস্তি করে ফেল। মিষ্টি কথা বললে মানুষের মান বাড়ে। কেন তুমি এমন কর, বলতে পার?

এতগুলো কথা বাধ্য মেয়ের মতো শুনবে নগলি ভাবেনি ধীর। কিন্তু শুনল। তার মুখে অল্প হাসির রেখা ফুটে উঠে ফের মিলিয়ে গেল।

— মিঠা বাত মিঠা আদমিকা লিয়ে চ্যালাজি। ধামি সচমুচ হারামখোর আছে। উসকা দিমাগ অলগ আছে। ফালতু আদমি শালা!

একদা ধীরকে নগলি "চ্যালাজি" বলে খ্যাপাতে চাইত। নাংগেলজি তার গুরু এটা সর্বদাই বলত সে। এখনও বলে। কালক্রমে ওই শব্দটাই সম্ভ্রমসম্ভাষণ হয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ শব্দটা শুনে মনে হল তার, সে নগলির কাছে আগের মতোই কাছের মানুষ।

— এত রাগ কেন তোমার ধামি আজান-এব উপর?

— ধামি তুমাকে গন্দা আদমি বোলে, জান তুমি? তুমার নাকি অলগ ধান্দা আছে।

ধামিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ধীর পশ্চিমবঙ্গের যে জেলার মানুষ সেখানেরই এক জায়গায় পাখির ছবি তুলতে গিয়ে সে প্রায় খুন হয় আর কী! তার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। সবার ধারণা তার অন্য কোনও ধান্দা আছে। হঠাৎ একজন বয়স্ক মানুষ মাঝখানে এসে না পড়লে তাকে বেঁচে ফিরতে হত না সেদিন। তবু শক্ খেল ধীর। খুব বেশি আলাপ না থাকলেও ধামিজির সঙ্গে তার সম্পর্ক যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ বলেই এতদিন ভাবত সে। এমন তো হওয়ার কথা নয়। আপাতত নগলিকে সে শান্ত করতে চাইল।

— তবু বলব আমাকে নিয়ে ধামির সঙ্গে বিবাদে গিয়ে তুমি ঠিক করনি। আমি বাইরের মানুষ, দু'দিনের জন্য আসি। ধামির মতো এলাকার শেঠ মানুষকে চটালে তোমার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

জবাব যেন নগলির ঠোঁটের গোড়ায় তৈরি হয়েই ছিল।

— নাংগেল তুমার গুরুজি। ইসকা মতলব তুমি আমার আপনা আদমি আছে। দো

পয়সা কা ঠিকেদার শালে — ও মেরা ক্যায়া বিগড় স্যাকতা?

এত সুন্দর মানুষ অথচ রেগে গেলে ভাষা কী বিচ্ছিরিই না হয়ে যায় নগলির। সময় সময় ধীরের মনে হয়, তাকে শান্ত করতে পারে এমন মানুষই জন্মায়নি।

— আচ্ছা নগলি, ধামি এমন ভাবল কেন বলতো? আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক তো খুব ভাল।

তার প্রশ্নটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল নগলি। সম্ভবত কোনও কারণ খুঁজে পেল না।

— আমি ঠিক জানে না। মগর বড়ি তাজ্জব বাত আছে।

এবার সোনামের ব্যাপারে জানতে চাইলে কেমন হয়? ধীর শুনেছে সোনামের সঙ্গে নগলির একটা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও আছে। মিসফায়ার হয়ে যেতে পারে। তবু একটা চান্স নিল ধীর।

— সোনাম চিকুর সঙ্গে আলাপ হল। শুনলাম ভাল গাইড। তুমি ওর সম্বন্ধে কিছু জান?

যেন শুনতেই পায়নি ধীরের কথা। চুপ করে থাকল নগলি। তা হলে কি এড়িয়ে যেতে চায়? কিন্তু ধীরের যে উত্তর চাই। ফের জানতে চাইল।

— সোনাম সম্পর্কে জানতে চাইছি তোমার কাছে। ওকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে যেতে চাই।

তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল নগলি। মনে হল একই কথা দু'বার জানতে চাওয়ায় ওই প্রথম সে ধীরের উপর কিছুটা বিরক্ত।

— সোনাম তুমার গুরুজিকা চ্যালা আছে। আমি ইতনা জানে।

সোনাম নাংগেলজির ভাবশিষ্য কখনও হতে পারে না। হয়তো প্রথম প্রথম তাঁর সঙ্গে পাহাড়ে যেতটেত। সে জন্যই তাকে তাঁর চ্যালা বলে ভাবে নগলি। তার বেশি সে সোনাম সম্পর্কে জানে না এটা ধীরের বিশ্বাস হল না। সুতরাং সোনাম কুয়াশায় ঘেরা হয়েই থেকে গেল। হঠাৎ তার চুপ করে যাওয়ায় নগলি বোধহয় কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল। বাঙালিবাবুকে সে সোনাম সম্পর্কে ছোট্ট একটা খবর দিতে চাইল। নিজের অস্বস্তি কাটাতে না তাকে সতর্ক করে দিতে সেটা ধীর অবশ্য বুঝতে পারল না।

— মাতাজিকি আপনা আদমি আছে সোনাম। উস্‌সে দূর রহো।

অবাক হয়ে গেল ধীর। সোনাম যদি মাতাজির নিজের লোক হয় তা হলে তার কাছ

থেকে ধীরকে দূরে থাকতে হবে কেন! মাতাজি তো তাকেও বন্ধু হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অবশ্য ওই ঘটনা নগলির জানার কথা নয়। পাঁচ-সাতটা শব্দ তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নগলি তাকে গোলকধাঁধায় ঢুকিয়ে দিল।

— মাতাজির নিজের লোক তো আমারও বন্ধু মানুষ। তার কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে কেন? বলবে তুমি?

— অওর এক বাত বলবে তুমার শির ফুটাবে আমি।

নগলি যখন তার মাথাই ভেঙে ফেলতে চায় তখন মানে মানে উঠে পড়াই ভাল। ধীর উঠে পড়তেই নগলি তার হাতটা খপ্ করে ধরে ফেলে।

— তুমি ইধার ঠেরবে। তুমার সঙ্গ থোড়া বাত করবে আমি।

কী এমন কথা বলতে চায় নগলি যে তার আরও থাকা দরকার। কথাটা তো বলে ফেললেই পারে। দিরাং-কে সে বলেছিল যাবে আর আসবে। ধাবায় তার প্রায় তিন ঘন্টা হতে চলল। এবার তাকে উঠতেই হয়।

— আজ থাক নগলি পরে না হয় একদিন আসব।

নগলি না-ছোড়বান্দা। গুছিয়ে জবাব দিল সে।

— চ্যালাজি আমি তুমাকে রুকতে বলছে, তুমি রুকবে। বোলো তো শির লাগাবে তুমার পাঁয়ে।

এমন কথা নগলি তাকে বলতে পারে ধীরের ধারণাই ছিল না। তার থাকা না-থাকা নিয়ে হঠাৎ এতটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারে ভাবেনি ধীর। কিছুটা সময় থাকার জন্য ধীরের পায়ে তাকে মাথা ঠেকাতেই বা হবে কেন!

— ছি-ছি নগলি, এমন কথা তুমি বলতে পারলে!

— তুমি থাকবে, আমি কুছু বলবে না।

অগত্যা থেকে যেতে হল ধীরকে। সন্ধের সময় ফিরে গেলেই চলবে তার। জ্যাকেট আর সোয়েটার খুলে বিছানায় রাখতেই নগলি সেগুলো তুলে তার আলনায় রেখে দিল। তারপর 'মুলকি' 'মুলকি' বলে চিৎকার করে উঠল সে। মুহূর্তের মধ্যে একটি মেয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। মধ্যবয়েসী মুলকিকে দেখলেই মনে হয় সে যেন হুকুম তামিল করার জন্যই জন্মেছে। নিজেদের ভাষায় ফুটুং-ফাটাং কথা সেরে নিল নগলি। মেয়েটি বাথরুমের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

— মুলকি তুমার বিস্তারা লাগাবে। আভি ধাবা যাবে আমি। চার বাজে আসবে।

মেমসাহেব তাঁর বাটলারকে নির্দেশ দিয়ে বাথরুমে গেলেন। আসলে এটাই নগলির স্টাইল। বলতে না বলতেই পাট্রু আর ব্লাউস ছেড়ে ঢোলা সালোয়ার-কামিজ পরে বেরিয়ে এল নগলি। কেমন যেন বয়স্কা মহিলা বলে মনে হল তাকে। পোশাকের আশ্চর্য মহিমা। চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে খোঁপা বেঁধে দু'পাশে ক্লিপ লাগিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এলাকার মেয়েরা কেউ এমন খোঁপা করে চুল বাঁধে না। এসবই নগলি ম্যাডামের স্পেশাল স্টাইল। গোল মুখে খোঁপা চমৎকার মানিয়ে গেলেও বয়সটা তার হঠাৎ বেড়ে গেল। ধাবায় বসার সময় বোধহয় তাকে মাসি হতে হয়।

দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত না হলেও চায়ের কাপ রাখার শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। তাও মোটামুটি দেড় ঘন্টা তার সাড় ছিল না। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল স্লিপিং ব্যাগের পরিবর্তে তার গায়ে দামি কম্বল। উঠে বাথরুমের দরজার কাছে যেতেই দরজা খুলে নগলি বেরিয়ে এল। ফের তার শরীরে পাট্রু আর ব্লাউস। ঘড়িতে সাড়ে চারটে । এসময় তো ধাবায় এন্তার ভিড়। মালকিনের তো এখন মাতাল সামলাবার কথা।

— তুমি! এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে!

পরিষ্কার জবাব পাওয়া গেল। মজা করে বললেও ব্যথার গন্ধ সে জবাবে।

— ঘরমে আদমি আছে। আওরত ঠিক টাইমে ঘরে লোটবে।

হিন্দিতে 'আদমি' মানে যেমন লোক তেমনি স্বামীও হয়। আবার 'আওরাত' মানে যেমন মেয়ে তেমনি স্ত্রী-ও হতে পারে। নগলির কথাটার তাই অন্য অর্থও হতে পারে। অর্থাৎ ঘরে স্বামী থাকলে স্ত্রীকে ঠিক সময় ঘরে ফিরতে (লোটতে) হয়। এ সব কথা নগলির কাছে জলভাত। তবে মানুষ বুঝে এসব কথা বলে সে। শহরে-বন্দরে নগলির মতো মেয়ে অনায়াসে দারুণ স্মার্ট বলে গণ্য হতে পারত। তার কাছে লিবার্টি নিতে হলে তার পছন্দের মানুষ হতে হয়। এই সূক্ষ্ম বোধ তার মধ্যে কাজ করার কথা নয়, কিন্তু করে।

খেয়াল করতেই দেখল দু'কাপ চা বিছানার পাশে একটা টি-টেবিলে রাখা।

— থোড়া টাইম মিলা। দোনো মিলকে চা খাবে।

— তা তো খাবে কিন্তু আমাকে কি আজ রাতেও এখানে থাকতে হবে?

— জি হ্যাঁ, হোবে। সরম হবে খুব — না, চ্যালাজি?

— সরমের কী আছে। তুমি আমার দোস্ত। দোস্তের কাছে রাত কাটাতে লজ্জা হবে কেন?

— সাচ বাত বলছে তুমি?

—সাচ বাত নগলি, বিলকুল সাচ বাত।

চা খেয়েই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল সে। তবে যাওয়ার আগে মুচকি হেসে গেল। ওই হাসির প্রচুর অর্থ হয়। চাসু উপত্যকায় নগলির সঙ্গে ভদ্রলোকের কোনও সংযোগ থাকে না। তার তেমন প্রয়োজনও হয় না। ভদ্রলোকেদের পরিভাষায় যারা ছোটলোক তাদের নিয়েই নগলির কারবার। ধীরের মতো মানুষ সেই মেয়েকে নিজের বান্ধবী বলে স্বীকৃতি দিলে তাকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় পাক খেতে হয়। মুচকি হাসি সম্ভবত সেই পাক খাওয়ারই শরীরীভাষা।

সন্ধে নামলেই নগলির ধাবা হঠাৎ কোনও দূরবর্তী স্থান বলে মনে হয়। সাড়ে আটটায় ধাবা বন্ধ হলেই চতুর্দিক থেকে অন্ধকার যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সারাদিনের চঞ্চল কলরব থেমে গেলে জায়গাটাকে আর কিছুতেই চেনা যায় না। দ্বিতীয় ঘরটা থেকে চাসু নালা দেখা যায় না। কেবল বাথরুমে ঢুকলেই সেটা সম্ভব। ব্যাপাবটা তার মোটেই পছন্দ নয় কিন্তু বলতে পারা যায় না। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থেকে চাসু নালার হালকা আর্তনাদ শুনতে থাকল ধীর।

মিনিট পনেরো পর ছিটকিনি খুলে তার ঘরে এল নগলি। সেই বয়স্কা মহিলা যেন সবে বিউটি পারলার ঘুরে এলেন। ফিনফিনে নাইটির কী বাহার!

— চ্যালাজি, তুমার অলগ বিস্তারা খালি বাহানা। ইধার আও, খানা খাবে।

নগলির মতো 'একাই কাফি' মেয়েকেও তা হলে ছলনার (বাহানা) আশ্রয় নিতে হয়! মুলকির চোখকে আড়াল করতেই তা হলে আলাদা বিস্তারার নাটক। আসলে মেয়ে হয়ে জন্মালে অপ্রয়োজনেও তাকে অনেক কিছু আড়াল করতে হয়। এমনকী নগলিকেও।

নগলির খাস কামরায় ঢুকেই সে জানলার ধারে এসে চাসু নালার দিকে তাকিয়ে থাকল। ঘোর অন্ধকারে বহতা জলধারার শব্দ শোনে সে। ঘরের আলো দশ-বারো ফুট যাওয়ার পরই হারিয়ে যায়। খাবার টেবিল দু'জনে ধরে জানলার কাছে নিয়ে গেল। নগলি বুঝতে পেরেছিল তার পছন্দের কথা। গরম গরম রুটি সঙ্গে সবজি, ডাল এবং দই। খাওয়া দাওয়ার পর মুলকির ছুটি। দরজা বন্ধ হয়ে গেলে নগলির দু'কামরার বাসগৃহ পৃথিবীর বাইরে চলে যায়। সেখানকার দিশা পায় না কেউ। নগলির ছোট্ট সাম্রাজ্যে সে চেষ্টা কেউ করেও না। মালকিনের খাস তালুকে কে এল-গেল সে খবর অন্য কেউ জানতে পারে না। সারা এলাকা পাহারা দেয় এক দঙ্গল পাহাড়ি কুকুর। বাড়তি সতর্কতায় থাকে দুজন দুর্ধর্ষ পালোয়ান যুবক।

নগলির শরীর থেকে পশমের চাদর অস্থিরতার ঘোরে থেকে থেকে সরে যায় আর

তার রাংতায় মোড়া দক্ষিণী নায়িকাদের মতো চেহারা দৃশ্যমান হয়। ধীর তার পাশে কোনও পুরুষই নয়। সম্ভোগ বাসনায় যোগ্য সঙ্গত করার মতো মানুষ সে কোনওদিনই ছিল না। তবে সেদিন পোশাকের শৌখিন আড়ালে নগলির মুখে কোনও কামনার ভাষা ছিল না। ছিল ঘোর অস্থিরতা, কোনও কিছুর অনিবার্য বিপাকে পড়ার সুপ্ত যন্ত্রণা। তার মনে হল টুকরো টুকরো শরীরী ব্যাঞ্জনার আধারে কোনও গূঢ় কারণ নিহিত। এমন কিছু সে ধীরকে বলতে চায় যা খুব সহজ কথা নয়।

তখনও কম্বলের মধ্যে নগলি স্থির। গভীর অন্ধকারে চাসু নালার কিছু দূরে মাথা তুলে দাঁড়ানো ছোটা মাতরা রিজের অবস্থান মেপে নিতে চাইল ধীর।

— তুম পাশ আও বাঙালিবাবু। আভি বাত করবে।

ঠিক এরই অপেক্ষায় ছিল ধীর। কী এমন কথা যা শোনাতে তাকে এত তোয়াজ করতে বাধ্য হয় নগলি দাকাত? ধীর জানলা ছেড়ে বিছানায় বসতেই জানলা বন্ধ হয়ে গেল। অর্থাৎ দেওয়ালের বাইরে কথা যাওয়ার সম্ভাবনা নির্মূল করা হল।

নগলি তার কথা শুরু করল। শুনতে শুনতে ধীরের মনে হল, কীভাবে কথাগুলো বলবে সম্ভবত তা সে অবিরত অনুশীলন করে গেছে। ওই দিনের জন্য সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে ছিল। জমা কথা বলতে পেরে তার শরীর হালকা হয়ে গেল। কিন্তু ধীরের মনে জমা হল এক দুর্বিষহ ভার। ঘটনার বিস্তাব অসম্ভব জটিল হলেও বিশ্বাস করতে হল তাকে।

সময়টা নগলির স্বামী বিয়োগের পরবর্তী সংগ্রামকাল। নাংগেল তাফা তখন বছরের আট মাসই পাহাড়ে কাটান। কখনও নিজের গ্রুপ নিয়ে কখনও বা ধীরের মতো ছোট পার্টির সঙ্গে। পনেরো-বিশ ঘরের গ্রাম লুনি-র বেশির ভাগই দিনমজুর। একমাত্র নাংগেল পেশায় মাউন্টেন গাইড। মূলত তার জন্যই লুনি বাইরের মানুষজনের কাছে পরিচিতি পায়। তাঁর দু'কামরার ঘরে তখন নামী মানুষের নিত্য আনাগোনা। একা মানুষ বলেই পাশের ঘরের একটি মেয়েকে দিয়ে তিনি টুকটাক কাজ করিয়ে নিতেন। ওই বিবাহিতা মেয়েটির স্বামী রাস্তা মেরামতির কাজে প্রায়ই বাইরে চলে যেত। তখন তার খাওয়ার পয়সা জুটত না। ফলে একদা মেয়েটির সব ভারই নাংগেলজিকে নিতে হয়। বিনিময়ে তিনি বাইরে গেলে তাঁর ঘর দেখাশোনার দায়িত্বও পড়ত মেয়েটির উপর।

ধীরে ধীরে নাংগেল তাফা-র ছোট্ট সংসারে মেয়েটির কর্তৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যেতে থাকে। ওই সময় কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে তার সঙ্গে নাংগেলজির শরীরী সম্পর্ক ঘটে যায়। এর ফলে মেয়েটি সন্তান-সম্ভবা হয়ে পড়ে। আশ্রয়চ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় মেয়েটি ওই ঘটনা কাউকে বলেনি। একটি কন্যাসন্তান প্রসব করার কয়েক বছর পর মেয়েটি জানতে পারে, তার সন্তান স্বাভাবিক নয়। একে কুৎসিত তায় সে বোবা। ওই বাচ্চা মেয়ের কপালে

জোটে সর্বদা তিরস্কার। দুরন্ত স্বভাবের বাচ্চা মেয়েটিকে প্রায়ই তার পিতার মারধোর খেতে হত। ওই সময় দয়াপরবশ হয়ে নাংগেলজি কন্যাটির মায়ের পাশে দাঁড়ান। সেভাবেই কন্যাটি বড় হতে থাকে।

আশ্চর্যভাবে, কৈশোর অবস্থাতেই বাচ্চা মেয়েটি শারীরিক ভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ওই বয়সের ছেলেরাও শক্তিতে তার সঙ্গে পেরে উঠত না। হঠাৎ ওই কিশোরী এক মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে। একদিন সে তার পিতাকে পাহাড়ের ঢালে ঠেলে ফেলে দেয়। এর ফলে কিশোরীর পিতা প্রাণ হারায়। তারপর থেকেই কিশোরী মেয়েটি সবার কাছে ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ওই সময় কয়েক বছরের জন্য হঠাৎ মা-মেয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। শেষমেষ নগলি ব্যাপারটা জানতে পারে। কিশোরী মেয়েটি যে নাংগেল তাফা-র ঔরসজাত সেটাই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

নগলির বিশেষ অনুরোধে মাতাজি মেয়েটিকে আশ্রমে স্থান দেন। বয়সের হিসাবে যুবতী না হলেও তার শরীরে যৌবনের জোয়ার। কিন্তু মাস ঘুরতে না ঘুরতেই মাতাজি নগলিকে না জানিয়েই মেয়েটিকে আশ্রমের বাইরে পাঠিয়ে দেন। সে নাকি অশুভ শক্তির প্রতীক। আশ্রম পরিবেশে থাকার যোগ্যা নয়। খবরটা জানাজানি হলে মেয়েটি জনরোষে পড়তে পারে। সেই তাণ্ডবে তার জীবনহানিও ঘটতে পারে। এমন মেয়ের মৃত্যু হলে কেউ চোখ তুলেও তাকাবে না। ধীর কি মেয়েটিকে নীচে নিয়ে গিয়ে কোনও আশ্রমে রাখার ব্যবস্থা করে দিতে পারে? এ বাবদ যা টাকা পয়সা লাগবে নগলি তা জোগাতে প্রস্তুত। তেমন হলে কালই নগলি নীচে নেমে যেতে পারে।

মেয়েটির মা হল মুলকি এবং মেয়েটি তার সদ্য পরিচিতা দিশ।

কোনও কথা বলতে পারে না নগলির বাঙালিবাবু। সহসা একটা উপত্যকার ছোট্ট পরিসর থেকে বেরিয়ে এসে সে হিমালয়ের বিভিন্ন প্রান্তে তাকিয়ে দেখল। অসংখ্য বাঙালি অভিযাত্রী শৃঙ্গ থেকে শৃঙ্গে, গিরিবর্ত থেকে গিরিবর্তে মরিয়া অভিযান করে চলেছেন এমন দৃশ্য তার মানসপটে ভেসে উঠল। আর সে কিনা পাহাড়ের ঢাল ছেড়ে নরম বিছানায় করুণ কাহিনীর ঢালে দাঁড়িয়ে হতবাক হতে চায়! নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে সে দেখে অঝোর আকুতি ও কান্নায় এক মহিলা তার পদলুণ্ঠিতা। এমন তো হওয়ার কথা নয়! তার রাগ হল খুব।

— তোমার কী হয়েছে যে এমন হাউমাউ করছ? অন্যের পাপ তোমাকে বয়ে বেড়াতে হবে কেন? দিশতো তোমার কেউ নয়। তার জন্য তোমার আকুল হওয়ার কী আছে, বলতে পার আমাকে?

ধীর নিজের কণ্ঠস্বর চিনতে পারল না। খুব রূঢ় ও কর্কশ মনে হল তার। তবে কাজ

হল। নগলির কান্না থেমে গেল। কোমরভাঙা মহিলা আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বিছানায় গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর নগলির ঠোঁট আপনা থেকেই নড়ে উঠল।

— তুমার গুরুজিকি বেটিকি মৌত আমি দেখতে পায়। তুমি পায় না?

ধীরের রাগ আরও বেড়ে গেল।

— না, আমি পাই না। যে লোকটা তোমাকে সারাজীবন দুঃখ দিয়ে গেল তার হঠাৎ স্ফূর্তির খেসারত তুমি দিতে যাবে কেন? নাংগেলও আর একটা ধামি। তাকেও তোমার লাথ্ মারা উচিত।

তার কথা শেষ হতেই নগলি ধীরের শরীর জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। আর অস্ফুটস্বরে বলে উঠল — অ্যায়সা বাত বোলবে না তুমি। কভি বোলবে না।

ধীর চেয়েছিল খোঁচা মেরে নগলিকে চাগিয়ে তুলতে। তার অনর্থক দুর্বলতা যে কতটা অবাস্তব তা বুঝতে তাকে সাহায্য করা। কিন্তু ফল হল উলটো। ধীরের মতো মানুষরা হঠাৎ করে বেশ আকাট হতে পারে। নাংগেল তাফা যে নগলির কাছে শ্রেষ্ঠ পুরুষ তা ধীর জানত। কিন্তু সে যে নগলির কাছে বরাবরের জন্যই দুর্বলতম স্থান তা তার জানা ছিল না। শতাব্দী শেষ হওয়ার মুখেও যে এমন কাহিনী বাসি হয়ে যায়নি সেটা সে তৎক্ষণাৎ জেনে নিল।

এমন তেজি মহিলাকে বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখে মায়া হল ধীরের। নগলির মাথায় হাত রাখতেই সে তার দিকে তাকিয়ে দেখল। হাত ধরে তুলে তাকে ফের বিছানায় বসিয়ে দিল ধীর। তার পর মূল কথায় ফিরে এল।

— দিশকে নিয়ে তোমার সঙ্গে নীচে নামতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু সানজিমাতার সম্মতি ছাড়া সেটা করতে গেলে আমরা দু'জনই প্রচণ্ড বিপদে পড়তে পারি, জান তুমি?

ঘাড় নেড়ে নগলি জানিয়ে দেয় সেটা সে ভাল করেই জানে।

— তা ছাড়া, কোনও কিছু খোঁজখবর না নিয়ে নীচে নামলেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে এটা ভুল ধারণা। সমতলে খতরা ঢের বেশি। ব্যবস্থা করতে সময় চাই।

চুপ করে থাকল নগলি। তাকে খুব চিন্তান্বিত মনে হল। তার ধারণা উপত্যকার বাইরে দিশকে পাঠাতে পারলে সে বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু ধীরের ধারণা তাকে বাঁচানো খুব কঠিন। যে গোপন অনুসন্ধান এ ক'দিন তার পাঁজরার আড়ালে ঢাকা ছিল হঠাৎ তার তীব্র দুর্গন্ধ তাকে ধাক্কা মারল। চেয়ার থেকে উঠে সে নগলির পাশে বিছানায় গিয়ে বসল।

— কোনও মানুষের মধ্যে অশুভশক্তি ভর করে আছে ওসব আমি বিশ্বাস করি না,

নগলি। কিন্তু যারা করে তারা খুব নির্মম হতে পারে।

নগলি অস্বাভাবিক দ্রুততায় তার দিকে ঘুরে তাকায়।

— কী বলতে চায় তুমি?

খুব যত্ন করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল ধীর। অত নরম মুখ হঠাৎ শুকিয়ে কাঠ। মোটামুটি নিশ্চিত হল সে — ভয়ের ভার নগলির শরীরে ভর করতে উদ্যত।

— যেদিন ছোট রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে মাচদার মোড়ে বাস এসে দাঁড়াল সেদিন ইদরি নালার ধারে একটি মেয়ের লাশ দেখতে পাই। মেয়েটি কে, কেনই বা তার এমন মৃত্যু, জান তুমি?

বোধহয় বুঝতে পেরেছিল নগলি। বিছানা থেকে ছিটকে দেওয়ালের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেল সে। তাকে দেখে সত্যিই ভয় পেয়ে গেল ধীর। নগলি দাকাত ধীর বিশ্বাস বলে কাউকে চেনে বলে মনে হল না তার। সে যেন ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইল।

— কীধার কিসকি মৌত হোবে আমি কী জানে। তুমি ক্যায়া পুলিশকা আদমি আছে। আমি তুমার রাখেল নেহি আছে, সমঝা!

তার স্পর্ধাকে থেঁতলে দিতে চাইল নগলি। একটা কথার সঙ্গে আর একটার কোনও সংযোগ নেই। 'কোথায় কে মারা যাবে আমি তার কী জানি। তুমি পুলিশের লোক নাকি? মনে রেখো আমি তোমার রক্ষিতা নই।' এমন রূঢ় মন্তব্য বাঙালিবাবুকে লক্ষ্য করে নগলি কখনই বলতে পারে না। কিন্তু সে বলল।

সব বুঝল ধীর। ওই মেয়েটির মৃত্যু বলতে গেলে সবার দোরগোড়ায় ঘটে গেলেও কেউ কিচ্ছু জানে না। অর্থাৎ জানার ভয়ঙ্কর অসুবিধে আছে।

মাঝরাতে কোনও অতিথিকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলা উচিত নয়। তাই হয়তো নগলি তাকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলতে পারেনি। তবে অবস্থা যা তাতে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেই ধীর স্বস্তি ফিরে পেত। কিছুক্ষণ মানসিকভাবে শূন্যে ঝুলে থাকার পর সোয়েটার আর উইণ্ডপ্রুফ গায়ে চড়াল ধীর। লুটের মাল তড়িঘড়ি ব্যাগে ভরার মতো করে স্লিপিং ব্যাগটা ভরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। পাতলা অন্ধকারের সঙ্গে হালকা হিম-কুয়াশা। বারান্দার আলো জ্বলে উঠল। অর্থাৎ এমন অসময়ে অতিথি বেরিয়ে গেলেও তার আপত্তি নেই, বুঝিয়ে দিল ম্যাডাম নগলি দাকাত। ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে সরু পথ। তার পথ আগলে কোনও পাহাড়ি কুকুর বা পালোয়ান যুবক দাঁড়িয়ে থাকেনি। অল্প এগিয়ে গিয়ে চওড়া রাস্তায় এসে দাঁড়াল সে। পিছনে কারও পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ধীর — মুলকি।

"বহুত আঁধেরা। সামহালকে জানা সাব্।"

অন্ধকার পথে মুলকি তাকে সাবধানে যেতে বলল। ধীরের মুখ থেকে আর 'তুম' শব্দটা বেরোতে চাইল না। মুলকির পিছনে সামান্য পথ হলেও ধীরকে বলতে হল ঃ "আপ ভি সামহালকে জাইয়েগা।"

অন্ধকারের মধ্যে মুলকি মিলিয়ে যেতেই মিনিট পাঁচ হেঁটে বড় রাস্তায় এসে পৌঁছাল ধীর। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে খিক্‌খিক্ করে হেসে উঠল। আহাম্মক আর বলে কাকে!

নাংগেল তাফা

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় চাদরমুড়ি দিয়ে সারা মাচদা নিঃস্তব্ধ। শীতের ধাক্কায় তার পায়ের শব্দ জরিপ করে দেখার মতো সাহসী সারমেয়-র অভাব খুব। কেবল দু'এক পিস শুয়ে থেকেই ভুকভুক করে থেমে যায়। ধীর হনহনিয়ে এগিয়ে চলে। যেন কোনও দুর্গম পথে কঠিন এক অভিযানে শামিল সে। ইদরি নালার পুল পেরিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়েই চড়াই ভাঙতে থাকে সে। মাচদা থেকে লুনি যেতে হলে বুয়ারা হয়েই যেতে হয়। অবশ্য বুয়ারা গ্রামের নীচে একটা অস্পষ্ট পায়ে চলা পথ ধরেও লুনি যাওয়া যায়। ধীর সেই পথটাই ধরতে চায়। এমন অসময়ে নাংগেলজির ঘরে গিয়ে হাজির হলে হাজার কৈফিয়ত দিতে হয়। তিনি কোনও কথা শুনতে চাইবেন না। তাই অন্ধকার ফিকে হওয়ার অপেক্ষায় একটা পাথরের আড়ালে সে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল। ভোরের উঠতি আলো মুখে এসে পড়তেই সে লুনির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় ধীর নাংগেলজির ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু এ কী হাল তাঁর ঘরের! দু'বছর আগেও তো যথেষ্ট মজবুত ছিল তাঁর দু'কামবার বাংলো, নাংগেল-ভিলা। নামটা অবশ্য ধীরেরই দেওয়া। শুনে খুব মজা পেতেন। হাসতেন নিজের মনেই। কিছু বলতেন না। অমন গম্ভীর মানুষ হয়েও তিনি তাকে প্রশ্রয় দিতেন। তার কারণ অনেক। লিখলে মহাভারতকেও ছোট মনে হবে।

'ভ্রমণ' যে ধীরে ধীরে পরিষ্কার ব্যবসায় পরিণত হয়ে গেছে এটা ধীর তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারেনি। তাই করে যে প্রচুর হুলো বছর ঘুরতেই হালুম হালুম আওয়াজ তোলে তা বললে তিনি ভর্ৎসনা করতেন। তাঁর দক্ষতা দিয়েই তিনি কয়েকটা নাংগেল-ভিলা দিব্যি বানিয়ে নিতে পারতেন। তাঁর সেই এক কথা, মানুষের হিমালয়-অনুরাগ নিয়ে ব্যবসা ইতরবৃত্তি। মানুষটা চিরদিনই আকাট থেকে গেলেন। অবশ্য তা না থাকলে ধীর কোনওদিনই তাঁর সঙ্গে হিমালয়ে যেতে পারত না।

প্রায় হুড়মুড়িয়ে পড়ার অপেক্ষায় নাংগেল তাফা-র দু'কামরার ঘর। পাথর সাজানো দেওয়ালের যত্রতত্র ফাটল — চৌচির অবস্থা! যে কোনও সময় দেওয়াল ভেঙে ছাদ মাথায় পড়ার সম্ভাবনা। জীর্ণদশাগ্রস্ত হলেও তখনও মোটামুটি একটা ঘর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। গ্রামের মধ্যে থেকেও বাকি ঘরগুলি থেকে কিছুটা দূরবর্তী হওয়ায় নাংগেল তাফা সর্বঅর্থেই একাকী। অন্যান্য বাসিন্দাদের থেকে সবদিক দিয়েই ভিন্ন প্রকৃতির বলেই হয়তো তারাও তাঁকে এড়িয়ে চলে।

রুকস্যাক বাইরে রেখে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখল ধীর। মেরুন কম্বল গায়ে জড়িয়ে ঘরের মেঝেতে নাংগেলজি ধ্যানমগ্ন। যেখানেই থাকুন না কেন ভোরবেলা উঠেই এই ধ্যান তাঁর করা চাই। এই বয়সেও সেই অভ্যাস তাঁকে ছেড়ে যায়নি। বাইরের পৈঠানে বসে অপেক্ষা

করে রইল ধীর।

সারা উত্তরপ্রান্ত তার চোখের সামনে হলেও সানজিধাম ছাড়া অন্য কিছুই দেখতে পেল না ধীর। বুয়ারা ও লুনির সামনে মাথা তুলে থাকা রিজের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় সব কিছু। রিজের দুটো ভাঙা অংশ দিয়ে বুয়ারা ও লুনি-র মানুষজন মাচদা ও পিতসি-র সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। দুই গ্রামেই জলের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত। কিন্তু ওই জলের ধারা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে কিছুটা পরই মাটিতেই মিলিয়ে যায়। তার কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। ভূমিতে এমন জলধারা কিছুটা অস্বাভাবিক। তবে ওই দুই গ্রামের একশ বছরের ইতিহাসে ওই জলধারার গতিবেগে কোনও হেরফের ঘটেনি। কোনও দিন হঠাৎ জলের স্রোত থেমে গেলে দুটি গ্রামের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে।

হঠাৎ-ই নাংগেল তাফা তার সামনে। এমনিতেই গম্ভীর মানুষ—ধীরের তাঁকে আরও গম্ভীর বলে মনে হল। মাথা নামিয়ে প্রণাম করতে যাওয়ার সময় বুকে তুলে নিলেন। কিন্তু তিরস্কার করতে ছাড়লেন না।

— এ কেমন কথা! আমি ভাবতেই পারছি না। এতদিন হল তোমার আসা অথচ লুনির কথা মনেই পড়ল না। ব্যাপার কী, খুলে বলো তো।

বাচ্চা ছেলেকে যেমন হাত ধরে দাওয়ায় বসাতে হয় তেমনি করে তাকে ধরে তিনি পৈঠানে বসিয়ে দিলেন। মাথার চুলে হাত দিয়ে ম্যাসাজ করার ভঙ্গিতে এলোমেলো করে দিয়েই টেরি কেটে দিলেন।

— না মানে, আপাং ভাই-এর ওখানে জায়গা মেলেনি তাই ...।

কথা শেষ করতে দিলেন না। ধীরের ঘাড়ে হাত রেখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে গেলেন।

— আমি সব শুনেছি। তার দোকানে তুমি মালপত্তর পর্যন্ত পাওনি। পিতসি থেকে মাল নিয়ে গিয়েছ তুমি। দিরাং-এর ঘরে তোমাকে রাত কাটাতে হয়েছে। সব জানি আমি।

এমন ঘটনায় তিনি খুব অসহায় বোধ করেন। ধীর প্রসঙ্গ বদলে দিতে চাইল।

— আপনার শরীর ভাল নেই, শুনলাম।

— কই আর শুনলে। শুনলে কি আমার কাছে আসতে তোমার এতদিন লাগত?

উপত্যকায় পৌঁছেই সে নাংগেলজিকে প্রণাম জানিয়ে আসে। এবারই তার ব্যতিক্রম ঘটল।

— আপনার কী হয়েছে?

— কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। তবে ধামির কাছে তোমার সাচ্চুধুরা চড়ার খবর পেয়ে আমার শরীরে আর কোনও অসুখ নেই।

নাংগেলজি অসম্ভব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। বারংবার ধীরের মাথায় চুমো খেতে থাকলেন আর 'সাব্বাস' 'সাব্বাস' ধ্বনি দিতে থাকলেন। ইচ্ছে থাকলেও সে বলতে পারল না যে, সাচ্চুধুরা কোনও গিরিবর্তই নয়। তার ওঠার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না — হঠাৎ ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে। তিনি ওখানে একদা চেষ্টা করেও উঠতে না-পারায় তাঁর চোখে জল চলে এল। তিনি তাকে 'ধীরু' বলে ডাকেন। তার কৃতিত্বে তিনি যে যারপরনাই গর্বিত সেটা বোঝাতে নাংগেলজি বাচ্চা ছেলেদের মতো লাফালাফি শুরু করে দিলেন। তাঁর শরীরের মধ্যেকার চঞ্চল আলোড়ন কীভাবে যেন উদ্দাম স্ফূর্তির হিল্লোল হয়ে আছড়ে পড়ছিল। ওই উদ্দামতায় তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। নাংগেলজি যে অসুস্থ তা বুঝে গেল ধীর।

—আপনার শরীর ভাল নেই। আপনি শান্ত হয়ে বসুন, সব বলছি।

কে শোনে কার কথা। যিনি প্রয়োজন ছাড়া কথাই বলেন না তাঁর মুখের কথা যেন শেষই হতে চায় না।

— আমি ভাবছি দিরাং-এর কথা। আমার হয়ে তুমি কিন্তু তাকে সাবাস জানিয়ে দিও।

— নিশ্চয়ই দেব।

খুশি হলেন শুনে। ধীর কিন্তু তার গুরুজির শরীরের হাল দেখে সত্যিই চিন্তায় পড়ে গেল।

— আজই আমি আপনাকে মাকনা নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখিয়ে আনতে চাই।

— এত বড় একটা কাণ্ড ঘটিয়ে এলে এটা কি আমার শরীর নিয়ে কথা বলার সময়? তুমি থামবে!

কোনও কিছু অপছন্দ হলে গুরুজি এভাবেই থামিয়ে দিতেন। তখন সে থেমে যেত। এবারও থেমে গেল। সটান সাচ্চুধুরায় চলে গেল।

—সাচ্চুধুরা চড়ার কথা আপনি কার কাছে শুনলেন?

— ধামির কাছে। কেন, ধামি তোমাকে বলেনি যে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করছি?

— আমার সঙ্গে ধামিজির দেখা হয়নি। কিন্তু আপনি তাঁকে পেলেন কোথায়?

— কাজে এসেছিল বুয়ারা। নিজে এসে ধামি আমাকে খবরটা দিয়ে গেছে। ওকে মিঠাই খাইয়েছি আমি। এমন খবর যে নিয়ে আসে সে তো দেবদূত।

কী মানুষ! এই একটা মানুষের কাছে ধীর কোনওদিন জিততে পারল না। অবশ্য তাঁর কাছে হেরেও এত আনন্দ হয় যে জেতার প্রয়োজন পড়ে না।

— মিঠাই কোথায় পেলেন আপনি?

— আরে! কী সব বোকা বোকা কথা! নাংগেল-র মান রাখলে তুমি আর আমার কিনা মিঠাই-এর অভাব হবে।

কোনও উত্তর দিল না ধীর। তার নিশ্চিত ধারণা কাউকে পিতসি পাঠিয়ে মিষ্টি আনিয়েছিলেন তার গুরুজি। যে কামরাটা তখনও দাঁড়িয়ে তার মধ্যে ঢুকল ধীর। চাল ডাল তেল মসলা পর্যাপ্ত না হলেও মোটামুটি ব্যবস্থা আছে। একটা মানুষের জন্য যথেষ্ট।

— এ সব কি আপনি নিজে নিয়ে আসেন?

— কখনও সখনও। বেশির ভাগটাই এনে দেয় মানজু।

— মানজু!

— মানজু সালান। তোমার সঙ্গে তার বোধহয় পরিচয় নেই। খুব ভাল ছেলে। পাহাড়ে গাইড হয়ে যায়।

মানজু সালান যে সানজিদেবীর ভাই এটা কি গুরুজি ইচ্ছা করেই আড়াল করে রাখলেন? মানজু হয়তো ভাল কিন্তু নাংগেল তাফা-র কাছে ভাল হওয়ার মতো ভাল বলে ধীরের মনে হয়নি। এক ঝলক তাকে দেখলেও ধীরের অনুমান তাই বলে।

— মানজু আপনাকে খুব ভালবাসে, তাই না?

— এই দেখ! ও কেন ভালবাসবে! ও তো ছেলেমানুষ। ও কি ভালবাসতে পারে। আমি ওকে খুব ভালবাসি।

চোখ ঘুরিয়ে নিল ধীর। এই হল তার গুরুজি। সময় সময় এভাবেই মানুষটা ধরা দেয়। কখনও কারও যেমন দোষ দেখতে জানেন না তেমনি সর্বদা সবাইকে আড়াল করে রাখতেও তাঁর ভুল হয় না।

সকাল সাতটায় গ্যাস স্টোভ ধরিয়ে দুধ ছাড়া চা বানাল ধীর। চা খেয়ে গ্যাস স্টোভ আর বার্নার হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন।

— বেশ হালকা। কেরোসিন উপরে তোলার ঝামেলা নেই। খুব কাজের।

বছর পাঁচ আগেও এসব দেখা যেত না। বিদেশিদের কাছে হয়তো থাকত কিন্তু উনি বিদেশি দলের সঙ্গে খুব একটা যেতেন না। মাকনায় গিয়ে থাকলে এতদিন উনি পয়সার পাহাড়ে চড়ে বসতেন। সেখানে অনভিজ্ঞ টাউটদের হাতেই অঢেল পয়সা। নিরিবিলিতে কিছু পর্বতপ্রেমী মানুষজনের সঙ্গেই তিনি সারাজীবনটা কাটিয়ে দিলেন। তাতে অবশ্য সবচেয়ে বেশি লাভবান সে নিজে। হাজার অসুবিধে সত্ত্বেও ধীরকে সময় দিয়েছেন তিনি। কিন্তু তিনি পুরোপুরি ঠকে গিয়েছেন। হঠাৎ বসে পড়ায় তাঁর সামাজিক নিরাপত্তাও কিছুটা হুমড়ি খেয়ে পড়ার মুখে। তবু কোনও বাধাই তাঁকে তাঁর দুর্দমনীয় হিমালযপ্রেম থেকে বিরত করতে পারেনি। হিমালয়ের ঢালে যে কোনও সাফল্যই তাঁকে প্রেরণা জোগায়। সবটুকুই তিনি চেটেপুটে অনুভব করতে পারেন। চাসু উপত্যকায় ধীরের কাছে নাংগেল তাফা-ই একমাত্র পূজ্য মানুষ। তাঁর গৃহ সত্যিই এক মন্দির।

দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল ধীর।

তার রুকস্যাকটি পরম মমতায় কোলে তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে যত্ন করে রাখলেন। ফিরে এসে আইস অ্যাক্সটি হাতে নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণ সেরে নিলেন। কোনও প্রয়োজন ছিল না তবু সেটিকে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছতে মুছতে ধীরের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

— তা হলে বল, সাচ্চুধুরাতে আমিও তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।

— হ্যাঁ গুরুজি, আপনার সঙ্গেই দিরাং ও আমি সাচ্চুধুরায় উঠেছিলাম।

কথাটা বলে দারুণ আরাম পেল ধীর। কিন্তু তিনি ভর্ৎসনা করতে ছাড়লেন না।

— গুরুজি আবার কী! হিমালয়ের ঢালে কেউ কারও গুরু হয় না ধীরু। আমি তো তোমাকে এ কথা অনেকবার বলেছি।

হ্যাঁ, এমন কথা উনি আগে অনেকবার বলেছেন তবে সে কথা শুনতে তার ভারী বয়েই গেছে।

প্রায় দশ বছর আগে ধীর ওই অ্যাক্সটি নাংগেলজির কাছে উপহার হিসাবে পেয়েছিল। তেমনি ধীরের কাছে প্রণামী হিসাবে পাওয়া স্লিপিং ব্যাগটিও তিনি প্রায় সর্বদাই পাহাড়ে নিয়ে যেতেন।

— অনেকদিন হল আপনি আপাংভাই-এর হোটেলে ঢুকে দেখেননি। তার হোটেল এখন অনেক বড় হয়েছে।

— সে কী, আমি তো মাত্র দু'দিন আগেই তোমার খোঁজে আপাং-এর কাছে গিয়েছিলাম।

সে তোমায় কিছু বলেনি?

তার গুরুজি সম্ভবত তিনটের পর গিয়েছিলেন। ওই সময় দিরাং-কে সঙ্গে নিয়ে ধীর উর্ধ্বশ্বাসে মাতরা নালার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ফেরার পথে নগলির ধাবা থেকে সোজা লুনি। আপাং-এর তার সঙ্গে দেখা করার কোনও সুযোগ ছিল না।

— তার সঙ্গে প্রায় তিন দিন হতে চলল আমার দেখা হয়নি।

— আপাং বলছিল কোন্ দলের নাকি দুর্ঘটনা ঘটেছে। তুমি দিরাং-কে সঙ্গে নিয়ে তাদের সাহায্য করতে গিয়েছিলে। কেমন আছে তারা?

ওই প্রসঙ্গটা সে ভুলে থাকতে চায়। তবু সে একটু অবাক হল। ঘটনাটা জানতে চাইলেন কিন্তু কেমন যেন উপর উপর জানতে চাওয়া। নাংগেল তাফা তো এমন স্বভাবের নন। ঘটনার বিশদ বিবরণ খুঁটিয়ে জানতে চাইবেন তিনি এটাই স্বাভাবিক।

— আপাং আপনাকে কিছু বলেনি?

—না, বলেনি। তোমার খবর না পেয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম। ফিরে আসার সময় শুনলাম কোন এক বিদেশি দলের দুর্ঘটনায় তোমরা সাহায্য করতে গিয়েছ।

কীভাবে সংক্ষেপে ঘটনাটা বলে ফেলা যায় মনে মনে ভেবে নিল ধীর।

— একজন বিদেশি মহিলাকে নিয়ে সোনাম চিকু আর দু'জন মালবাহক মাতরা হিমবাহে গিয়েছিল। ওখানেই চিকু দুর্ঘটনায় পড়ে তবে মারাত্মক কিছু নয়। এখন সে সানজিধামে আছে। চিন্তার কোনও কারণ নেই।

কিন্তু তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হল। চোখেমুখে বিস্ময় প্রকাশ করে ফেললেন।

— চিকু! তুমি ঠিক জান?

— চিকুকে স্ট্রেচারে তুলে দিরাং, একজন মালবাহক আর আমি বেশ কিছুটা নীচে নামিয়ে এনেছিলাম।

— তাই তো, তাই তো! তোমরা তো ওখানেই গিয়েছিলে। কিন্তু মাতরা হিমবাহে দুর্ঘটনা! ঠিক বুঝতে পারলাম না।

— আপনি তো ওখানে অনেকবার গিয়েছেন। আমিও দু'বার গিয়েছি কিন্তু বেশিদূর যাওয়া হয়নি। হিমবাহ ধরে সাবধানে এগিযে গেলে দুর্ঘটনা ঘটার তেমন তো কোনও কারণ নেই।

— আমারও তো সেটাই কথা।

— চিকু আপনার খুব স্নেহভাজন বলে শুনেছি। বুঝতেই পারছি আপনি খুব চিন্তায় পড়েছেন। তবে তার আঘাত মোটেই গুরুতর নয়। কয়েকদিনের মধ্যেই সেরে যাবে।

— ধীরু, আমি চিন্তায় পড়েছি এটা ঠিক। কিন্তু আমার চিন্তা ওই বিদেশি মহিলার জন্য।

ধীরের হঠাৎ মনে হল, আসল খবরের খনিতে গুরুজি সম্ভবত তাকে পৌঁছে দিতে পারেন। সামান্য দ্বিধায় ছিলেন, এই যা। তার উচিত তাঁকে অন্য প্রসঙ্গে যেতে না দেওয়া। আচমকা প্রসঙ্গ বদলে দেওয়া তাঁর অনেকদিনের অভ্যাস।

— যে মহিলাকে আপনি চেনেনই না তার জন্য আপনার এত চিন্তা হবে কেন? তিনি বিদেশ থেকে এতদূর পাড়ি দিয়েছেন। তিনি মোটেই ছেলেমানুষ নন।

— এ সব তুমি কী বলছ, ধীরু! না চিনলে চিন্তা হতে নেই?

তার উদ্দেশ্য সফল। গুরুজিকে সে তাতিয়ে দিতে পেরেছে।

— নাহ্, ঠিক তা নয়। শুনেছি উনি খুব দক্ষ ক্লাইম্বার। কী করছেন তা উনি বুঝতে পারবেন না এমন ছেলেমানুষ তো ওনার হওয়ার কথা নয়। এক ঝলক তাঁকে দেখে আমার তাই মনে হয়েছে।

ধীরের জবাবে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না নাংগেল তাফা। পরম উদারতায় তিনি তাকে বোঝাতে চাইলেন।

— পাহাড়ি ঢালে গোঁয়ার্তুমিও এক ধরনের ছেলেমানুষি, ধীরু। যে কোনও মানুষের মধ্যেই সেটা হঠাৎ করে দেখা দিতে পারে। বিবেচনা ও সংযমই তখন একমাত্র পথপ্রদর্শক। সেটা না ঘটলে ভয়ঙ্কর অসুবিধে হয়ে যেতে পারে।

একটু সময় নিতে হল ধীর বিশ্বাসকে। এসব কথা কোন গাইড কাকে বলতে পারে ভাবতে হল তাকে। এস্কিমোদের মতো করে গুরুজির পদযুগলকে সে মনে মনে জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করে দিল। কিন্তু তাঁর কথার ধারও সে সেই সঙ্গে উসকে দিতে চাইল।

— এর মধ্যে আপনি গোঁয়ার্তুমির কী দেখলেন?

নাংগেলজি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। ধীরের মনে হল, তিনি এড়িয়ে যেতে চাইবেন। কিন্তু কী ভেবে মুখ খুললেন।

— তা হলে তোমাকে আসল কথাটাই বলি। মাতরা রেঞ্জ টপকে ডোলিতে পৌঁছানো

যায় কি না চিকু আমার কাছে জানতে চেয়েছিল। একজনকে নিয়ে ও ওদিকে যেতে চায়। কিন্তু সেই একজন যে বিদেশি ও মহিলা তা সে আমাকে বলেনি।

— কী পরামর্শ দিয়েছিলেন আপনি?

— ওকে আমি বলেছিলাম কাউকে নিয়ে যাওয়ার আগে ওই পথে নিজেরা চেষ্টা করে দেখ। সঙ্গে বুদ্ধিমান মানুষ থাকা প্রয়োজন, তাও বলেছিলাম। ওকে আমি তোমাকে সঙ্গে নেওয়ার কথা বলি। চিকু তোমাকে কিছুদিন আগে থেকেই নামে চেনে।

চুপ করে থাকলেও ধীরের মনের মধ্যে জমে থাকা কিছু কিছু জট ধীরে ধীরে খুলে যেতে শুরু করল। নাংগেল তাফাও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়লেন। মাতরা সম্বন্ধে তার আরও জানা দরকার হলেও সে চিকু সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন না করে পারল না।

— আপনাব কি সত্যিই মনে হয় মাতরা থেকে ডোলি যাওয়ার সম্ভাব্য রুট চিকু খুঁজে পেয়েছে?

হাই তুলে ঘুমঘুম চোখে তিনি ধীরের দিকে তাকালেন। চোখ নামিয়ে একটু ভাবলেন।

— ও অনেক বদলে গেছে। তবে জেদটা আগেকার মতোই আছে। কোথাও একটা চেষ্টা করে হয়তো ওর মনে হয়েছে ডোলি যাওয়া সম্ভব।

— কেমন পাহাড়ে চড়ে?

— বেশ ভাল। তবে গত আট বছর ও বাইবে ছিল। ওই সময় কোথায় কী করত আমার জানা নেই।

— বাইরে বড় জায়গা। প্রচুর রোজগার করা যায়। হঠাৎ চাসুর মতো জায়গায় ও ফিরে এল কেন?

প্রশ্নটা খুবই নিরীহ কিন্তু নাংগেল তাফা অসম্ভব বিরক্ত হলেন। ধীর কোনও কারণ খুঁজে পেল না।

— আমি কী করে বলব। হয়তো ওর স্বভাবই এমন। কোনও কিছুতেই স্থির হয়ে থাকা হয়তো ওর স্বভাবে নেই।

— আমি দুঃখিত গুরুজি। বুঝতে পারিনি আমার প্রশ্ন শুনে আপনি অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

নিজের ভুল বুঝতে পারলেন নাংগেল তাফা। ধীরু যে তার বিরক্তিভাব বুঝে গিয়েছিল এতে খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন।

— আসলে কি জান, চিকু পেডাং গোষ্ঠির মানুষ। ওই গোষ্ঠির পুরুষ মানুষরা কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। অতি নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষ হলেও পেডাং পুরুষ ছাড়া ধর্মীয় আচার সম্পূর্ণ হয় না।

— চাসু উপত্যকায় আর কোনও পেডাং পুরুষ নেই?

— না।

ওই বিষয়ে আর কিছু জানতে চাইল না ধীর। তবে অন্য আর একটা ব্যাপারে সে গুরুজির কাছে পরামর্শ চাইল।

— চোট সেরে যাওয়ার পর চিকু যদি তার সঙ্গে আমাকে যেতে বলে তা হলে আমার কি যাওয়া উচিত?

এমন প্রশ্ন তিনি আশা করেননি। অনেকক্ষণ কোনও উত্তর দিলেন না। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে উত্তরটা দিতেই হল।

— তার তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাওয়া উচিত ছিল। সে যখন তা কবেনি তখন এরপর তেমন অবস্থা এলে সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে।

পৈঠান থেকে উঠে গিয়ে গুরুজি জানিয়ে দিলেন প্রসঙ্গ শেষ। অর্থাৎ আপাতত আলোচনায় বিরতি। ধীরও উঠে পড়ল। হঠাৎ মনে পড়ল তার কী একটা ব্যাপার নিয়ে সে গুরুজির সঙ্গে হেস্তনেস্ত করতে এসেছিল। কী হল তার? নিজেকেই সে প্রশ্নটা করে বসল। নাংগেলজির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই জবাব পেয়ে গেল ধীর।

— আজ তুমি আমার কাছে থেকে যাও। কথা আছে।

কী কথা তা বললেন না। জিজ্ঞাসা করারও কোনও সুযোগ নেই।

সত্তর দশকের গোড়ায় যেদিন থেকে ধীরের তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় সেদিন থেকেই নাংগেল তাফা তার কাছে এক বিরল প্রজাতির মানুষ। খুব একটা লেখাপড়া শেখেননি। হিমালয় ভ্রমণের ইতিবৃত্ত তাঁর অজানা। দু'পাঁচটি বিশেষ অঞ্চল ছাড়া হিমালয়ের অন্য কোনও স্থান তিনি ঘুরে দেখেননি। যে পাহাড়ি পথে যেতে হলে বরফ ও শক্ত পাথরে চড়ার দুরূহ আরোহণ পদ্ধতি জানা জরুরি সেখানে তিনি প্রায়ই ব্যর্থ হন। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না করে তিনি এক পা-ও এগিয়ে যেতে চান না।

পর্বতারোহণ মানেই যে এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষা তা তিনি বিশ্বাস করেন না। ধীর বিশ্বাসের হিমালয় ভ্রমণের বয়সও খুব একটা কম না। অনেক দুরন্ত পর্বতারোহীকে সে কাছ থেকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। তবু নাংগেল তাফা-কে তার গুরু বলে স্বীকার করতে দ্বিধা হয়নি।

সব অভাব তিনি ঢেকে দিতে পেরেছেন তাঁর দুর্জয় মানসিকতা, ঔদার্য ও প্রেম দিয়ে। হিমালয়ের ঢালে সুন্দর ও দৃঢ়চেতা মানুষের অভাব তিনি অনেকটাই পূরণ করতে পেরেছেন। এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দক্ষ ও সংবেদনশীল গাইড হিমালয়ের ঢালে সে কখনও দেখেনি। ফলে তার সামনে গর্জন করার সাহস হত না কারও। অল্প ভুকভুক যা করার তা ধীরই করত।

এমন সম্পর্কের সবুজ উজান টপকে কোনও ব্যাপারেই তাঁর সঙ্গে হেস্তনেস্ত করার সাহস নেই ধীর বিশ্বাসের। ওই ভুকভুক অল্পস্বল্প, গর্জন পিছনে।

নাংগেলজির ঘরের পাশ দিয়েই ধারার জল বয়ে যায়। গ্রামের বাকি ঘরবাড়ি কিছুটা নীচে। সারা দিনের মধ্যে কেউ এসে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করল না। পাহাড়ি গ্রামে এমন ঘটনা অভাবনীয়। রাশভারী মানুষকে প্রায় সবাই এড়িয়ে চলে। তাঁর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সম্ভবত তাই।

নগলির এমন নিঃশর্ত প্রেমকে অস্বীকার করে নাংগেল তাফা অত্যন্ত অন্যায় করেছেন, মানতে দ্বিধা নেই ধীরের। তবে তাঁদের দু'জনের মধ্যে বিয়ে হলে সেই বিয়ে স্থায়ী হত কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে তার। নগলি কেন, নাংগেল তাফা বোধহয় বিয়ে করার মতো মানুষই নয়। নগলির প্রতি সমবেদনা থাকলেও নীরবে নাংগেলজির সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাতে বাধ্য হয় ধীর।

সন্ধের মুখে লুনিতে বসে তার মনে হয় এমন শান্ত কোলাহলহীন স্থানে থাকেন বলেই নাংগেলজি সবার থেকে আলাদা। শ'খানেক ফুট দূরে একটা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পায় সে। তা হলে ওখানেই কি মুলকি থাকত? হঠাৎ-ই মুলকির সঙ্গে দিশ যেন তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

— দিশ নামের একটি মেয়েকে দেখলাম। ওকে দেখলে খুব কষ্ট হয়।

গুরুজি নরম দৃষ্টি দিয়ে তাকালেন। তবু সেই দৃষ্টি যেন দিগন্তকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে চায়।

— ঠিকই বলেছ, খুব কষ্ট হয়।

— মেয়েটি আপনাকে নাকি খুব ভালবাসে?

— বাসত এক সময়। এতদিন পর বোধহয় আর চিনতে পারবে না।

— বাচ্চারা পছন্দের মানুষকে কিন্তু সহজে ভোলে না। চিনতেও পারে।

অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেন। কী যেন মনে করতে চাইলেন।

— সে এখন আর বাচ্চা নয়। অনেক বড় হয়ে গেছে।

মেয়ে বড় হলে পাহাড়ে সমস্যা বেড়ে যায়। তখন আর তাকে চেনা যায় না। তাই হয়তো তিনি আর চিনতে টিনতে চান না।

— নগলি মেয়েটিকে কোনও ভাল জায়গায় রাখাব জন্য শুনলাম আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

নগলির প্রসঙ্গ আসতেই তিনি চুপ করে গেলেন। সবার মতো হয়তো তাঁরও জিজ্ঞাসা, অনাত্মীয় এক মূক-বধির মেয়ের জন্য তার এমন আকুলতার কারণ কী? চাপা মানুষ তিনি সবটাই মনের মধ্যে রেখে দিলেন। সত্যিটা না জেনে বোধহয় তাঁর মঙ্গলই হয়েছে।

— সানজিমাতা আপনাকে খুব সম্মান করেন শুনেছি। ওখানে কি আপনি মাঝেমধ্যে যান?

— হ্যাঁ, প্রতি সপ্তাহেই একদিন ওখানে গিয়ে আমাকে থাকতে হয়।

— থাকতে হয়!

হাসলেন। কোনও কিছু বলবেন না মনে করেও শেষ পর্যন্ত বললেন।

— তোমাকে বলতে পারলে খুশি হতাম কিন্তু বলা বারণ।

ধীরও আর কিছু জানতে চাইল না। উনিও চুপচাপ হয়ে গেলেন। একটু রাত হতেই তারা পাহাড়ের আলোচনায় ডুবে গেল। তারপর জমিয়ে ডিনাব সারা হল। সকালে উঠে চায়ের ব্যবস্থা করল ধীর। ধ্যান সেরে চা খেলেন নাংগেলজি। পিঠে স্যাক তুলে বাইরে এসে দাঁড়াল ধীর। তার পিছনে তিনিও।

— যে কথা বলার জন্য থাকতে বলেছিলেন তা কিন্তু আপনি আমাকে এখনও বলেননি।

— হাতে সময় থাকলে তুমি একবার মাতরা হিমবাহ ঘুরে এস। পূর্ব বা পশ্চিম কোণায় ঢাল ধরে ওঠা সম্ভব কি না পরীক্ষা করে দেখতে পার।

— যদি ওঠা সম্ভব না হয়?

— তা হলে একবার মাঝখানের বেগু ধরে এগিয়ে দেখতে পার। মনে হয় তোমার পক্ষে ব্যাপারটা বোঝা সম্ভব। তবে সেফটি'র দিকটাও নজরে রেখ।

— মানজু কি যেতে পারে?

— পরে হলে হয়তো পারত। এখন তার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার সঙ্গেই একটা

কাজে সে খুব ব্যস্ত।

— বেশ, আপনার কথামতো আমি চেষ্টা করে দেখব।

— কিন্তু তুমি যে যাচ্ছ এ কথা যতটা সম্ভব গোপন রেখ।

গুরুজির পায়ে হাত রাখল ধীর। এবার আর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরার সময় পেলেন না। সচেতন প্রশ্রয়ে তিনি ধীরের মাথায় হাত রাখলেন। ধীর নীচে নামতে শুরু করল। কিছুটা নীচে নামার পরই গুরুজিকে সে আর দেখতে পেল না।

পাসপোর্ট

নাংগেল তাফা-র মুখ থেকে 'নগলি' নামটা ধীর কোনওভাবেই বের করতে পারেনি। ওই একটা ব্যাপারে মানুষটা ঝাঁপ নিয়ম করে কেন বন্ধ করে রাখেন তা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। এত বড় মাপের মানুষ হয়েও ওই একটা জায়গায় তাঁর মনের প্রসারতা হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। মুলকি একদা যে তাঁর প্রচুর সেবা করেছিল সেটা উহ্য রেখে দিলেন। শুধু দিশের জন্য তাঁর মনে কিছুটা জায়গা আছে। কিন্তু সেই মেয়ে যে বর্তমানে সবার কাছে এক মূর্তিমান আতঙ্ক সে খবর তাঁর জানার প্রয়োজন পড়ে না। অথচ যে মহিলা ওই মেয়ের জন্য এতখানি উদারহস্ত তার প্রতি নিয়মরক্ষার স্তুতিও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

সোনাম চিকু সম্বন্ধে অনেক কথাই বললেন কিন্তু তা থেকে মানুষটা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করা যায় না। শুধু বোঝা যায় একদা তাকে খুব স্নেহ করতেন কিন্তু আপাতত বেশ বিরক্ত। এবার তোমার হিসাব তুমি বুঝে নাও। মানজু তাঁর বেশ প্রিয় এটাও বোঝা গেল। তাকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে যাওয়ার পরামর্শও দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়ে দিলেন এখন তাকে পাওয়া যাবে না। গুরুজির সঙ্গে ওই ব্যাপারে সে একমত হতে পারেনি। মানজুকে অল্পই দেখেছে ধীর। তবু তার সঙ্গে পাহাড়ে যেতে হলে তাকে দু'বার ভাবতে হয়। তার অনুমান মানজুকে হিসাব করে কাজ করতে হয়। স্নেহের বশে গুরুজি মূল মানুষটাকেই সেভাবে বুঝতে পারেননি। সারা পথটা এমন সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে দেড় ঘন্টার মধ্যে মাচদা পৌঁছে গেল ধীর।

মুখি তাকে দেখে হাউমাউ করে উঠল। আপাং কেনি তাকে নাকি হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানজু তার খোঁজে আপাং-এর হোটেল ছাড়াও নগলির ধাবায় গিয়েছিল। তার হদিশ পাওয়া যায়নি। পৌঁছানো মাত্র সে যেন আশ্রমে চলে যায়। সানজিমাতা ও মেমসাবের জরুরি তলব। মাতরা হিমবাহ ঘুরে আসতে দিন দশের জন্য মালপত্রের লিস্ট তৈরি করতে করতে মুখির কথা শুনল ধীর।

— শুনা দাদাজি, মেরা বাত?

— সব শুন লিয়া। আভি তুরন্ত ইয়ে সামান তৈয়ার রাখনা।

ফর্দটা মুখির হাতে দিয়ে উঠে পড়ল ধীর।

— ফির কোহি জানা ক্যায়া, দাদাজি?

আবার এত মালপত্তর নিয়ে কোথায় যেতে চায় ধীর জানতে চায় মুখি। ধীর কোনও উত্তর দিল না। দ্বিতীয়বার জানতে চাওয়ার ভরসা হল না মুখির।

চাসু উপত্যকায় হঠাৎ সে এমন ভি-আই-পি হয়ে পড়ল কেন বুঝতে পারে না ধীর।

অন্য কারও ডাকাডাকির তার কাছে তেমন গুরুত্ব না থাকলেও সানজিদেবীর ডাক তাকে চিন্তায় ফেলে দেয়। তাঁকে প্রসন্ন না রাখলে ধীরকে যে ঝামেলায় পড়তে হতে পারে সেটা বিলক্ষণ জানে সে। তালা খুলে ঘরে ঢুকে সে অবাক হল। তার ছড়ানো জিনিসপত্র সুন্দরভাবে গোছানো। আপাং ছাড়া আর কেউ তো তার ঘরে ঢুকতে পারে না। তার কাছে দ্বিতীয় চাবি থাকলেও এমন কাজ সে কখনও করেনি। তা হলে!

কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল সেটা ধীরের জানা দরকার। কসে ধমক খাওয়ার পর মুখি শেষ পর্যন্ত সব খুলে বলল। যে কোনও তালাই নাকি দিশ মুহূর্তের মধ্যে খুলে ফেলতে পারে। আবার লাগিয়েও দিতে পারে। এমন কু-কৌশল একটা বোবা মেয়ের পক্ষে যে অনায়াস কর্ম বিশ্বাসই হচ্ছিল না ধীর বিশ্বাসের। মুসকিল হল, দিশকে এর জন্য কিছু বলা যায় না। রহস্য ভেদ করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকল ধীর। মুখির হাবভাবে তার মনে হল দিশের উপর সে খুব প্রসন্ন। অথচ দিন দুই-তিন আগেও তার উপর বেজায় খাপ্পা ছিল মুখি। কোথা দিয়ে যে কী ঘটছে তা সে বুঝতে পারল না।

দরজা লাগিয়ে বেরোতে যাবে হঠাৎ বোবা মেয়েটিকে ধীর দরজার সামনে দেখতে পেল। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা শুধু অদ্ভুতই নয় বিশ্রি রকমের অশ্লীলও বটে। বয়সে ধীর তার পিতৃতুল্য হলেও অচেনা মানুষ। কোনও পুরুষ মানুষের সামনে শরীর নিয়ে ওভাবে যে ব্যতিব্যস্ত হতে নেই সেটা বোধহয় দিশ জানে না। অস্বস্তি এড়াতে হাতের ইশারায় ধীর তাকে কাছে এসে বসতে বলল। দরজা ছেড়ে তার সামনে এল বটে কিন্তু চেয়ারে বসল না। ওই প্রথম তার গুরুজির মেয়েকে ভাল করে দেখল সে। চৌকো মুখ, চাপা নাসিকা, পুরু ঠোঁট জুড়ে চওড়া মুখ দেখে পালোয়ান বলে ভুল হয়। শরীরের গঠন তবু বেশ আকর্ষণীয়, ভারী ও পেশিবহুল। উটের কুঁজের মতো নিতম্বের উত্থান। আঠারো-উনিশের বেশি বয়স নয় অথচ এরই মধ্যে মাথায় নগলির সমান। বোবা হলেও তার চেহারা এক নাগাড়ে প্রচুর কথা বলে। দিশের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল ধীর। দিরাং-এর কাছে তার যাওয়া দরকার তাই পিঠে ন্যাপ তুলে দরজার কাছে গিয়ে দেখল চা হাতে নিয়ে দিশ। অর্থাৎ ওরই মধ্যে ও বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল সে খেয়াল করেনি। চায়ে চুমুক দিয়ে ধীরের মনে হল দিশ সম্ভবত তাকে কিছু বলতে চায়। ইশারা করে জানতে চাইল—কুছ বোলনে মাঙ্গতা, দিশ?

কোনও উত্তর এল না শুধু টেবিলের উপর রাখা তিনটে দশ টাকার নোট দেখিয়ে দিল। ঘর খুলে ওগুলো দেখলেও দিশ তুলে নেয়নি। যতই হোক গুরুজির মেয়ে। এসব বোধ তো তার মধ্যে থাকাই স্বাভাবিক। খুব ভাল লাগল ধীরের। তিনটে নোট ওর হাতে দিতেই যাকে বলে পগার পার।

ধীরের মনে হল, বিভিন্ন কারণে দিশ স্বভাব-চরিত্রে কিছুটা অস্বাভাবিক। অশুভ শক্তিফক্তি নয় শারীরিক প্রবণতাই দিশের কাছে এক মূর্তিমান বিপদ। মোটা দাগের ভাবনাচিন্তার মানুষজন

এদের যোনিমুখি মেয়ে বলে গণ্য করে থাকে। তবে সে নিশ্চিত নয়, তার ভুল হতে পারে।

সানজিধামে দিশের মেয়াদ কেন স্থায়ী হয়নি, অনুমান করতে পারে ধীর। দিশকে নগলি নিজের কাছে রাখতে পারত। সে ছাড়াও দিশের মা মুলকি তাকে আগলে রাখতে পারত। এমন একটা বোবা মেয়ে ভরা যৌবন নিয়ে নিরাশ্রয়! সে গেল আশ্রমে। আশ্রম থেকে সানজিমাতা তাকে পাঠালেন কি'না মাতালের ঠেক কেনির হোটেলে। ওখানে তো যুবতী মেয়ে দেখলে মানুষজন গিলে খেতে চায়। মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে মেয়ের মা। কই এ নিয়ে তো নগলি তাকে একটা কথাও বলেনি। সে শুধু টাকা ঢেলে মেয়েটাকে কোনও মতে উপত্যকার বাইরে চালান করে দিতে চায়। প্রচুর রহস্য ধরা পড়ে যা আড়াল করতে চায় নগলি। হয়তো তার কারণও মজুদ। তবে রহস্যভেদের পথে ধীর আর নেই। ওই করতে গিয়ে সে নগলির ভাষায় 'লাথ্' খেয়েছে। এখন তার সতর্ক হওয়ার পালা।

শীতের মরসুমের জন্য সংগ্রহ করা কাঠ থাকে থাকে সাজাতে ব্যস্ত ছিল দিরাং। খোলা বারান্দায় গিয়ে বসল ধীর। আড়চোখে তাকে দেখলেও কাছে এল না সে। তবে চোখা মন্তব্য করতে দেরি করল না।

"অব তো আপ নগলিকি পাস ডেরা লিয়া। দিরাং-সে ক্যায়া মতলব আপকা?"

এই হচ্ছে মুসকিল! দিরাং-এর বক্তব্য হল, এখন তো আপনি নগলির সঙ্গে থাকতে শুরু করেছেন। তা হলে দিরাং-এর সঙ্গে আবার কীসের দরকার?

একরাত নগলির ঘরে থাকলে ভদ্রলোকের মান যায়। সবার কাছেই নগলি চরিত্রহীনা, দুষ্টু, অসৎ ও লোভী। পুরুষমানুষ দেখলেই ছিঁড়ে খায়। অথচ এর কোনওটাই ঠিক নয়। তার মতো ভদ্র, সৎ, দয়ালু ও নির্লোভী মহিলা খুব কম দেখা যায়। সারা জীবন যাঁর প্রেমে সে মজে থাকল তিনিও তাকে বিশ্বাস করে ঘরে তুলতে পারলেন না। কার কাছে নিজেকে কতটুকু আলগা করতে হয় তা না জানলে আজ সে তার পায়ের তলায় শক্ত জমি পেত না। কিন্তু কাকে বোঝাবে সে কথা। অবশ্য এমন ধারণাকে খণ্ডন করতে নগলিও নিজেকে সংযত করেনি। উল্টে ওই প্রচার যাতে সত্যি বলে মনে হয় তার চেষ্টাই করে গেছে। সেই কারণেই তার ধাবার নাকি এত রমরমা। হতে পারে। ওসব নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথা নেই। দিরাং-এর মন্তব্যকে কোনও গুরুত্ব দিল না ধীর। আসল কথাটা সে পেড়ে ফেলল।

"কালই তোমাকে আমার সঙ্গে মাতরা যেতে হবে। দু'জন লোক আজই ঠিক করে ফেল যারা মালপত্তর উপরে পৌঁছে দিয়ে আসবে।"

দিরাং ঘোর বিস্ময়ের মধ্যে পড়ে গেল। কী কথা থেকে তার সাহেব কোথায় চলে এল

ধরতে পারল না। কালই মাতরা যাওয়ার সব ব্যবস্থা করতে হবে — বলে কী সাহেব!

— কলহি মাতরা চলনা?

— হ্যাঁ, কাল সকালেই রওনা। মাতরা যাওয়াব কথা কেউ যেন জানতে না পারে। কুলিদেরও বলার দরকার নেই। মনে থাকবে?

চুপ করে থাকল দিরাং। ধীরের মনে হল, তার কিছু অসুবিধে আছে।

— ব্যাপার কী, দিরাং? কোনও অসুবিধে আছে?

— কল সুব্‌বে বিনতিকি ভাই আনেওয়ালা সাব্‌।

রেগে গেল ধীর। বেকার বসে সময় নষ্ট করতে ওস্তাদ।

— তাতে কী হয়েছে! বিনতির ভাই এল তো তোমার কী? লালাজির দোকানে মালপত্তর রাখা আছে। সন্ধের মধ্যে নিয়ে চলে আসবে।

দিরাং কোনও কিছু বোঝার আগেই ধীর ঢাল ধরে নীচে নেমে এল।

বড় রাস্তায় নেমে পরিষ্কাব পোশাকে স্থানীয় মানুষজনকে সে আশ্রমের দিকে যেতে দেখল। তার মনে হল সানজিধামে কোনও বড়সড় উৎসব চলছে। ওই উৎসবে যোগ দিতেই কি সানজিমাতার জরুবি তলব?

হোটেলে ঢুকেই সে আপাং-এর সামনে পড়ে গেল। প্রায় আক্রমণ করে আর কী।

— শেষ পর্যন্ত তুমি নগলির ঘরে রাত কাটালে? মাচদার লোকজন জানলে কী ভাববে বল তো?

ভয়ানক বিরক্ত হল ধীর। উপত্যকার ছিনকেমি ভালই রপ্ত করে নিয়েছে আপাং কেনি।

— কে কী ভাবল সে নিয়ে আমি কখনও ভাবি না, আপাং ভাই। তোমার অন্য কোনও কথা আছে?

কথার ঝাঁজে কিছুটা ভাজা ভাজা হল কেনি। এতটা আশা করেনি সে। ভেবেছিল বিশওয়াসদাদাকে চাসু উপত্যকার সহবত সম্পর্কে কিছুটা পরামর্শ দেওয়া যাবে।

—নাংগেলভাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, জান তুমি?

— গুরুজির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

— ভাল ভাল, খুব ভাল। তোমার আসল লোক তো নাংগেলভাই।

— তোমারও, সেটা ভুলে যেও না।

— নিশ্চয়ই, একশবার।

ওই সুযোগে দিশের ব্যাপারটা তুলল ধীর।

— বিনতি যে দিশকে কিছুটা সময় আগলে রাখবে তার কী হল? ওকে এখানে একা রেখে তুমি ঘুরে বেড়াও। কোনও বিপদ হলে তুমি কিন্তু রেহাই পাবে না।

হাসল কেনি। তারপর মুখ উঁচিয়ে ধীরের দিকে তাকাল।

— ও মেয়ের জন্যে তোমার ভাবার দরকার নেই বিশওয়াস দাদা। ও নিজের দেখভাল ভালই করতে পারে।

চুপ করে গেল ধীর। তবে আপাং-এর কথায় সে যে অবাক সেটা আড়াল করতে পারল না। দিশকে নিয়ে তার কয়েকদিন আগেকার আশঙ্কার লেশমাত্র ধরা পড়ল না। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে দৃশ্যপট আমূল বদলে গেছে বলে মনে হল তার। অথচ দিশকে নিয়ে ধীরের শঙ্কা বাড়ল বৈ কমল না। সেই সুযোগে কেনি মূল কথাটা জানিয়ে দিল।

— শোনো, মাতাজি আশ্রমে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আর এক মিনিটও তোমার এখানে থাকা চলবে না।

কেন মাতাজির ধীরের জন্য জরুরি তলব তা কেনিও জানে না। ইরিকা ম্যাডাম পাহাড় থেকে ফেরার পর থেকেই নাকি সানজিমাতা ধীরকে হন্যে হয়ে খুঁজে চলেছেন। কেনির ধারণা ওই অভিযানে কিছু ঘটে থাকতে পারে। ধীরের অবশ্য তা মনে হয় না। অভিযান থেকে ফেরার পথে ইরিকা টোর তো তাকে তেমন কিছুর আভাস দেননি। তা ছাড়া, যদি কিছু ঘটেও থাকে তাতে ধীরের কী করার আছে। আর ওই অভিযান নিয়ে সানজিমাতারই বা কী যায় আসে। আপাং কিছুক্ষণ আগেও আশ্রমে ছিল। সে মাতাজিকে কথা দিয়ে এসেছে দেখা হওয়া মাত্র বিশওয়াস দাদাকে সে তাঁর কাছে হাজির করবে। নগলি মারফত মাতাজি জেনে গেছেন যে ধীর তার গুরুজির কাছে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে মানজু সালান নাকি লুনি রওনা হয়ে যায়। সত্যিই অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার। কত দাম তার চাসুতে, ছোট্ট তিন ছটাক ভূ-তলে। কলকাতায় যে ডাস্টবিন চাসুতে সে ...!

হঠাৎ ধীরের মনে একটা আশঙ্কা দেখা দিল। যদিও খুব একটা স্পষ্ট নয় তবু তার চেহারা অনেকটাই আশঙ্কার মতো।

— তোমাকে কি বিশ্বাস করে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

অবাক হল কেনি। মুখটা সত্যিই ফ্যাকাসে হতে থাকল।

— এমন কথা তুমি বলতে পারলে!

— পারলাম কারণ ক'দিন আগেই তো তুমি আমাকে হোটেল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, মালপত্তর দিতে চাওনি।

খুব অসহায় বোধ করল কেনি।

— আমার কোনও উপায় ছিল না, বিশ্বাস কব।

— করলাম। এখন বল তো, দু'দিনের জন্য মাতাজির ঘনিষ্ঠ হলে পরে কোনও অসুবিধে হবে না তো?

ভাবল কিছুক্ষণ কেনি। মিনিট দুই পর তার দিকে সে মুখ তুলে তাকাল।

— হওয়ার কথা নয়, তবে হতেও পারে।

— তা হলে?

— তেমন কিছু হলে তুমি যাতে হাতে আটচল্লিশ ঘন্টা সময় পাও সেটা আমি দেখব। তার মধ্যে তোমাকে চাসু ছেড়ে যেতে হবে। ঠিক?

— ঠিক।

সানজিধামে যাওয়ার সময় সান্ত্রীর মতো ধীরের পিছনে থাকল মহাবলী শেঠ আপাং কেনি। সানজিমাতা যার সহায় তাকে ঠেকায় কে।

ধামের চৌকাঠে পা ফেলা মাত্র ধীর সবার নাগালের বাইরে চলে গেল। আগে একবারই সে সানজিধামে এসেছিল। তখন সেভাবে আন্দাজ করার সময় পায়নি। বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না কিন্তু ভিতরে বিশাল এলাকা জুড়ে ধাম। যেখানেই মাথা তুলে বাসগৃহ সেখানেই তলায় আণ্ডারগ্রাউণ্ড চেম্বার। ওখানে মাটির তলায় এত ঘর থাকার কী প্রয়োজন ভেবে পেল না ধীর। শীতকালে পাঁচমাস ধরে পুরো এলাকা যখন বরফে ঢাকা থাকে তখন হয়তো ওই ঘরগুলো কাজে লাগে। কিন্তু তাই বলে সংখ্যায় এত!

এঘর ওঘর এ-দালান ও-দালান পেরিয়ে ধীরকে সঙ্গে নিয়ে এক আশ্রমিক মহিলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাকে সেখানে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তিনি প্রস্থান করতেই তার সামনে হাজির হলেন অন্য এক আশ্রমিক। মুখ ছাড়া এদের আর কিছুই দেখা যায় না।

জুতো খুলে পায়ে স্লিপার পরতে হল তাকে। তারপর সেই দরজা খুলে মহিলাটি তাকে নিয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ড কক্ষে ঢুকে পড়লেন। পর পর দুটো বারান্দা পেরিয়ে ফের তারা এসে দাঁড়ল আর একটা দরজার সামনে। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকার নির্দেশ দিয়ে আশ্রমিক মহিলাটিও অদৃশ্য হলেন। দরজা খুলে ঢুকতেই ধীর দেখতে পেল পনেরো বাই বিশ মাপের একটা চমৎকার ঘর। তবে আসবাবপত্রের কোনও বাহুল্য নেই। চোখটা ফিকে অন্ধকারের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় লাগল তার। তারপরই চমক।

সানজিদেবীর পোশাক দেখে অবাক হল ধীর। স্থানীয় মেয়েদের মতো পাট্টু আর ব্লাউস পরিহিতা অবস্থায় চেয়ারে বসেছিলেন তিনি। তাঁর অঙ্গে এমন বসন অভাবনীয় ব্যাপার। তিনি মাতা — তিনি কেন ঘরেলু মেয়েদের পোশাক পরবেন! তবে তাঁর কোনও কিছু নিয়ে কথা চলে না। সুতরাং তার দৃষ্টি অন্যত্র সরে যেতেই সে ইরিকা টোর-কে দেখতে পেল। মাতাজির জায়গা থেকে সামান্য দূরে। তিনি কাঠের চেয়ারে। মাত্র একটাই খালি চেয়ার ঘরের মাঝখানে রাখা, দেবীমাতার কথা বলা দূরত্বের মধ্যে। খালি চেয়ারে গিয়ে বসল ধীর। ঘরে ঢোকার সময় কেউ তাকে সম্ভাষণ জানায়নি। সে-ও কাউকে সম্ভাষণ জানাল না। সে চেয়ারে বসতেই সানজিদেবী নড়েচড়ে বসলেন। এবার সেই সওয়াল-জবাবের পালা, জানে ধীর। প্রশ্ন শুনে যত সংক্ষেপে সম্ভব তার উত্তর দেওয়ার কাজ তার সামনে। কোনও অবস্থাতেই তার পাল্টা প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। তা করার অর্থ যে মাতাজিকে অসম্মান করা সেটা ভালভাবেই জানে সে। হঠাৎ-ই মাতাজি মুখ খুললেন।

— আপনার জন্য আমরা বেশ কয়েকদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি। এত দেরি হল আপনার?

— আপনি যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন সে খবর আমি এই মাত্র আপাং কেনির কাছে পেলাম। দেরি হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত।

— এত বড় একটা অভিযান করে ফিরে এলেন অথচ আপনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন না। ভেবেছিলাম আপনি নিশ্চয়ই আসবেন।

অবাক হল ধীর। তার মতো একজন অতি সাধারণ মানুষকে মাতাজি এতটা গুরুত্ব দিতে পারেন বিশ্বাস হচ্ছিল না তার। অথচ তার কাছে এমন কোনও জুতসই কথা নেই যা বলে মাতাজিকে খুশি করা যায়। বেশ বেকায়দায় পড়ে গেল ধীর বিশ্বাস।

— ইরিকা ম্যাডামের অভিযান যখন নীচে নামছিল তখন দিরাং ও আমি কিছুটা সময় ছিলাম ওদের সঙ্গে। ফেরার সময় দিরাং আশ্রমে এসেছিল।

— কিন্তু আপনি আসেননি। রাস্তায় বসেছিলেন।

এক দেবীমাতার পক্ষে এমন ভয়ানক উষ্মা মোটেই শোভনীয় নয়। কারণ বিচার করে দেখলে খুবই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। কিন্তু তবু ধীরকে আত্মসমর্পণ করতে হল। চাসু উপত্যকায় দাঁড়িয়ে সানজিদেবীর উষ্মার কারণ হওয়া মোটেই নিরাপদ নয়।

— আমি সমতলের মানুষ। অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। সেদিন খুব ক্লান্ত ছিলাম তাই আসতে পারিনি। এতে আপনি আঘাত পেয়ে থাকলে আমি ক্ষমা চাইছি।

মাতাজি সন্তুষ্ট হলেন কি না বোঝা গেল না কিন্তু তিনি প্রসঙ্গ বদলে দিলেন। ধীরের মনে হল, আপাতত সহজ-সন্ধি তিনি মেনে নিলেও এমন বেযাদপি পরের বার তিনি বরদাস্ত করবেন না।

— নাংগেল তাফা-কে কেমন দেখলেন?

— ভাল না। তাঁর শরীর খুব ভেঙে পড়েছে। প্রতিদিন রাতের বেলায় তাঁর জ্বর হয়। খুব চিন্তার বিষয়।

কিছুক্ষণের জন্য কথপোকথন বন্ধ হয়ে থাকল। ধীরের মনে হল মাঝপথেই বোধ হয় ইনটারভ্যু শেষ। হঠাৎ আবার কথা শুরু করলেন সানজিদেবী।

— আমাদেরও খুব চিন্তা হয়। আশ্রমের আয়ুর্বেদ সেন্টারেব উনি চিফ কেমিস্ট। উনি হঠাৎ চলে গেলে জড়িবুটির গুণাগুণ বোঝার মানুষই থাকবে না। সেন্টার অচল হয়ে পড়বে।

— চিফ কেমিস্ট!

— হ্যাঁ, উনি আমাদের চিফ কেমিস্ট। উনার নির্দেশ ও পরিচালনায় সব ওষুধ তৈরি হয়। কেন, আপনি জানতেন না?

— না, আমি জানতাম না। হয়তো আমাকে বলার প্রয়োজন বোধ করেননি। তবে পাহাড়ে গেলে শেকড়বাকড় সংগ্রহ করার যে শখ ছিল গুরুজির এটা জানি।

— কিছুদিন ধরেই একজনকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করতে চাইছেন নাংগেল তাফা। বোধহয় উনিও সেন্টারের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই এটা করছেন।

— নাংগেলজিকে আশ্রমে এনে রাখা যায় না?

— অসুস্থ বা দুর্ঘটনাগ্রস্থ না হলে কোনও পুরুষমানুষকে আশ্রমে রাখার কোনও বিধি নেই। আশ্রমের নিয়মে কাউকে অসুস্থ বলে রায় দিতে পারেন একমাত্র চিফ কেমিস্ট।

নাংগেল তাফা জীবিত অবস্থায় যে নিজেকে অসুস্থ বলে রায় দেবেন না এটা জানে ধীর। সেটা তো মাতাজিরও না-জানার কথা নয়। তা হলে তিনি কীসের মাতা!

—গুরুজি অসুস্থ আপনিও জানেন। আপনি আশ্রম প্রধান। আপনি চাইলে নিশ্চয়ই সেটা সম্ভব।

— আমিও নিয়মে বাঁধা। নাংগেল তাফা যতক্ষণ না নিজেকে অসুস্থ বলে ঘোষণা করছেন ততক্ষণ আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

চুপ করে যায় ধীর। আরও তেড়েফুঁড়ে কিছু বলার ইচ্ছে হয়েছিল তার কিন্তু সেটা রীতিবিরুদ্ধ। হঠাৎ ইরিকা টোরকে দেখতে পেল সে। তিনি যে ঘরের মধ্যেই ছিলেন এটা তার মনেই পড়েনি। সানজিদেবীর কোনও সহকারি ঘরে নেই অথচ উনি আছেন। অবাক হওয়ার মতোই ব্যাপার। চোখ চাওয়া-চাওয়ি করার মুহূর্তে ধীরের মনে হল ইরিকা ইশারায় মাতাজিকে কী যেন বলতে চাইছিলেন। সে কোনও কিছু দেখতে চাইল না শুধু অপেক্ষা করে থাকল। কয়েক সেকেণ্ড পর মাতাজির কণ্ঠস্বর শুনে সে মুখ তুলে তাকাল।

— আপনাকে যে জন্যে এখানে ডাকা হয়েছে সে ব্যাপারে এবার ইরিকা টোর কিছু বলবেন।

তার মানে এতক্ষণ যে সব কথাবার্তা হল সেগুলো আসল কথাই নয়! ধন্দে পড়ে গেল ধীর বিশ্বাস। গলাটা ঈষৎ চাপ দিয়ে ইরিকা বোধহয় নিজেকে তৈরি করে নিলেন।

— সেদিন যা ঘটেছিল তার জন্য আমি দুঃখিত ধীর।

ধীর চুপ করে থাকল। ইরিকা সানজিদেবী নন সুতরাং সে অনায়াসে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে পারত। সানজিমাতা চোখ বন্ধ করে থাকলেন। হয়তো তিনি সব কথা মনযোগ দিয়ে শুনতে চান তাই মুদ্রিতনেত্র হলেন। ইরিকা মৃদু শব্দ করে ফের কণ্ঠে আওয়াজ তুলে নিলেন।

— ফেরার সময় তাড়াহুড়োতে আমার পাসপোর্ট কোথাও পড়ে গেছে। আমি তোমার সাহায্য চাই। কিছু সময় তোমার নষ্ট হবে। সময় তোমায় ফিরিয়ে দিতে পারব না তবে আমি পুরো খরচ দিতে চাই।

মহিলার স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল ধীর। প্রচণ্ড রাগ হল তার সানজিদেবীর উপর। নিজেকে ভাবেন কী দেবীমাতা! তা হলে পাসপোর্ট খোঁজার মহান দায়িত্ব দিতেই হঠাৎ তলব! নিজেকে সংযত করল ধীর। দু'জন দামি মহিলা তার সামনে স্বভাবতই সৌজন্যবোধ হারানো অনুচিত কাজ।

— তোমার হাতে সময় না থাকতে পারে। তুমি না বলতেই পার। সেক্ষেত্রে আমাকে অন্য উপায় বের করতে হয়। পাসপোর্ট থানায় জমা রাখার কথা কিন্তু আমি তা করিনি। কড়া শাস্তি হতে পারে আমার।

ধীর শান্ত হয়ে গেল। ইরিকা টোর-এর মুখে অসম্ভব ক্লান্তির ছাপ দেখতে পেল সে।

— আপনি কি এই পাসপোর্ট খুঁজে দেখার জন্য আমাকে মাতরা হিমবাহে যেতে বলছেন?

— না, যেতে বলছি না। যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

কথার মারপ্যাঁচ। সেটা যখন কোনও মহিলার কাছ থেকে আসে তখন অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। কেন জানি তার মনে হল শুধু পাসপোর্ট নয় আরও কিছু খোয়া গেছে ইরিকার।

— শুধু পাসপোর্ট?

সানজিদেবী ইরিকা-র দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে তাকালেন।

— পাসপোর্টের সঙ্গে দশ হাজার টাকাও থাকার কথা। তবে পাসপোর্ট না পেলে আমি মহা সমস্যায় পড়ে যাব।

মাতরা হিমবাহের বিশাল প্রান্তরে একটা ছোট্ট নোটবুক সাইজের পাসপোর্ট খুঁজে বের কবার দায়িত্ব সত্যিই অভিনব ব্যাপার। খড়ের গাদায় সূঁচ খুঁজে বের করা তার চেয়েও অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ বলে মনে হল ধীরের। তবু শুধু পাসপোর্ট হলে তাও একটা সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তার সঙ্গে টাকা মানেই পরিস্থিতি হাতের বাইরে।

— বিশেষ নির্দেশে কালই আমি মাতবা অঞ্চলে যাব বলে ঠিক করেছি। ওই সময় আপনার পাসপোর্ট খোঁজার যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কথা দিচ্ছি। তবে ওই ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন কবতে চাই।

এমন আশঙ্কা বোধহয় করেছিলেন ইরিকা। তাঁব প্রবল আপত্তির কথা জানিয়ে দিলেন।

— না, এ ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করা চলবে না। সোনামকে ফেলে আমি যেতে চাইছি না তবু তুমি চাইলে আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি।

— আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত সোনামকে ছেড়ে আপনি কোথাও যাবেন না। আমার মনে হয় না ওই পাসপোর্ট আপনি ফিরে পাবেন। তবু আমার উপর আপনাকে আস্থা রাখতে হবে। এবং আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তরও আপনাকে দিতে হবে।

সানজিদেবী এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। হঠাৎ তাদের দু'জনের কথার মধ্যে তিনি ঢুকে পড়লেন। ধীরের মনে হল, পাসপোর্টের চেয়েও ওই দশ হাজার টাকার হদিশ পেতে তিনি বিশেষভাবে আগ্রহী।

— টাকা ও পাসপোর্ট খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে এমন কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর না পেলে উনি কীভাবে এগোবেন।

দ্বিধা কাটিয়ে ইরিকা ধীরের দিকে তাকালেন। সানজিদেবী স্থির হয়ে অপেক্ষায় থাকেলেন।

— বলো, কী জানতে চাও?

— কাউকে আপনি সন্দেহ করেন?

— না।

— আপনাদের সঙ্গে কয়েকজন মালবাহক ছিল। ঘটনা ঘটার সময় কি তারা আপনাদের কাছাকাছি ছিল?

— কোথায় হারিয়েছে ঠিক জানি না। মনে হয় উপরের ক্যাম্পেই কোথাও। ওরা কেউই সেখানে ছিল না।

— কতটা উপরে, কোনদিকে আপনারা এগিয়ে যাচ্ছিলেন?

— মাতরা হিমবাহের বামদিকে আমরা ঢুকেছিলাম। মালবাহকরা আমাদের নির্দেশ পেলে এগিয়ে যেত। তারা নীচের ক্যাম্পে অর্থাৎ দু'টি নালার মিটিং পয়েন্টে অপেক্ষা করছিল।

—বামদিকে অর্থাৎ পশ্চিমে কতটা এগিয়ে আপনারা ক্যাম্প করেছিলেন?

— মূল হিমবাহে আমরা পৌঁছাতে পারিনি। আবহাওয়া আচমকা খারাপ হওয়ায় হিমবাহ থেকে অনেকটা দূরে ক্যাম্প করতে বাধ্য হই।

— জায়গাটা চেনার কোনও সহজ উপায় আছে? কোনও ল্যাণ্ডমার্ক?

— বড় বোল্ডার আর টুকরো পাথরঘেরা অঞ্চল। চেনা মোটেই সহজ নয়।

— বামদিকের নালা থেকে আপনাদের ক্যাম্প কতদূরে ছিল বলে মনে হয়?

— কাছেই। খুব বেশি হলে পনেরো-বিশ ফুট হতে পারে।

— ক'দিন ছিলেন ওই ক্যাম্পে?

— দু'দিন।

এবার ভাবতে হল ধীর বিশ্বাসকে। পরের প্রশ্নেই ক্লু উঠে আসার মৃদু সম্ভাবনা। তাই ইচ্ছে করেই বেশি সময় নিল। আড়চোখে ধীর দু'জনের দিকে তাকিয়ে দেখল। তার প্রশ্ন করার পদ্ধতি দু'জনের মুখেই জোরালো ছাপ ফেলেছিল।

— চিকুর দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটেছিল?

— ওই সময় আমি ওর কাছাকাছি ছিলাম না। দ্বিতীয় দিন সন্ধের সময় তুষারপাতের মধ্যে বাথরুম করতে গিয়ে সোনাম বোল্ডার সহ নীচে গড়িয়ে পড়ে।

— তারপর?

— অনেকক্ষণ ধরে ও আসছে না দেখে আমি তুষারপাতের মধ্যেই ওকে খুঁজতে বেরোই। ক্যাম্পের নীচে গোঙাতে দেখে ওকে আমি তাঁবুতে নিয়ে আসি।

— জায়গাটা আপনাদের ক্যাম্প থেকে কতটা দূরে?

— সেটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

— চিকু সারারাত যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছিল, তাই না?

— চিৎকার-চেঁচামেচি ও বেশি করে না। তবে খুব কাতর বোধ করছিল।

— আপনারা সম্ভবত রাত থাকতেই নীচে নামতে থাকেন।

— হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি অবশ্য ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সোনাম আর থাকতে চাইছিল না।

— কারণটা কী হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

— পাথরের উপরে সোনাম ভাল করে পা ফেলতে পারছিল না। তাই হয়তো ও তাড়াতাড়ি সমতলভূমিতে যেতে চাইছিল। সামান্য চলার পর ওকে যে তুলে নিয়ে যেতে হয় সেটা তুমিও দেখেছ।

— এখন কেমন আছে সোনাম?

— হাঁটুর ফোলাটা বেশ কমে গেছে। যতটা মারাত্মক আঘাত বলে মনে হয়েছিল ততটা নয়।

— আপাতত নিশ্চয়ই আপনাদের আর মাতরা হিমবাহে যাওয়ার পরিকল্পনা নেই?

— আমি এখনও ভেবে দেখিনি।

— সোনাম?

— অনেকদিনের স্বপ্ন সোনামের। মোটামুটি সুস্থ হলেই ও ফিরে যেতে চায়।

— পাসপোর্ট হারানোর কথা আর কাকে বলেছেন?

— আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানে না।

— আর কাউকে বলবেন না। আমি যে মাতরায় যাচ্ছি সেটাও গোপন রাখবেন।

দীর্ঘ সওয়াল-জবাব পর্ব শেষ করে ধীর তার ঘড়ির দিকে তাকাল। সানজিদেবীর সম্মতি ছাড়া উঠে পড়া রীতিবিরুদ্ধ কিন্তু সে এবার উঠতে চায়। কপাল ঠুকে প্রশ্নটা করেই ফেলল ধীর।

— আমি কি এবার উঠতে পারি?

মুহূর্তের মধ্যে চিত্রপট ঝলসে উঠল। সানজিদেবী তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে তাকালেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইরিকা তাঁর ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে চুপ করে থাকার নির্দেশ দিলেন। নির্বোধের মতো সে যে একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে তা সে বুঝতে পারল। মাতাজির সামনে বসে নিজে থেকে কেউ উঠে পড়তে চায় না। সবাই তাঁর ইচ্ছার অধীন। মাতাজি জানতে চাইলেন।

— কেন, আমাদের সঙ্গ আপনার ভাল লাগছে না?

থতমত খেয়ে গেল ধীর। কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারল না। এবার আসরে নামলেন ইরিকা টোর। মনে হল তাকে তিনি কৌশলে আড়াল করলেন।

— আমি কি তোমাকে দু'টো প্রশ্ন করতে পারি?

— নিশ্চয়ই পারেন।

— নগলি দাকাত-এর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নিয়ে একটা গুঞ্জন উঠেছে। ব্যাপার কী বল তো?

কারও ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে এমন প্রশ্ন কেউ করতে পারে তার ধারণা ছিল না। কিন্তু ধীরের মনে হল, প্রশ্নটা ইরিকার নয়। নগলিকে তিনি চেনেন না। সুতরাং সে বলতে বাধ্য হল।

— নগলি আমার খুব ভাল বান্ধবী। তার বাল্যকাল বঙ্গভূমিতে কেটেছে। আমার মাতৃভাষায় সে কথা বলতে পারে। আমাদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক।

ইরিকা সানজিদেবীর দিকে তাকালেন। চোখের ওঠানামা কী সঙ্কেত পাঠাল ধীর বুঝতে চেষ্টা করল না। ইরিকা তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্নে চলে গেলেন।

— কী উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি মাতরা হিমবাহে যাচ্ছ?

— বুঝতে চেষ্টা করা মাতরা রেঞ্জ দিয়ে ডোলি উপত্যকায় পৌঁছানো সত্যিই সম্ভব কি না। সোনামের দাবি কতটা যুক্তিসঙ্গত। সেটা সম্ভব হলে তার জন্য কেমন ক্লাইম্বার হওয়া দরকার।

— তুমি কি গাইড নাকি যে তোমার কথা সবাইকে মেনে নিতে হবে?

ইরিকার মতো মহিলার মুখে এমন কথা মানায় না। কেন তার এমন প্রতিক্রিয়া তা অবশ্য ধীরের বুঝতে অসুবিধে হল না। খুব নরম করে সে এবার ইরিকা ম্যাডামের দিকে তাকাল।

— না, আমি গাইড নই। তবে কে আমার কথা মানল বা মানল না তাতে আমার কিছু যায় আসে না। যাঁর নির্দেশে আমার এই যাওয়া তিনি মানেন।

কিছুটা বেপরোয়া ভাব নিয়ে এবার ধীর সত্যিই উঠে পড়ল। দু'কদম এগিয়ে যাওয়ার পরই সে ইরিকা-র চিৎকার শুনতে পেল।

"ওভাবে পিছন ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে মাতাজিকে অপমান করা হয়, তুমি জান না?"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে সামনে মুখ করে দাঁড়াল সে। প্রথমবার কীভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল তার মনে পড়ল না। মেমসাহেবের মাতাজিপ্রীতি সম্ভবত সানজিদেবীকেও অবাক করেছিল। তিনি ধীরের দিকে তাকিয়ে স্মিতহাস্য উপহার দিলেন।

"ধর্মস্থানে কিছু বিধান থাকে। যিনি প্রধান হন তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান জানানো এমন এক অনিবার্য বিধান। তবে আপনাদের কাছে আমি দেবী নই। আমার নাম 'আনজু'। নিভৃতে আপনারা আমাকে আনজু বলেও ডাকতে পারেন।"

অবিশ্বাস্য বলে মনে হল ধীর বিশ্বাসের।

দেবীত্বের চাপে কি তা হলে মাতাজির শ্বাসরোধ হয়ে পড়ছে? তিনি কি খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে সবার সঙ্গে এক পলকের জন্য মিশে যেতে চান? ঘোর যৌবনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত মাতৃত্বের বোঝা বইতে গিয়ে তিনি কি ক্লান্ত বোধ করছেন?

আবেগ সরিয়ে সানজিদেবীর মনের ভাষা পড়তে চেষ্টা করল ধীর। বুঝল, তার ভাবনা অমূলক। ওসব কিছুই নয়। তিনি বাস্তববাদী, বিচক্ষণ মহিলা। এক অর্থে ইরিকা এবং ধীর দু'জনই তাঁর কাছে বিদেশি — দূরাগত অতিথি। তাদের কাছে দেবী হয়ে থাকলে তাঁর লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি। তাই বন্ধু হতে চান। আদতে ষোলোআনাই তিনি দেবী, মাতা। তাই-ই

তাঁর ভবিতব্য।

"কী করছ তুমি ধীর! দেখছ না আনজু হাত বাড়িয়ে দিয়েছে?"

কাল বিলম্ব না করে সে সানজিদেবীর ডান হাতটি দু'হাতের মধ্যে নিয়ে নিল। মুহূর্তের জন্য দেবীমাতা দু'চোখ বন্ধ করে তাকালেন।

"তোমার কি কোনও দিন বুদ্ধি হবে না! ওভাবে হাত ধরেছ কেন? তুমি আনজু-র হাতের পাতায় চুমো খাও।"

ইরিকা টোর আশ্রমের আদবকায়দা সত্যিই নিখুঁতভাবে রপ্ত করেছেন। অবাক হতে হল তাকে।

সানজিদেবীর হাতের পাতায় চুমো খেল ধীর। এত সুন্দর নরম হাত যে একটু বেশিক্ষণই ধরা থেকে গিয়েছিল। হয়তো তাঁর অস্বস্তি হয়েছিল তবে তিনি হাত সরিয়ে নেননি। তারপর নিমেষের মধ্যে তিনি দরজা দিয়ে অদৃশ্য হলেন। তারা দু'জন বেরিয়ে আসতেই এক আশ্রমিক মহিলা তাদের পথ দেখিয়ে আশ্রমের বাইরে নিয়ে এলেন। মহিলাটি চলে যাওয়ার পর তারা দু'জন উপাসনাস্থল থেকে সিঁড়ি দিয়ে খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়াল। প্রচুর ভক্ত সমাবেশ তাই কণ্ঠস্বর খাটো করলেন ইরিকা।

— আজ আনজু'র জন্মদিন। এক সপ্তাহ ধরে আশ্রমে উৎসবের মেজাজ। এ সময় তোমাকে আমার কাজ নিয়ে উপরে যেতে হচ্ছে।

— আমারও কাজ আছে ম্যাডাম।

— সেটা পরেও করা যেত।

— না, করা যেত না।

একটু অপেক্ষা করে আবার শুরু করলেন ইরিকা টোর।

— তুমি কিন্তু আমার কাছে কিছু টাকা নিতে পারতে।

— দরকার পড়লে ফিরে এসে নেব।

হাসলেন মেমসাহেব।

— তোমার কাজটা কিন্তু মোটেই সহজ নয়। তুমি কিন্তু ফিরে নাও আসতে পার।

ধীর সহজ হতে চাইল। কিন্তু ওই প্রথম তার মনে হল, ম্যাডাম খুব একটা ভুল বলেননি। সামান্য এদিক ওদিক হলে সেটা ঘটেও যেতে পারে।

— সেক্ষেত্রে আমাকে যা দিতে চান সেটা আশ্রমে দান করে দিতে পারেন।

প্রসঙ্গ বদলে দিলেন মেমসাহেব।

— ক'দিন পর ফিরবে বলে মনে হয় তোমার?

— খুব বেশি হলে দশ দিন।

উত্তরটা শুনে নিয়ে ইরিকা আশ্রম অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। ধীর মাচদা যাওয়ার পথ ধরল।

চাসু উপত্যকায় এতবার এল ধীর কিন্তু মাতাজির কর্তৃত্বের ঢেউ যে এত ব্যাপক তা সে আগে কখনও টের পায়নি। এবার হাড়ে হাড়ে টের পেল। শুধু তাই-ই নয় মাতাজির কিছু কিছু ব্যাপার সত্যিই বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। উপত্যকায় ব্যবসা করতে হলে এখন মায়ের কৃপা জরুরি। তা না হলে পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলার ব্যবস্থা নাকি চোখের পলকে করা হয়ে যায়। আপাং কেনি যে আশ্রম ও মাতাজির উপর বেজায় খাপ্পা তা তার কথাতেই ধরা পড়ে। অথচ দেখলে মনে হয় সে যেন তাঁর প্রধান সেবায়েত। বেশ কিছুদিন ধরে অনেক চেষ্টা করেও আপাং মায়ের কাছাকাছি আসতে পারছিল না। আশ্রমের নির্দেশেই তাকে নাকি উপত্যকা থেকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছিল। সে সময় নাংগেল তাফা-র চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। গুরুজির যা অবস্থা এখন তাতে বিশেষ কারণে মাতাজিও তাঁকে অবহেলা করতে পারেন। কিন্তু মাত্র এক হাজার টাকার বিনিময়ে সোনাম চিকু নাকি আপাং কেনিকে খোদ মাতাজির সামনে পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়। অতি সামান্য শর্তের বিনিময়েই কেনির সমস্যা মিটে যায়। কেনির দৃঢ় ধারণা কোনও এক অজ্ঞাত কারণে মাতাজি চিকু-র কথা মানতে বাধ্য হন। এটা বিশ্বাস না করলেও একটা রহস্যের গন্ধ ধীর বিশ্বাসের নাকে এসে ধাক্কা মারল।

কে এই সোনাম চিকু? কী কারণে মাতাজি তার প্রতি এতটা নরম হতে বাধ্য হন?

মেমসাহেবের ব্যাপারটাও কেমন যেন ঝাপসা মনে হয় তার কাছে। তিনিও এক অজ্ঞাত কারণে সোনাম চিকু-র প্রতি দুর্বল। এত কথা বললেন কিন্তু তাঁবু থেকে দুর্ঘটনার স্থানটা ঠিক কত দূরে সেটা তাঁর মনে পড়ল না। অথচ ওই উত্তরটা মোটামুটি সঠিক হলে কাজটা সহজ হত। তবে মানতেই হয় সানজিদেবী বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে সাহায্য করে গেছেন। কোনও ভাবেই চিকুকে আড়াল করার চেষ্টা করেননি।

সানজিদেবীর সঙ্গে ইরিকা টোর-এর বন্ধুত্ব বোঝা যায়। কেনিব ধারণা যাদের প্রচুর থাকে তারা কিছুটা ছড়িয়ে মজা দেখতে চায়। ধীরের অবশ্য তা মনে হয় না। মেমসাহেবেরও

স্বার্থ আছে। কিন্তু সেটা কী তা সে জানে না। এসব নিয়ে অবশ্য তার শিরঃপীড়ার কোনও কারণ নেই। তার চিন্তা অন্যখানে। যেমন কারও কারও ইদানীং মনে হতে শুরু করেছে যে, মাতাজি বাঙালি বাবুর দিকে হঠাৎ বেশি করে চোখ তুলে তাকাচ্ছেন। ঠিক কী কারণে তিনি এটা করছেন তা কেউ জানে না। এমনকী সে নিজেও জানে না। প্রথম সাক্ষাতেই সানজিদেবী তাকে তাম্রধার পরিয়ে দিয়ে বন্ধু হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন এবং দ্বিতীয়বারই তাঁর নাম ধরে ডাকা-র অধিকার। ঘটনার অদ্ভুত এক পাকদণ্ডি ধরে ধীর বিশ্বাস অতি দ্রুত চাসু উপত্যকার প্রথম মহিলার খুব কাছে চলে এসেছে। আপাং কেনির মতে এমন ঘটনা মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। একমাত্র তার গুরুজির সঙ্গেই এ নিয়ে আলোচনা করা যেত কিন্তু সেটা সম্ভব নয় কারণ তিনি আশ্রমের আনুগত্যে বাঁধা।

মাতরা

দুপুর দেড়টায় ধীর দিরাং-এর ঘরে গিয়ে পৌঁছতে তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। মাতরা হিমবাহে যাওয়ার কথাটা তার মনে আছে কি না সেটা বুঝতেই আশ্রম থেকে সে সোজা দিরাং লাকা-র ডেরায় এসে হাজির হয়েছিল। সাহেবের নির্দেশ পাওয়ার তিন ঘন্টার মধ্যেই দিরাং শুধু দু'জন বিশ্বাসী মালবাহকই ঠিক করেনি মুখির কাছ থেকে পুরো মালপত্রও বুঝে নিয়ে এসেছে। সন্ধের সময় নিয়ে এলেও চলত কিন্তু কাজ ফেলে রাখতে চায়নি সে। দু'জনের জন্য সমান ওজন বানাতে তখন দিরাং ভয়ানক ব্যস্ত। অবাক হয়ে দেখছিল ধীর।

আগে দিরাং-এর কাজ ছিল মাল পিঠে তুলে পথ হাঁটা অর্থাৎ কুলির কাজ। পাহাড়ি মানুষজন মালবাহকদের কুলিই বলে থাকে। দিনে দিনে তার মধ্যে পরিবর্তনের ঢেউ এসে পড়ছে। একবার শুনে নিলেই বুঝতে পারে। অভিযানের সদস্যদের মতো হিসাব করে কাজ করে। কোথায় কীভাবে সবকিছু সাজিয়ে নিলে সুবিধে হয় তার কৌশল ভালভাবেই রপ্ত করে ফেলেছে দিরাং। আগে সে ছিল অনেকের মধ্যে একজন, এখন বন্ধুর পথে অপরিহার্য সাথী।

"সাবজি, কল সে মুঝে এক হপ্তা ধামপে রহনা পড়েগি।" মুখ তুলে তাকাতেই বিনতিকে দেখতে পেল ধীর।

মাতাজির জন্মদিন উপলক্ষে স্থানীয় মেয়েরা উৎসবের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে শ্রমদান করে থাকে। আগামীকাল থেকে এক সপ্তাহের জন্য তাই বিনতির ঠিকানা হবে সানজিধাম। ভালই হল, দিরাং-এর চিন্তা কমে যাবে। ধীরের কাছে খবর আছে দিরাং কিছুদিন ধরে তার বউ-এর জন্য ভাবনাচিন্তা করতে শুরু করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, ঘোর মাতাল দিরাং-কে সে অনেকদিন মাতাল হতে দেখেনি। দেশি দারুর বোতল হাতে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে না এমন দিরাং তার কাছে একেবারে নতুন মানুষ। এখনও খায় কিন্তু বাড়াবাড়ি করে না।

কাজের সময় দিরাং-কে সে অযথা বিরক্ত করতে চাইল না। ভোর চারটের মধ্যে সে পৌঁছে যাবে এটা জানিয়ে দিয়েই ঢাল ধরে বড় রাস্তায় নেমে এল। হোটেলে ফিরে আপাং-এর মুখোমুখি হতে হবে না এটাই বাঁচোয়া। প্রশ্নে প্রশ্নে তাকে নাজেহাল করে ছাড়ত। মুখি জানতে চাইলে উত্তর না দিলেই হল। দ্বিতীয়বার জানতে চাওয়ার তার সাহস হবে না। অথচ ধীর আরও একবার কোনও কিছু না জানিয়ে উধাও হলে আপাং মুখিকেই ইস্ত্রি করবে। কী আর করা যাবে। ঘটনাচক্রে তার মাতরায় যাওয়াটা এমন একটা মাত্রা পেয়েছে যে গোপন না রেখে উপায়ও নেই।

হোটেলে পৌঁছে জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমের দরজা বন্ধ দেখে ধীর ফিরে এল। ঘরের মধ্যেই তার খাবার রেখে গেল মুখি। দিরাং সব মালপত্র তুলে নিয়ে গেল অথচ মুখি তার কাছে কিছু জানতে চাইল না। তাকে এত চুপচাপ খুব একটা দেখা যায় না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে

যাওয়ার মুখে সে জানতে চাইল।

"কী ব্যাপার মুখি — তুমি এত চুপচাপ কেন? কিছু হয়েছে?"

মুখি ঘুরে দাঁড়াতেই তার মুখ দেখে ধীরের মনে হল ভয়ানক ক্লান্ত সে। জবাব-এর মধ্যেও যথেষ্ট বিরক্তি ফুটে উঠল।

'ইতনা সারি কাম মুঝে করনা পড়তা। আপ ক্যায়া সমঝেগা সাব্।"

কথাটা ঠিক। প্রচুর কাজ করতে হয় মুখিকে। কিন্তু এমন কথা তাকে সে আগে বলতে শোনেনি। ধীর আর কথা বাড়াল না কিন্তু আসল কথাটা যে মুখি চেপে গেল এটা বুঝতে তার অসুবিধে হল না। খাওয়া শেষ করে উঠতে যাওয়ার সময় তার ঘরে ঢুকল দিশ। এতক্ষণ মেয়েটার কথা ধীরের মনেই পড়েনি। বেশ ফিটফাট মনে হল দিশকে। এমন পরিচ্ছন্ন অবস্থায় তাকে সে এর আগে কখনও দেখেনি। এমনকী সদ্য স্নান সেরে উঠলে শরীর থেকে যে সুগন্ধ ছড়ায় তেমন গন্ধও তার নাকে এল।

হাত ধুয়ে এসে দেখল দিশ তার খাওয়ার প্লেট তুলে নিয়ে গেছে। স্নান করার আর ইচ্ছে হল না তার। খাট আর মেঝের মধ্যে জিনিসপত্র ছড়িয়ে দরকারি সাজসরঞ্জাম তার স্যাকে ভরতে শুরু করল ধীর। বেলা চারটের সময় ঘরে তালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে অবাক হল সে। মাকনা থেকে বাস এসে হাজির। সাড়ে পাঁচটার আগে ওই বাস কখনও মাচদায় ঢোকে না। তা ছাড়া, বাস ঢুকলেই প্রচুর শোরগোল পড়ে যায় অথচ সে সব তার কানে আসেনি। হোটেলে প্রচুর খদ্দের কিন্তু মুখির মধ্যে গা-ছাড়া ভাব। ধীরের হাতেও চা এল প্রায় পঁচিশ মিনিট পর। এভাবে হোটেল চললে লাটে উঠতে সময় লাগবে না। মাতরা থেকে ফিরে এসেই আপাং-এর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে চায় ধীর। দিরাং পুরোপুরি বদলে গেছে। ফের তাকে হোটেল চালানোর দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে সে আপাং-কে রাজি করাতে চায়।

ভোর সওয়া চারটের সময় উঠে আলো জ্বালাতেই ধীর দেখতে পেল তার ঘরের দরজা খোলা। সে তো ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়েছিল! ঘরের কিছুই খোয়া যায়নি। টেবিলের উপর একটা তোয়ালে ছিল সেটা অবশ্য সে দেখতে পেল না। বাইরে বেরিয়ে মুখে জল দিয়ে এল ধীর। ভাল ঠাণ্ডা বাইরে। উইণ্ডপ্রুফ জ্যাকেট চড়িয়ে সে স্যাক পিঠে তুলে নিল। দরজা ভেজিয়ে হোটেল ঘরে মুখিকে তার বিছানায় না পেয়ে অবাক হল সে। হোটেল থেকে বেরনোর দরজায় কেবল ছিটকিনি দেওয়া অর্থাৎ ধীরের মুখিকে না ডাকলেও চলে। সে যে ভোরভোর হোটেল ছাড়বে এটা মুখি জানত। কিন্তু সে বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজাটা লাগানো দরকার। বাথরুম যেতে পারে মুখি ভেবে অল্প অপেক্ষা করল সে। তারপর হাঁক পাড়ল। হোটেল থেকে আপাং-এর ঘরের পাশে যে ছোট্ট ফালি ঘর তার সামনে এসে দাঁড়াতেই ধীব স্থির হয়ে গেল। তবে তা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। মুহূর্তের মধ্যে সে সরে এল। মাথার মধ্যে যে সব

অদ্ভুত আওয়াজ ভিড় করছিল তাদের সরিয়ে দিতেই সে প্রচণ্ড শব্দ করে ছিটকিনি খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। বাইরের হাওয়া এসে মুখে ধাক্কা মারতেই তার সারা শরীর জুড়িয়ে গেল।

তাদের দুই মালবাহক মুন্নালাল ও ফুলচাঁদ দিরাং-এর সমবয়সী। ঠিক ভোর পাঁচটায় এসে তারা হাজির।

দিরাং সাহেবের সঙ্গে পাহাড়ে গেছে এটা বিনতি জানে কিন্তু কোথায় গেছে তা সে জানে না। মোটামুটি সেই নির্দেশ মেনে চললেই কাজ হবে। তা ছাড়া এর মধ্যে সাতদিন তার আশ্রমেই কেটে যাবে। সুতরাং খবর বাইরে বেরিয়ে পড়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। ধীর দু'জন মালবাহককে নিয়ে বড় রাস্তায় নেমে এলেও দিরাং তার বউকে ছেড়ে আসতে প্রায় আধঘন্টা দেরি করল। খুব স্বাভাবিক, পাহাড়ে গেলে চিন্তা থাকে। অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। বিনতি সেভাবে না বুঝলেও দিরাং ভালই বোঝে। ওই সময় মানুষ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। তাকে কষ্ট করে শান্ত থাকতে হয়।

মাতরা হিমবাহ অঞ্চলের কিছুটা ধীরের পরিচিত। দিরাং একবার তার সঙ্গেও ছিল। তবে কোনও বারই সে হিমবাহ পর্যন্ত যায়নি। এবার তাকে পুরো হিমবাহ জুড়ে ঘুরতে হবে। তিন দিনের মধ্যে তারা সঙ্গের দু'জন মালবাহককে ছেড়ে দেবে। ওদের হাতে তার বেশি সময় নেই। অবশ্য সেই শর্তেই দিরাং তাদের নিয়োগ করেছিল।

প্রথম দিন তারা বেশি দূর এগোতে পারেনি। দ্বিতীয় দিন ক্যাম্প করা হল মাতরা হিমবাহের দু'দিক থেকে প্রবাহিত দুটি নালার সংযোগস্থলের সামান্য বামদিক ঘেঁষে। ছোটো মাতরা রিজ এবং বামদিক থেকে আসা নালা ওখানে যেন কোলাকুলি করতে চায়। তিনজনে মিলে যখন ক্যাম্প লাগাতে ব্যস্ত সেই সময় ধীর বাম নালা ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল। একটা ছোট্ট মোরেন স্তূপ পেরিয়ে বড় হিমবাহ থেকে অনেকটা দূরে নালা হঠাৎ অস্বাভাবিক বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ধীর। ক্যাম্প থেকে এক নাগাড়ে এক ঘন্টা হাঁটার পর ওখানে পৌঁছেছিল সে। ইরিকা তাঁদের ক্যাম্পের যে বিবরণ দিয়েছিলেন তার সঙ্গে জায়গাটা মিলে যায়।

সামান্য ঘুরতেই তাঁবু লাগানোর একটা জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল। অনেক ঘোরাঘুরির পরও ধীর দ্বিতীয় তাঁবুর জায়গা দেখতে পেল না। আচমকা তুষারপাতের ফলে কি একটার বেশি তাঁবু লাগানো সম্ভব হয়নি? ব্যাপারটা ম্যাডাম চেপে গেলেন কেন সে কিছুতেই বুঝতে পারল না। বাধ্য হয়ে ছোট্ট একটা তাঁবুতে আট-দশজনকে বসে রাত কাটাতে হয়। পাহাড়ে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। তার মানে ম্যাডাম ও সোনাম একই তাঁবুতে দু'রাত কাটিয়েছিলেন।

এর ফলে একজন কোথায় কী রাখছে এটা অন্যজন অনায়াসে জানতে পারে। পাসপোর্ট রাখা পাউচটা যেখানে রাখা ছিল ইরিকা জানতেন সেটা সেখানেই আছে। সেটা যে কোনও এক সময় সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এটা তিনি জানতেন না। জানার কথাও নয়।

দিরাং ও ধীর দুর্ঘটনার পর ইরিকাদের সাহায্য করতে গিয়েছিল। তার ধারণা পাসপোর্ট হারানোর কথা তখনও তিনি জানতেন না। তা জানলে তাঁর উদ্বেগ ধরা পড়ত। ম্যাডামের কথার সূত্র ধরে একটু হিসাব কষতেই তার মনে হল, সে যেখানে দাঁড়িয়ে তারই কোথাও ওই পাসপোর্ট রাখা আছে। সহজে জায়গাটা বোঝার জন্য একটা বোল্ডারের উপরে পাথর দিয়ে ধীর টি সি লিখে রাখল। সংক্ষেপে টি.সি.-র মানে যেমন ট্রানজিট ক্যাম্প তেমনি টোর-চিকুও হতে পারে। দ্রুত পা চালিয়ে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সে ক্যাম্পে ফিরে এল। তাকে ছাড়া ধীব এভাবে এগিয়ে যাওয়ায় দিরাং প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

"আপকা একেলে আগে বাড়নে কো ক্যায়া জরুরত থা? অগর কুছ হো গ্যায়া তো?

তার ইচ্ছে হল বলার, 'একাই যাও বা দল সঙ্গে থাক ঘটনা ঘটবেই। তোমাকে শুধু সতর্ক থাকতে হবে।' কিন্তু সে অন্য কথা বলল।

"তোমরা কাজ করছিলে তাই একটু ঘুরে এলাম।"

কোনও উত্তর দিল না দিরাং কিন্তু গরম চায়ের মগ ঠিক এগিয়ে দিল। চা খেতে খেতে লক্ষ করে দেখল ধীর। তাঁবু দুটো দাঁড়িয়ে গেলেও ঠিকভাবে লাগানো হয়নি। এমন ঢিলেমি প্রায়ই দেখা যায়। হঠাৎ আবহাওয়া খারাপ হলে কেঁদে কুল পাওয়া যায় না। চা খাওয়ার পর তাঁবু দুটোকে মজবুত করার কাজে সে হাত লাগাল। ছোটা মাতরা রিজের ঢাল থেকে জুনিপার-এর শুকনো ডালপালা সংগ্রহে বেরিয়ে গেল তিনজন। কিছুক্ষণ পর ধীর তাঁবুর দড়ি বাঁধার কাজ শেষ করল।

উত্তরে তাকিয়ে দেখল ধীর। কয়েক কিলোমিটার দূরে মাথা তুলে থাকা মাতরা রেঞ্জ-এর দুর্ভেদ্য প্রাচীর। হিমবাহ থেকে ওই প্রাচীর চার হাজার ফুটের বেশি বৈ কম না। পূর্ব থেকে পশ্চিমে হিমবাহের দৈর্ঘ প্রায় আট কিলোমিটার। অন্যদিকে মাঝখানে কিছুটা বাঁক নেওয়ায় মাতরা রেঞ্জ-এর উত্তর গিরিশিরা দশের কাছাকাছি। ওরই কোথাও অবস্থিত এক ডিপ্রেশন-এর খোঁজ পেয়েছে সোনাম চিকু। সেই পথ দিয়ে ইরিকা টোর-কে সে ডোলি উপত্যকায় নিয়ে যেতে চায়। দক্ষ ক্লাইম্বারদের কাছে আজকাল কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু ধীর অমন ভাঙাচোরা পাথর ও বরফের ঢালে উঠতেই যাবে না। নিতান্তই চড়তে হলে গিরিশিরার বিভিন্ন ঢাল খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করার পর সে সিদ্ধান্ত নেবে। নিজের দক্ষতায় দুরূহ ঢালে পথ করে নিতে পারে এমন মানুষ না হলে উত্তর গিরিশিরা অত্যন্ত ঝুঁকির ব্যাপার। সম্ভবত সেকথা ভেবেই নাংগেলজি ধীরকে মাতরা ঘুরে আসার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

আগুনের পাশে বসে ফুলচাঁদের গান শুনছিল ধীর। গানের গলা তার তেমন না হলেও পরিবেশের গুণে মন্দ লাগছিল না। অনেকদিন পর সঙ্গীতের ধ্বনি তার কানে এল। গায়কীর ঢঙে নেপালি সঙ্গীতের সুর বলে মনে হয়। চাসু উপত্যকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গানের ভূমিকা তেমন জোরদার নয়। হঠাৎ তার মন উদাস হয়ে গেল। এ কেমন কথা! জীবনের সব পাওনা-গণ্ডা পল মেপে বুঝে নেওয়া হবে কিন্তু মানুষ গান গাইবে না! গানের সুর শোনা যাবে না! গান ছাড়া জীবন তো আর জীবনই থাকে না।

ফুলচাঁদ শুধু গায়কই নয় সে কবিও বটে। রসিকতার তীক্ষ্ণ চটুলতা থেকে সে সাহেবকেও বাদ দেয় না। সারাটা সময় ধীরের হাবভাব লক্ষ করার পর সে তাকে নিয়ে রসসঙ্গীত রচনা করেছে। সুন্দরভাবে ওই গান পরিবেশনায় ব্যস্ত থাকল ফুলচাঁদ। সাহেব ক্ষুব্ধ হতে পারেন মনে করে দিরাং-এর আকার-ইঙ্গিত তাকে তা থেকে বিরত করাতে পারেনি। সাহেব তো কী হয়েছে! মজা করার সময় সাহেব-মেম ভাবলে মজার শুদ্ধ রসই মাঠে মারা যায়। চুপ করে থাকলেও মনে মনে ধীর বলল, বহত খুব ফুলচাঁদভাই — চালিয়ে যাও। তুমি আছ তাই জীবন আছে। মজা ও মুচমুচে মনের অবাক পালাকাব তুমি—সেলাম তোমাকে। শুনল কি, ফুলচাঁদ?

তৃতীয় দিন একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে ঝকমারি ওলটপালট হওয়া তুষারক্ষেত্রের ভাঁজ ও চড়াই-উৎরাই পার হতে গিয়ে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। পশ্চিমের বড় হিমবাহের উপর সামান্য এগিয়েই তাদের ক্যাম্প পড়ল। মাত্র পাঁচঘন্টা হাঁটলেও পাথর ও শক্ত বরফের ঠোকায় আরও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। তা ছাড়া মুন্নালাল ও ফুলচাঁদ নীচে নেমে যাবে সুতরাং বেলা বারোটায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হল। অল্প বিশ্রাম নিয়েই তাঁবুর সামনে উঁচু হয়ে থাকা শক্ত বরফ কেটে সমান করতে লেগে গেল ধীর। সূর্য কিছুটা পশ্চিমে হেলে গেলেও পাতলা রোদ্দুরে বরফ মাড়াতে মন্দ লাগছিল না।

কাজ শেষ করে আগ্রহ নিয়ে উত্তরে তাকাল ধীর। তাদের তাঁবু থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরেই মাতরা গিরিশিরা। কালচে অন্ধকারে ঢালের অনেকটাই ঢাকা। এক কিলোমিটার পূর্বে সরে গেলেই গিরিশিরা সামনে চলে আসে। পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রায় চার কিলোমিটার সোজা এসে ওই গিরিশিরা হঠাৎ ডোলি উপত্যকার দিকে বাঁক নেয়। মাঝখানে এসে ইংরেজি অক্ষরের 'ইউ' আকৃতি নিয়ে তা ফের মাতরা ঢুকে সোজা পূর্বপ্রান্তে পাড়ি দেয়। ধীরের মূল লক্ষ্য ওই 'ইউ' ও তার আশপাশ এবং পুবকোণা। দূর থেকে দেখে তার মনে হল, ওখানের কোনও ঢাল ধরে গিরিশিরায় ওঠা সম্ভব হলেও হতে পারে। পাথর পড়ার ভয় না থাকলে চেষ্টা করে দেখা যায়।

কখন যে চা হাতে দিরাং তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেনি ধীর।

"এক বাত পুছু সাব্?"

“কী বাত পুছবে?”

“হম দোনো ইহাঁ কিস লিয়ে আঁয়ে হ্যায়? জানাহি-ই ভি কাঁহা?

সাহেব বলেছে সে চলে এসেছে। এখন তার প্রশ্ন কেনই বা মাতরায় আসা আর কোনটাই বা তাদের যাওয়ার পথ।

“এখন শুধু দেখার কাজ, দিরাংভাই। যখন যেতে বলব তখন আমার পিছনে আসলেই হবে। কী বুঝলে?”

“পুরা সমঝ গ্যায়া সাব।”

তার পরও সে দাঁড়িয়ে থাকল। ধীর চা খেতে খেতে দেখার কাজ সেরে নিচ্ছিল। দিরাং তখনও নড়ল না অর্থাৎ পুরোটা বুঝে গেলেও তার আরও কিছু বলার ছিল।

“আর কিছু বলবে?”

“জি সাব্।”

“কী?”

“আপকা বাত ম্যায় নেহি শুনুঙ্গা। আপ চলা, ম্যায় ভি চলা আপকা সাথ। মগর আপকো জাদা জখিম উঠানে ম্যায় নেহি দুঙ্গা।”

বোঝো ব্যাপার! তার পয়সা করা লোক কিন্তু সে তার কথা শুনবে না। তার সাহেব চলতে শুরু করলে সে-ও তার পিছনে হাঁটা শুরু করবে। কিন্তু কিছুতেই সে তার সাহেবকে বেশি ঝুঁকি নিতে দেবে না। দিরাং আগেভাগেই ব্যাপারটা খোলসা করে দিতে চায়।

“কেন বাপ্, আমার সঙ্গে তোমার এত আঠা কীসের?” হঠাৎ কথাটা ধীরের মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

“ক্যায়া বোলা সাব?”

“বলছিলাম, তাই হবে।”

খুব খুশি হল দিরাং লাকা।

“কিন্তু তুমি যেখানে চড়তে পারবে না সেখানে?”

“তব ম্যায় নীচে ঠ্যার জায়ুঙ্গা?”

যেখানে দিরাং চড়তে পারবে না সেখানে সে নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। যাঁরা

ক্লাইম্ব করেন তাঁরা জানেন, নীচে অপেক্ষায়-থাকা মানুষ মানেই এক প্রকার মানসিক সাহায্য। প্রায়ই তা চাগিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। গিরিশিরা থেকে চোখ তুলে ধীর দিরাং-কে ভাল করে দেখল। মাত্র ক'টা দিন তার সঙ্গে থেকেছে তার মধ্যেই এত বদলে গেল মানুষটা! এর পর কখনও চাসু উপত্যকায় আসতে হলে হয়তো দিরাং লাকা-র জন্যই ফিরে আসতে হবে — মনে হল ধীরের।

চতুর্থ দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার হাতে পাঁজি নেওয়ার মতো করে তারা সকাল সাতটায় পশ্চিমদিক তাক করে বেরিয়ে পড়ল। দূরে দাঁড়িয়ে হলেও পশ্চিম কোণার অবস্থান একবার দেখা দরকার। নাংগেলজি তেমনি পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রায় চার কিলোমিটার যাওয়ার পরই হিমবাহ শেষ এবং ঢাল শুরু। ঢাল থেকে অল্প দূরে অপেক্ষা করার সময় পাথর পড়া শুরু হল। ঢালে রোদ পড়া মাত্রই পাথরের টুকরো তীরবেগে নীচে গড়িয়ে পড়ে। ছোটা মাতরা রিজের সংযোগস্থল থেকে পুবদিকে প্রসারিত গিরিশিরার প্রায় দেড় কিলোমিটার অঞ্চল রকফল জোন। হাতের পাঁজি হিমবাহে পড়ে যেতেই ধীর দিরাং-কে নিয়ে উঠে পড়ল।

"ইস তরফ কাঁহা জানা! মুঝে মরনা নেহি। আপভি মেরা সাথ চলিয়ে।"

দিরাং-এর মতো ধীরেরও আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার সাধ। হিমবাহে দাঁড়িয়ে গিরিশিরা পর্যবেক্ষণের কাজে অনেকটা সময় গলে গেল। অসম্ভব ক্লান্তিকর হিমবাহ পরিক্রমা। এটা টপকে ওটাকে এড়াতে ঘুরপথ ধরতে গিয়ে দু'জনেরই বেহাল অবস্থা। সন্ধের মুখে ক্যাম্পে পৌঁছে চা বানাতেই অনেকটা সময় লেগে গেল দিরাং-এর।

বুধবার সকালে উঠে তারা দেখল মাতরা হিমবাহ পুরোপুরি গাঢ় কুয়াশার কবলে। হিমবাহের উপর কুয়াশা প্রায়ই হয় আবার কিছুক্ষণ পর কেটেও যায়। কিন্তু সকাল দশটার পর কিছুটা পরিষ্কার হলেও বেরিয়ে পড়ার মতো অবস্থা হল না। বেলা দুটো নাগাদ ধীরে ধীরে মাতরা অঞ্চল দৃশ্যমান হল। এমন ঘটনার সঙ্গে ধীর পরিচিত নয়। ছোট্ট একটা হিমবাহ এলাকায় এর পর আবহাওয়া অন্য কিছুতে মোড় নেয় কি না ভাবছিল ধীব। পাহাড়ি মানুষ দিরাং—তার কাছেই সে জানতে চাইল

— দিরাং ভাই, কাল মওসম কেমন থাকবে?

অত্যন্ত বিজ্ঞের মত উত্তর দিল দিরাং

— তিন-চার দিনকে লিয়ে আভি লাগতা হ্যায় মওসম ঠিক রহেগা।

আপাতত তিন-চার দিনের জন্য আবহাওয়া ভাল থাকবে এটা জানিয়ে দিল দিরাং। কিন্তু কী কারণে তার এমন ধারণা সেটা জানাল না। তবে সত্যিই তার কথা মিলে গেল। বৃহস্পতিবার ভোরে তারা ঝকঝকে আকাশ দেখতে পেল। তাদের হাতে সময় অল্প।

নাংগেলজির কথা মনে পড়তেই ধীরের আলসেমি কেটে গেল। দিরাং-কে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে তাও সকাল আটটা বেজে গেল।

ধীরের লক্ষ্য গিরিশিরার যে অংশটা ডোলির দিকে বাঁক নিয়ে মাতরায় ঢুকে 'ইউ' হয়ে আছে সেই জায়গা। ক্যাম্প থেকে মাত্র দেড় ঘন্টার মধ্যেই ওখানে পৌঁছে যাওয়া যায়। বেরনোর মুখে দিরাং তার অভিমত জানিয়ে দিল — বেকার জানা। ক্যায়া ফায়দা হ্যায়? পাত্থর উহাঁ ভি গিরতা হোগা।

ধীর কিছু বলল না। কারণ পাথর পড়লেও জায়গাটা তার দেখা অত্যন্ত জরুরি। দিরাং ব্যাপারটা বোঝে না।

চল্লিশ মিনিট সোজা উত্তরে গিয়ে ধীর দাঁড়িয়ে পড়ল। গিরিশিরার বাঁক নেওয়া অংশটা সে পরিষ্কার দেখতে পেল। আরও চল্লিশ মিনিট হাঁটলে ঢালের তলায় পৌঁছে যাওয়া যায়। মিনিট কুড়ি হাঁটার পর সে 'ইউ' মোড়ের পশ্চিম কোণা পরীক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত নিল। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মনে হল কোনও এক বিশাল প্রাচীর যেন ভূমিকম্পে সটান মাটিতে গেঁথে গেছে। বরফ ও পাথরের ঢাল এলোমেলো হয়ে থাকলেও তার উপর দিয়ে ওঠা যায়। তলা থেকে প্রথম দেড় হাজার ফুটে সূর্যের আলো প্রায় ঢোকেই না। পাথর পড়ার সম্ভাবনাও কম। মাত্র শ'খানেক ফুট উপরে উঠে সে দেখছিল। ওই ঢাল ধরে প্রায় হাজার ফুট উপরে চড়া সম্ভব। চেষ্টা করলে দিরাং-ও তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে। ইশারায় তাকে কিছুটা উপরে ওঠার নির্দেশ পাঠাল ধীর। আচমকা পাথর গড়িয়ে পড়লে অবশ্য চিৎকার করারও সময় পাওয়া যাবে না।

সকাল দশটা। পরিষ্কার আকাশ। মিনিট দশ ভাবার পর উপরে উঠতে শুরু করল ধীর। তার পিছনে দিরাং। লক্ষ্য ভেঙে পড়া পাথর স্তুপের শীর্ষদেশ। দেড় ঘন্টায় তারা দু'জন স্তুপের উপর এসে দাঁড়াল। ওঠার সময় অনেক হিসাব করে পথ বের করতে হয়েছিল। সরাসরি উঠতে পারলে আরও কম সময়ে তারা কাজটা করতে পারত। সেখানে দাঁড়িয়ে স্তুপের বামদিক ঘেঁষে একটা রকগালি দেখতে পেল ধীর। ওই গালি ধরে এগিয়ে গেলে কোথায় যাওয়া যায় তা দেখতে কিছুটা ঝুঁকি নিতে হয়। কুড়ি ফুট মতো পাথরের ঢাল ধরে আড়াআড়ি বামদিকে চলে যেতে হয়। সেটা করার পর সে গালিমুখে পৌঁছে গেল। দিরাং চাইলেও ধীর তাকে আর এগোতে দিল না।

গালি ধরে পঞ্চাশ ফুট উঠে গেলেই সহজ পাথরের ঢালে পৌঁছে যাওয়া যায়। রক ক্লাইম্ব করার অভ্যাস থাকলে ওই পঞ্চাশ ফুট অনায়াসে ওঠা যায়। পঁচিশ মিনিট পর গালি পেরিয়ে ধীর পাথরের সহজ ঢালে পৌঁছে গেল। নীচে এত ভাঙাচোরা থাকলেও উপরে মোটামুটি শক্ত ঢাল। উপরে তাকিয়ে আকাশ দেখতে গিয়ে তার দিরাং-এর কথা মনে পড়ল। খুব বেশি হলে আড়াই'শ ফুট নীচে তার বসে থাকার কথা। হাঁক পাড়ল ধীর।

"দিরাং!"

গমগম করে উঠল তার কণ্ঠস্বর। এমন আওয়াজ শুনে সে থতমত খেয়ে গেল। ক্ষীণকণ্ঠের আওয়াজ অনেকটা পর সে শুনতে পেল।

"সাবজি?"

"ঠিক আছো?"

"ম্যায় ঠিক হুঁ সাব্। আপ?"

"আমি ঠিক আছি। অসুবিধে হলেই নেমে আসব।"

দিরাং-এর কোনও ফিরতি উত্তর ধীর শুনতে পেল না।

জিরাফের পিঠের মতো পাথরের ঢাল যেন শেষই হতে চায় না। দেড়টার সময় জিরাফের পিঠ টপকে ধীর দাঁড়িয়ে পড়ল। ওই প্রথম তার শরীরে রোদ এসে পড়ল। কিছুটা দূরে এক বিশাল পাথরপ্রাচীর তাব পথ আগলে দাঁড়িয়ে। বেশ শক্ত ঢাল। ইতস্তত করে ধীরে ধীরে উঠতে থাকল ধীব। ওই পাথরপ্রাচীরের সামনে না গেলে কাজ সম্পূর্ণ হয় না। তাই সে সতর্ক থেকে উঠতে থাকল। সওয়া দুটোর সময় প্রাচীবে হাত দিয়ে সে পিছন ফিরে তাকিয়ে মাতরা হিমবাহকে দেখতে পেল। হিমবাহের উপব তাদের নীল তাঁবুও সে খুঁজে পেল।

দড়ি, পিটন, ক্যারাবিনার, স্লিং ইত্যাদি পাথবে চড়ার সরঞ্জাম তার ন্যাপস্যাকে মজুদ থাকলেও তাকে থেমে যেতে হল। ওই খাড়া পাথবে উঠতে হলে আরও একজন দক্ষ ও সাহসী মানুষ সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। ওখানে রাত কাটানোর জন্য জল ও খাবার সঙ্গে থাকাও অত্যন্ত জরুরি। তা ছাড়া, ওই পথে আরও কী ধরনের দুরূহ বাধা অপেক্ষা করে আছে তা সে জানে না। তবে সবদিক চিন্তা করার পর ধীর নিশ্চিত হল, সোনাম চিকু যে পথ ধরে ডোলি যেতে চায় সে পথ অন্য কোথাও থাকতে পারে। ফিরে আসার সময় পাথরের গায়ে সে তার ও দিরাং-এর নাম লিখে রাখল। কাজটা অনুচিত হলেও করতে হল।

অতি সন্তর্পণে ঢাল ধরে নীচে নামতে শুরু করল ধীর। ওই সময় সে পায়ের পেশিতে মৃদু টান অনুভব করল। তখনও অনেক পথ নামা বাকি। ইলেকট্রল মেশানো জল গলায় ঢেলে অল্প বিশ্রাম নিয়ে উঠে পড়ল সে। মনের জোর তার যথেষ্টই তবু নিজেকে ক্রমাগত কানের কাছে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে গেল। দারুণ কাজ হল। হঠাৎ সে দেখল সামান্য উঁকি মেরে নীচে তাকালেই সেই গালিমুখ। দড়ির সাহায্যে নিরাপদে নীচে নামা যেত কিন্তু পিটন লাগানোর মতো খাঁজ সে খুঁজে পেল না। তার কণ্ঠস্বর খুব ভাঙা বলে মনে হল। গলা শুকিয়ে কাঠ হলে প্রায়ই এটা হয়। আর হয় ভয়ঙ্কর ভয় পেলে। এক সঙ্গে সম্ভবত দুটো ঘটনাই ঘটেছিল। গালির উপরে বসে সে দিরাং-এর নাম ধরে ডাকল।

"ম্যায় ঠিক হুঁ। সামহালকে উতারনা সাব্।"

কোনও জবাব দিল না ধীর কিন্তু ওই কণ্ঠস্বর তাকে চাঙ্গা করে তুলল। তখনও দিরাং তার অপেক্ষায় ওই হাড়-হিম করা ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে নীচে বসে থাকতে পারে বিশ্বাস করতে পারেনি সে।

অত্যন্ত সতর্ক থেকে রক ধরে নামা শুরু করল ধীর। খুব দুর্বল বোধ করলেও নিজের উপর আস্থা তখনও অটুট। ঠিক সাড়ে চারটায় সে দিরাং-এর পাশে এসে বসে পড়ল। দিরাং-কে জড়িয়ে ধরতেই মানুষটা হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। ওই সময় ধীরের মনে হল, দিরাং শুধু ভয়ই পায়নি সে সম্ভবত অন্য কিছু আশঙ্কাও করেছিল। তবে কোনও বিরক্তি ছিল না তার মধ্যে। তখনও প্রায় হাজার ফুট নীচে মাতরা হিমবাহ। হাত ধরে অসীম মমতায় সে তার সাবকে ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসতে সাহায্য করল। শেষ আধঘন্টা টর্চের আলো ফেলে রাস্তা বুঝে ক্যাম্পে ফিরতে হল তাদের। সেদিন হিমবাহের উপর দিয়ে অল্প পথ পার হতেই তাদের অনেক সময় লেগে গেল।

শেষরাতে ঘুম ভেঙে গেল ধীরের। তার পাশে দিরাং গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কোনও সাড় নেই তার। তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখল নিঝুম মায়াবী ঘের। ফিকে অন্ধকার তাকে মুগ্ধ করে দিল। কয়েক ঘন্টা আগেকার মুচড়ে যাওয়া মানুষটা দারুণ তরতাজা বোধ করল। টর্চ জ্বেলে হিমবাহের কালচে বরফের উপর সে পায়চারি শুরু করে দিল। আর যায় কোথায়!

"ক্যায়া শোচা আপ? আভি অন্দর আইয়ে নেহি তো ম্যায় ...!"

কথা শেষ করল না দিরাং। ভয়ঙ্কর ক্ষেপে গিয়েছিল সে। ওই ঠাণ্ডায় ওভাবে ঘুরে বেড়ালে সাহেবের শরীর খারাপ হতে পারে। রাগ তো তার হতেই পারে। আরও একবার ধমক খেয়ে সুটসুট করে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়ে ধীর। কিন্তু তাদের কারও চোখেই আর ঘুম এল না। দিরাং ভেবেছিল সাহেবের দেখার কাজ বোধহয় শেষ। এবার ফেরার পালা।

— কল ক্যায়া হমলোগ নীচ্চে উতরেঙ্গে সাবজি?

— ছোট গ্লেসিয়ারের শেষ পর্যন্ত দেখা দরকার।

— কিঁউ, কীস লিয়ে?

— দরকার আছে। দূর থেকে দেখে অসব। তোমাকে যেতে হবে না।

ধীরের কথায় বিরক্ত হলেও চুপ করে থাকল দিরাং। একটু অপেক্ষা করার পর জানতে

চাইল।

— উপ্পর নেহি চড়েঙ্গে?

— না।

তাঁবু ছেড়ে চা বানাতে অন্য তাঁবুতে চলে গেল দিরাং। চায়ের সঙ্গে ছাতু মিশিয়ে খাওয়ার পাহাড়ি অভ্যাসটা সবে শুরু করলেও মোটামুটি কাজ চালাতে পারে সে। ওটাই বেড-টি সঙ্গে ব্রেকফাস্টও। দেড় লিটার জল, ফ্লাস্কে চা ও টুকিটাকি খাবার ছাড়াও হেলমেট এবং চড়ার সরঞ্জাম সঙ্গে নিল ধীর। ক্যাম্প ছাড়ার আগে দড়ির কয়েল কাঁধে ফেলতে যাবে হঠাৎ দিরাং এসে হাজির। সতর্ক করে দিতে ভুলল না সে — খ্রিফ জানা অওর বাপোস হোনা। জখিম মাত উঠানা। মুঝে রোনা পড়েগা অ্যায়সা বেকুবি নেহি করনেকা সাব।

আশ্চর্য হল ধীর। সব ঠিক ছিল কিন্তু ধীরের বোকামির জন্য দিরাং-কে যেন কান্নাকাটি করতে না হয় সেটা মনে রাখার অনুরোধ করতেই ধীর স্থির হয়ে গেল। দু'জন পাহাড়ে এসে একজন মারা গেলে খুব কষ্ট হয়। দিরাং ব্যাপারটা বোঝে। দিরাং-এর হঠাৎ কিছু ঘটে গেলে ধীরও কি খুব কষ্ট পাবে? অবশ্যই, কিন্তু জল তার চোখে আসবে বলে মনে হয় না।

সাড়ে ছ'টায় ক্যাম্প ছেড়ে ছোট হিমবাহের শেষভাগ অর্থাৎ পূর্বপ্রান্ত লক্ষ্য করে মাত্র দু'কিলোমিটার যাওয়ার পরই ধীরকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। রোদ না থাকলেও পাথর পড়ার শব্দ মুহুর্মুহু তার কানে এল। টুকরো পাথর তীব্রবেগে হিমবাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এমন তো হওয়ার কথা নয়! বরফের মধ্যে পচা পাথর আটকে থাকলে দিনের হালকা উত্তাপেই এমন ঘটতে পারে সুতরাং পুবপ্রান্ত বাতিল করতে হল। অর্থাৎ এর পর দেখার বলতে 'ইউ' মোড়ের পুবকোণা এবং তারই কোল ঘেঁষে এক অস্বাভাবিক ঝুলে থাকা ভাঙা রিজ।

হিমবাহের উপর এক কিলোমিটার পিছিয়ে আসতেই সে ঝুলে থাকা রিজ-এর সামনে এসে দাঁড়াল। অদ্ভুত গঠন মানতেই হয়। ইউ-র পুব দিক থেকে অল্প দক্ষিণে এসে হঠাৎ ঝুপ্ করে জলপ্রপাতের মতো মাতরা হিমবাহে নেমে গেছে। প্রায় দেড় হাজার ফুট উচ্চতার পচা ও ঝুরো পাথরের ঢাল। এমন স্তূপ ধরে ওঠা বা নামা কোনওটাই সম্ভব নয়। ওই রিজ শক্ত পাথরের হলে সেই ঢাল ধরে গিরিশিরায় ওঠা বোধহয় সম্ভব হত। এবং সেক্ষেত্রে হয়তো ডোলি উপত্যকায় পৌঁছে যাওয়ার পথ বেরিয়ে আসত।

আধ কিলোমিটার পিছিয়ে এসে ইউ-র পুবকোণা খুঁটিয়ে দেখল ধীর। কোণার মুখের মোরেন ঢাল উপরের অংশটা আড়াল করে রেখেছে। কিছুটা উঠতে পারলে বোঝা যেত কিন্তু তার প্রয়োজন পড়ল না। নীচে যত সহজ ঢালই হোক উপরের পুরোটাই ওভারহ্যাঙ্গ হয়ে বুক চিতিয়ে যেন এক জমাট প্রাচীর। ধীর বুঝল তার দেখা শেষ। এগারোটার মধ্যেই সে ক্যাম্পে ফিরে এল।

ক্যাম্প গুটিয়ে এক ঘন্টার মধ্যেই তারা হিমবাহ ছেড়ে নীচে নামতে রওনা দিল। মাত্র আড়াই কিলোমিটার যেতেই ধীর টি.সি. লেখা বোল্ডারের সামনে পৌঁছে গেল। ওদিন ওখানেই ক্যাম্প করা হবে শুনে সে কী রাগ দিরাং-এর। সে ভেবেছিল নিদেনপক্ষে তারা দুই নালার সংযোগস্থল পর্যন্ত নেমে যাবে। সাহেবের গোঁয়ার্তুমির কাছে সে হার মানলেও ক্ষোভ চেপে রাখতে পারল না।

"আপ পয়সা ডাল রহা, মেরা ক্যায়া!"

অর্থাৎ তোমার বেকার পয়সা নষ্ট হবে, আমার তাতে কী যায় আসে।

ধীর দিরাং-এর কথায় কান দিল না। তার মনে তখন অন্য চিন্তা। রাত পোহালেই সকাল। অথচ পরদিনও তাকে ওখানেই থাকতে হবে। কৌশল করে দিরাং-কে ঘন্টা চার-পাঁচের জন্য দূরে না পাঠালে সে দ্বিতীয় কাজে হাত দিতে পারবে না। তারই মধ্যে চা তৈরি। ধীর দেখল যে জায়গায় ইরিকা তাঁবু লাগিয়েছিলেন সেখানেই দিরাং তাদের তাঁবু পাততে চায়। সুন্দর তৈরি করা সমতল ভূমি দেখে খুব অবাক হল দিরাং।

"লাগতা হ্যায় ইহাঁ কোই তাম্বু লাগায়া থা। কৌন হো স্যাকতা সাব্? মেমসাব্?"

খুব বিরক্ত হল ধীর। যত্তোসব!

"হতে পারে। আমি কী করে বলব।"

বোল্ডারের উপরে বসে ইরিকা ম্যাডামের কথাগুলো ধীর স্মরণ করার চেষ্টা করল।

তখন বাইরে ভারী তুষারপাত। হঠাৎ তাঁবু থেকে বেরিয়ে বাইরে গেল সোনাম। বেশ কিছুক্ষণ পরেও সে না ফেরায় ম্যাডাম বেরিয়ে তার খোঁজ করেন। 'কিছুক্ষণ' মানে ধীর পনেরো মিনিট ধরে নিল। ভারী তুষারপাতের সময় পনেরো মিনিট বাইরে থাকা মানে অনেকক্ষণ। বাইরে বেরিয়ে তিনি নিশ্চয়ই সোনাম-এর নাম ধরে ডাকেন। তারপরও মিনিট দুই অপেক্ষা করেন। সোনামের কাছ থেকে কোনও আওয়াজ না পেয়ে তিনি টর্চের আলো ফেলে তার হদিশ পেতে চেষ্টা করেন। ধীর ধরে নিল, ওই অবস্থায় বেশিক্ষণ নীরব না থেকে শেষ পর্যন্ত সোনাম ভাঙা গলায় তার অবস্থান জানিয়ে দেয়। বিশ্রী অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ম্যাডাম তাকে ধরে ধরে তাঁবু পর্যন্ত নিয়ে আসেন। অর্থাৎ ঘটনার সময়কাল খুব বেশি হলে পঁচিশ মিনিট। প্রথমেই দুর্ঘটনার জায়গাটার হদিশ পাওয়া দরকার।

সোনাম বোল্ডার-সহ নীচে গড়িয়ে পড়েছিল। তাতেই দুর্ঘটনা। সেক্ষেত্রে বোল্ডার গড়িয়ে পড়ার চিহ্ন খুঁজে পেতে হয়। তুষারপাতের মধ্যে বোল্ডার গড়িয়ে পড়লে স্পষ্ট চিহ্ন অবশ্যই থাকার কথা। প্রচুর চিন্তা করার পর ধীরের মনে হল, ইরিকা তাকে না বললেও, দুর্ঘটনার স্থান তাঁবু থেকে পাঁচ মিনিটেরও কম দূরত্বে হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।

মাতরা হিমবাহ অঞ্চল থেকে একদিনেই লোকালয়ে পৌঁছে যাওয়া যায়। বিপদে পড়ার সম্ভাবনা কম। তা ছাড়া ওখানে তিন-চার দিনের বেশি দুর্যোগ স্থায়ী হয় না। এমন স্থান থেকে সোনামের অতি দ্রুত নীচে নামার ইচ্ছে মৃদু অস্বাভাবিক, দক্ষ গাইডের পক্ষে বেমানান। দুর্ঘটনা কারণ হলেও ধীরের কাছে জোরদার কারণ বলে মনে হয়নি।

বোল্ডারের উপর থেকে নেমে যে বড় বোল্ডারে সে টি.সি. লিখে রেখেছিল ধীর তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তাঁবুর পাশেই নালা এবং তার ঠিক উলটোদিকে শ'খানেক ফুট দূরে এক টুকরো নিম্ন'ঞ্চল। সম্ভবত নালা থেকে বেরিয়ে কোনও জলধারা একদা ওই নিম্নাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হত। ত্রিকোণ ভূমির একদিকে নালা অন্য দিকে সেই নিম্নভূমি। ফুট কুড়ি পঁচিশ হালকা ঢালে নেমে গেলেই ওই নিম্নভূমিতে পৌঁছে যাওয়া যায়। বোল্ডার ধরে গড়িয়ে পড়ার জায়গা, তার হিসাব বলে, ওই ঢাল ছাড়া অন্য কোথাও হতে পারে না।

আগে থেকে পরিকল্পনা করে কেউ কাজ সেরে রাখলে ওই পাসপোর্ট অন্য কারও পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আচমকা কারও নজরে পড়ে গেলে অবশ্য আলাদা কথা। তবে তেমন সম্ভাবনা ক্ষীণ। ধীব কেবল ইরিকা ম্যাডামের বিবরণের ভিত্তিতেই তার যুক্তি খাড়া করছিল। অর্থাৎ সোনামের তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাওয়া থেকে তাকে নিয়ে ম্যাডামের ফের তাঁবুতে ঢোকা পর্যন্ত সময়ের উপর দাঁড়িয়েছিল সে। তার কেন জানি মনে হল ঘটনাটা নিশ্চিতভাবে ওই সময়ই ঘটেছিল।

"ক্যায়া ইধার উধার ভটক রহা? অব তাম্বুমে আইয়ে। আঁধেরা বাড়তে জাতা সাব্।"

ধীর যে উদভ্রান্তের মতো এক টুকরো জায়গায় এদিক ওদিক করছে সেটা দিরাং লক্ষ করেছিল। গোয়েন্দাগিরিতে বুঁদ হয়ে গেলে আলো অন্ধকারের হিসাব থাকে না। পলিথিন ঢাকা কিচেনে গিয়ে তার মনে হল সব খাবার শেষ করে দিতে চায় দিরাং। ভোর ভোর বেরিয়ে কালই সে মাচদা পৌঁছে যেতে চায়। অথচ ওই ক্যাম্পে তার আরও একদিন থাকা জরুরি। মনে মনে সে কৌশল ভাঁজতে থাকল।

অন্ধকার গাঢ় হওয়ার আগেই সে তার ন্যাপ থেকে টর্চ বের করতে গেল। টর্চটা হাতে ধরেই তার মাথায় আইডিয়াটা খেলে গেল। সকালে বেরনোর সময় ন্যাপে ভরে নিয়ে গিয়েছিল ধীর। ওই টর্চ ভুল করে কোনও বোল্ডারে ফেলে এসেছে বলে দিরাং-কে খুঁজতে পাঠালে কেমন হয়। তবে নির্দিষ্ট একটা স্থানের কথা না বললে সে যেতে চাইবে না। সত্যিই তো, বিশাল হিমবাহ এলাকায় একটা ছোট্ট টর্চ কোথায় খুঁজবে সে। টর্চ হারানোর কথা সকালে নীচে নামার মুখে বললে কৌশল বেশি কার্যকরী হবে। ভাববার সময় পাবে না দিরাং। তাকে যেতেই হবে। সাবজির টর্চ গুম শুনলে সে পড়িমরি করে দৌড়বে। মানুষটাকে অযথা হয়রান করা হবে কিন্তু সে নিরুপায়। ন্যাপ থেকে টর্চটা বের করে লুকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে আধা অন্ধকারে ধীর ভাবতে থাকল। ইতস্তত করে সে টি.সি. লেখা বোল্ডারের আড়ালে চলে গেল।

তার বেশি দূরে গেলে এত বোল্ডারের মধ্যে সঠিক বোল্ডার সে চিনতে পারবে না। কী করবে ঠিক করতে না পেরে ওই টি.সি. বোল্ডারের বিভিন্ন দিক হাতড়ে সে হঠাৎ একটা ফাটল খুঁজে পেল। চেষ্টা করতেই ছোট্ট টর্চটা সুড়ুত করে তার মধ্যে ঢুকে গেল। আর তখনই দিরাং-এর ডাক। বিপদ আর বলে কাকে! ডাকার আর সময় পেলি না, বাপধন!

"খানা তৈয়ার। ক্যাণ্ডেল লাগা লিজিয়ে সাব।"

মরেচে! মোমবাতি বের করতে তো টর্চ চাই!

মোমবাতি বের করার ব্যাপারে কোনও আগ্রহ দেখাল না ধীর। বাধ্য হয়ে দিরাং-কেই কাজটা করতে হল। খাওয়ার পরই ধীর স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ল। তাঁবুতে থাকার সময় রাতে একবার বাইরে বেরিয়ে দেখা তার অভ্যাস। ওই দিন রাতে সে বাইরেই বেরল না।

ধীর যা ভেবেছিল ঠিক তাই। দিরাং খুব ভোরে উঠে পড়ল। ঘুম থেকে তুলে তাকে চা দিল। অল্পক্ষণ পরেই ব্রেকফাস্ট হিসাবে গিলাভাত ও বাসি ডাল সামনে এসে গেল। কিছুটা প্যাকিং আগেই করে রেখেছিল দিরাং। শুধু রান্নার জিনিসপত্র ও তাঁবু উঠলেই নীচে নামা শুরু করা যায়। চুপচাপ খেয়ে নিয়ে তাঁবু খুলে ফেলার আগে ধীরের নাটক শুরু হল। উদভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করতেই দিরাং সব ফেলে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

"হুয়া ক্যায়া? আপ কিঁউ ইতনা পরিশান হো রহা?"

"সর্বনাশ! টর্চ বোল্ডারে ফেলে চলে এসেছি।"

"মতলব?"

"মতলব আমার টর্চটা কাল সকালে ন্যাপে ছিল আজ নেই। ওটা একটা বোল্ডারে রেখে চলে এসেছি।"

একটু চিন্তা করল দিরাং। খুব বিরক্ত হল কিন্তু সে নিজে থেকেই যেতে রাজি হল।

"ম্যায় যা রহা। কাঁহা লাইট ছোড় কে আয়া আপ মুঝে সহি ঢঙসে বাতা দিজিয়ে।"

আন্দাজে মনগড়া একটা বোল্ডারের বিবরণ দিল সে। যে বোল্ডারের কোনও অস্তিত্বই নেই তেমন একটা বোল্ডারের আকৃতি ও অবস্থান সে ভাল করে দিরাং-কে বুঝিয়ে দিল। দিরাং চোখের আড়ালে চলে যেতেই কাজে লেগে পড়ল ধীর।

প্রথমেই ধীর উপর থেকে ঢালে গড়িয়ে পড়া কোনও বোল্ডার খোঁজার ব্যাপারে নজর দিল। তাঁবু থেকে তিন মিনিট হাঁটা দূরত্বের মধ্যে তেমন একটা বোল্ডারের সন্ধান পাওয়া গেল। গড়ানো বোল্ডারটা নিতান্তই ছোট। ঠেলে দিলে একজনই তা নীচে গড়িয়ে দিতে পারে।

টি. সি. লেখা বড় বোল্ডারের নীচেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল। ওই সময়ই পাসপোর্ট গায়েব হলে কাছাকাছিই তা থাকার কথা। কিন্তু দেড় ঘন্টা ধরে তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাউচ লুকিয়ে রাখার মতো সম্ভাব্য জায়গা সে দেখতে পেল না। অসংখ্য পদচিহ্নের দাপাদাপিতে বিধ্বস্ত ভূমিতে দাঁড়িয়ে সে খুব অসহায় বোধ করল। নিজের প্রতি ভয়ানক বিরক্ত হল সে। আদ্যন্ত নির্বোধ না হলে কেউ খড়েব গাদায় সূঁচ খোঁজে! তাঁবুতে ঢুকে ক্লান্ত শরীরটা টানটান করে শুয়ে পড়ল ধীর।

অনেকক্ষণ তার চা খাওয়া হয়নি মনে হতেই তাঁবু থেকে সে বেরিয়ে এল। চা-চিনি-দুধ সব প্যাকিং-এ চলে গিয়েছিল সুতরাং নালায় গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে আসার ইচ্ছে হল। শরীরটা সত্যিই তার জুড়িয়ে গেল। তখনি সানজিদেবী ও ইরিকা টোর-এর সঙ্গে তার কথাবার্তার ঘটনা মনে পড়ে গেল। কোথাকার কে এক মেমসাহেব আর মাতাজি বললেন আর অমনি পাসপোর্ট খুঁজতে সে বেরিয়ে পড়ল। এমন বোকা কাজে তার এত আগ্রহ, সে নিজেই খুব অবাক হল। গুরুজিব নির্দেশ পালন করা মানেই তাব কাজ শেষ। তারপর, দ্বিতীয় নিঃশ্বাস পড়ার আগেই মাচদা। আর সে কিনা ...!

"বহত ঢুঁড়া সাব, মগর নেহি মিলা। সাচমুচ গুম হো গ্যায়া।"

ঘড়িতে তিনটে। এতক্ষণ পার হয়ে গেল অথচ সে টের পেল না! অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল দিরাং। খুব মায়া হচ্ছিল তাকে দেখে। ধীরের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য সরল একটা মানুষকে অকারণে এত পরিশ্রম করতে হল। নীচে নামার সিদ্ধান্ত নিল ধীর।

"তা হলে চলো আমরা নীচে নেমে যাই।"

"বহত থকা হুয়া সাব। কল সুব্‌বে নীচে উতরেঙ্গে।"

ধীরের আর মোটেই ওখানে থাকার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দিরাং-এর কথা ভেবে সে থেকে গেল। চা-চিনি দিরাং বের করে দিতেই ধীর চা বানিয়ে দিরাং-এর হাতে দিল। চা নিয়ে সে তাঁবুতে বিশ্রাম নিতে চলে গেল। ঠায় চুপচাপ বসে ধীর সন্ধে গড়িয়ে দিল। রাতে স্রেফ ডালের সুপ খেয়ে শুয়ে পড়তে হল। নিতান্তই অপ্রয়োজনে কৌশলের কিল খেয়ে দিনটা কাটাতে হল।

ভোরে উঠে স্যাক প্যাক করার সময় তার টর্চের কথা মনে পড়ল। দিরাং-এর নজর এড়িয়ে কাজটা করা দরকার। ধরা পড়ে গেলে বেইজ্জতির চূড়ান্ত। হামাগুড়ি দিয়ে ফাটলের মধ্যে হাত ঢোকাতেই টর্চটা সুন্দর তার হাতে চলে এল। টর্চ নিয়ে উঠে দাঁড়ানোর সময় হঠাৎ তার মনে হল কোনও পোকাটোকা বোধহয় তার হাত ছুঁয়ে গেল। শুয়ে পড়ে ফাটলে চোখ রাখতেই পা-জামার দড়ির মতো কিছু একটা ঝুলতে দেখল ধীর। ওখানে দড়ি! ফাটলের ঠিক উপর থেকে দড়িটা ঝুলছিল। দড়িটা ধরে হালকা টান দিতেই তার চোখ দুটি ঠিকরে বেরিয়ে

আসতে চাইল। উত্তেজনায় থরথর করে তার সারা শরীর কাঁপতে থাকল। তবু সে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। অতি দ্রুত পাউচটা তুলে উইণ্ড প্রুফের মধ্যে ঢুকিয়ে তার রুকস্যাকের কাছে এসে দাঁড়াল ধীর। ঠিক ওই সময় এক ঝাঁক পাহাড়ি পাখি তার মাথার উপর দিয়ে হিক্‌হিক্‌ পাঁউপাঁউ শব্দ করে বেরিয়ে গেল।

"ক্যায়া সাবজি, অব চলে?"

মুখ দিয়ে একটা হ্যাঁ বললেই উত্তর দেওয়া যেত কিন্তু তার মুখ খুলল না। মনে হল তার গায়ে প্রচণ্ড জ্বর, দু-কদম হাঁটলেই সে পড়ে যেতে পারে। অথচ দিরাং এসবের কিছুই লক্ষ করল না। পিঠে বোঝা রেখে নীচে নামতে এগিয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও সেদিন তারা মাচদা পৌঁছাতে পারেনি। মাচদা থেকে মাত্র দু'ঘন্টা পথ-দূরত্বে তাদের রাত কাটাতে হল। অল্প চাল ফুটিয়ে ভাত এবং সঙ্গে অনেক দিন ধরে জমিয়ে রাখা সার্ডিনের একটা ছোট্ট টিন খুলে বড়াখানা তৈরি করল দিরাং। ভোর হতেই মাতরা নালা ছেড়ে সর্টকাট ধরে আধঘন্টার মধ্যেই পায়ে চলা পথে তারা পৌঁছে গেল। সরাসরি দিরাং-এর ঘরে গিয়ে উঠল ধীর। দশ দিনেব মাথায় তারা মাচদায় ফিরল অর্থাৎ শনিবার বেরিয়ে এক সোমবার পার করে দ্বিতীয় সোমবার।

বিনতির কাছে জানা গেল মাতাজি ধীরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। ফিবে এলেই যেন বিনতি সরাসরি তাঁকে খবরটা দিয়ে আসে। মাতাজি তার সামনে এসে যে অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলতে পারেন এমনটা সে কল্পনাই করেনি। আশ্রমে গিয়ে এক সপ্তাহ শ্রমদান করে সে সবে শনিবারই ফিরে এসেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এবার বিশওয়াস দাদা কোথায় গেছে আপাং কেনি একবারও বিনতির কাছে জানতে চায়নি। তবে দিরাং ফিরে এলেই যেন তার সঙ্গে দেখা করে এটা বিনতিকে বেশ কয়েকবার বলে রেখেছে। দশ সেকেণ্ড পব মনের মধ্যে খুট্ করে একটা খিল খোলার শব্দ শুনতে পেল ধীর। দারুণ হালকা মনে হল তার নিজেকে। শেষ পর্যন্ত দিরাং-এর হিল্লে তা হলে হল।

বিকেল চারটেয় ধীর মাতাজির সঙ্গে দেখা করতে চায় সেই খবরটা দিতে বিনতি তখনি আশ্রমে রওনা হয়ে গেল। দিরাং-ও তার সঙ্গে গেল। এতদিন পর দেখা, বউ-এর সঙ্গে একটু আঠা হয়ে থাকতে কার না ইচ্ছে করে। ধীর কিছু বলল না।

প্রায় তিরিশ ঘন্টা ধরে ধীর চরম উত্তেজনা চেপে রেখেছিল। দিরাং তার বিন্দুবিসর্গও জানে না। স্যাকের মালপত্র বের করে তলা থেকে সেই পাউচ তুলে নিয়ে এল সে। বাদামি রঙের সুন্দর পাউচ। ভিতরে ভেলভেট দিয়ে নক্‌সা করা। টাকা ও পাসপোর্ট দিব্যি মজুত। তবু একটু সন্দেহ হল তার। কারণ নতুন টাকার বাণ্ডিল হলেও পিন খোলা। হয়তো ম্যাডামই

খুলে রেখেছিলেন। গুণে দেখল ধীর। একশ টাকার একশটা নোট হওয়ার কথা কিন্তু বারবার গুণেও হল পঁচানব্বুই। পিন খুলে পাঁচটা নোট অন্য কেউ সরিয়ে নিলে সে হাতে অনেকটাই সময় পেয়েছিল। ম্যাডাম টের পাননি। পাসপোর্টে বয়স দেখে ধীর বুঝল ইরিকা টোর তার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। কানাডার এডমন্টন তাঁর জন্মস্থান। ভূগোলে ধীরের খুব আগ্রহ। চোখ বন্ধ করে সে ভাবতে থাকল। হঠাৎ কানাডার মানচিত্র তার সামনে ভেসে উঠল। এডমন্টন কানাডার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। রকি, ম্যাকেঞ্জি ও আলাস্কা পর্বতশ্রেণী ছাড়াও মাউন্ট লোগান শৃঙ্গ তাঁর জন্মস্থানের হাতের কাছেই। সুতরাং পাহাড় ইরিকার কাছে অতি পরিচিত স্থান। তাকে হঠাৎ বিষম খেতে হল। জন্মচিহ্নের বিবরণ পড়ে ধীর থ্ মেরে গেল। জন্মচিহ্ন হিসাবে শরীরের যে স্থানের উল্লেখ পাসপোর্টে করা আছে তা নিতান্তই কুরুচির পরিচয়।

কৌশল

পাহাড়ের চড়াই-উৎড়াই যার কাছে স্বর্গসুখ সে কিনা গোয়েন্দাগিরিতে পাহাড় একসা করতে এক পায়ে খাড়া! ধীর ঠিক বুঝতে পারল না কেন সে খামোখা নিজেকে অর্থহীন পরিশ্রমে ব্যতিব্যস্ত করতে চায়। চাসু উপত্যকার পরিস্থিতি এখন এমনই ঘোরালো যে হিসাবে ভুল হলেই সে বিপদের মুখে পড়ে যেতে পারে। যতই তেজি মানুষ হোক, সে একা। আচমকা আক্রমণের মুখে পড়লে তার করার কিছু থাকবে না। তার প্রমাণ সে পেয়েছে। সেদিন ছেরিং পালকো-র উপর তার অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনও কারণই ছিল না। সে ঠিক পরামর্শই দিয়েছিল তাকে। নিজেকে বাঁচিয়ে কোনও মতে বেঁচে থাকাই এখন প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুতরাং এর পর থেকে হিসাব করে তাকে পদক্ষেপ নিতে হবে। সে কিছু দেখবেও না কিছু শুনবেও না।

ধীর যে প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলেছে এটা সে বিলক্ষণ জানে। কিন্তু এও জানে যে পাউচ পাওয়াটা নিতান্তই কাকতালীয় ঘটনা। ওটা তার কেন কারও পাওয়ার কথা নয়। দিরাং-কে দূরে পাঠানোর কৌশল নিরিবিলিতে অনুসন্ধান চালানোর জন্যই। তার অজুহাত হিসাবেই টর্চ লুকিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত। চটজলদি ওটাই তার মাথায় এসেছিল। ছোট্ট টর্চটা লুকিয়ে রাখার আরও জায়গা ছিল। অথচ ধীর সেই চেনা টি.সি. বোল্ডারের তলায় টর্চটা লুকিয়ে রাখতে গেল। সকালে টর্চ বের করার পরও সে কিছুই টের পায়নি। ওই সময় হাতে কিছু একটা লেগে থাকতে পারে এটা মনে হওয়ার কথাই নয়। হলেও ওই ব্যস্ততার সময় কেউ সেটা পরখ করে দেখতে যায় না। কিন্তু সে নিচু হয়ে, প্রায় শুয়ে পড়ে, দেখেছিল। পাউচটা ওখানে যে লুকিয়ে রেখেছিল তার দুর্ভাগ্যই বলতে হয়। পাউচে ফাঁস দেওয়ার এক পাশের সুতো ফাটল দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তাড়াহুড়োয় সে খেয়াল করেনি। অথচ যার খেয়াল করার কথাই নয় সে করল এবং বিশাল এক বাজি জিতে গেল। এতটা সময় পার করাব পরও কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাটার কথা ভেবে এখনও তার শরীরে কাঁটা দেয়।

ইরিকা টোর তাঁর পাসপোর্ট ও টাকার পাউচ নিজেই ওখানে লুকিয়ে রেখে নীচে নেমে আসবেন সেটা হয় না। তা হলে ওটা সোনাম চিকুরই কাজ। পরিষ্কার মগজে ছিমছাম পরিকল্পনা তবু তাকে হেরে যেতে হল। কাব বাহাদুরির কাছে সে ঠকে গেল জানতে পারলে সোনাম হিংস্র হয়ে উঠবে। উপত্যকার মধ্যে থেকে সে সেই ঝুঁকি নিতেই পারে না। তার মনের মধ্যে কী ঘটে চলেছে তা যাতে কাকপক্ষিও টের না পায় এটা তাকে খেয়ালে রাখতে হবে। ভাবতে ভাবতে অনেকটা সময় কেটে গিয়েছিল। বিনতিদের ফেরার সময় হয়ে আসছিল। পাউচটা সম্ভবত টাইম বোম-এর মতোই বিপজ্জনক। সঙ্গে রাখার প্রশ্নই নেই। কিন্তু পাউচের কী গতি করবে ধীর ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। ঘরের চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে হঠাৎ

একটা কালো জেরিক্যান তার নজরে পড়ল। পাথরের ছাউনির নীচের কাঠ থেকে তার দিয়ে ঝোলানো। জেরিক্যানের উপরটা কেটে মুখটা বড় করা। ওটার নাগাল পেতে হলে কোনও কিছুর উপর উঠে দাঁড়াতে হয়। বিনতিদের ঘরে সে সবের বালাই নেই। কাঠের বর্গা ধরে চিন-আপ করে ধীর জেরিক্যানের কাছে গেল। যেদিন থেকে ওটা ঝোলানো ছিল তেমনি ঝুলে আছে। অর্থাৎ তার প্রয়োজনের জন্য একেবারে সঠিক জায়গা। পাউচটা ওটার ভিতরে ঢুকিয়ে দিতেই জেরিক্যানটা নড়ে উঠল। কয়েক সেকেণ্ড পর ফের যেমন ঝুলে ছিল তেমনি স্থির হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখল—না, কোনও সুতো ঝুলে নেই। নিজের অভাবনীয় বুদ্ধিমত্তার তারিফ করে ঝুপ্ করে নীচে নেমে এল। সারা জামাকাপড়ে ঝুল ও কালি মেখে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখে সামনে বিনতি। তাকে কালিঝুলি মাখা অবস্থায় দেখে বিনতি অবাক। সে অবাক হলেও ধীর শান্ত থাকল। তার প্রশ্ন শুনল কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

"আপ ক্যায়া কর রহে থে সাবজি? চেহেরে অ্যায়সা কালা ক্যাযসে হুযা?"

"সানজিমাতা ক্যায়া বোলা তুমহে? ক্যায়া, ম্যায় উনকি সাথ ভেট কব স্যাকতা?"

অগত্যা বিনতিকে সাবজিব প্রশ্নেব উত্তব দিতে হল।

"জি সাব্! মাতাজি আপকে লিয়ে চার বজে ইন্তেজার করেংগি।"

খুশি হয়ে ভিতবে গিয়ে তার স্যাক গোছাতে লেগে গেল ধীব। তাবই ফাঁকে বিনতির নজর কোনদিকে সেটা আড়চোখে দেখে নিল সে। চতুর্দিকে ছড়ানো মালপত্র নিয়ে তার হন্তদন্ত ভাবভঙ্গি ছাড়া অন্যকিছু বিনতি দেখছিল না। তার মানে একটুর জন্য সে ক্যাচ-কট হয়নি।

দুপুরের খাবার বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিনতি। মিনিট দশ পরে দিরাং ঢুকল সামান্য চড়িয়ে। মজায় সে টং। হাতে করকরে নোট - একটু আধটু স্ফূর্তি না করলে চলে।

এমন অবস্থায় দিরাং-কেই তার যত ভয়। শঙ্কায় থাকে ধীর—এই না সবকিছু উগরে দেয়। আশ্চর্যের ব্যাপার সাহেবের নিষেধ থাকলে কোনও অবস্থাতেই তার কাছ থেকে কিছু বের করা সম্ভব হয় না। একটু কড়া চোখে তার দিকে তাকাতেই ধীরকে পাশ কাটিয়ে সে বিনতির কাছে গিয়ে বসল। দ্রুত স্যাক গুছিয়ে ধীর খোলা বারান্দায় এসে বসল। দুরন্ত মনকাড়া দৃশ্যের সামনে অন্য সব চিন্তা তার মন থেকে অদৃশ্য হল। সুন্দর একটা আমেজ তার সারা শরীরে মাখামাখি হয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঝুলে থাকল। তার মনে হল, কচিকাচা বাচ্চাদের একটা দঙ্গল তার শরীর ধরে যেন চরকির মতো পাক খেতে ব্যস্ত।

"সাবজি, খানা!"

গরম ভাতের সঙ্গে মুগডাল ছড়ানো। সঙ্গে সামান্য আলু আর আরবির ঘন্ট। পেটের মধ্যে দুরমুশ পড়া থেমে গেল। বড় ভাল রান্না করে মেয়েটা। অল্প আয়োজন অথচ কী রাজকীয়

স্বাদ! পাহাড়ে রাজমা ও মুসুর ছাড়া অন্য ডাল মানেই, জয় শঙ্কর ভোলেনাথ! অর্থাৎ প্রসাদ পাওয়ার মতো ব্যাপার। ঢেকুর তার বড় একটা ওঠে না কিন্তু উঠল। নিজে গিয়ে মেসটিন পরিষ্কার করে নেওয়ার পাহাড়ি অভ্যাস বিনতির কাছে চালানোর উপায় থাকে না। ঠিক সময়ে মেসটিন নিয়ে ভিতরে চলে যায়। পাহাড়-সমতল যাই হোক, মেয়েরা সর্বত্রই এক — শুধু সেবা, আরও আরও সেবা!

কোনও মতে খাওয়া শেষ করেই দিরাং ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়ল। নেশা চড়লেই এমন হয়। মাতাজির সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার তখনও প্রায় দেড় ঘন্টা দেরি। ডায়েরি লেখার কাজটা সেরে নিতে চাইল ধীর। ইচ্ছে করেই ডায়েরিতে পাসপোর্ট প্রসঙ্গ উহ্য রাখল। ডায়েরি লেখা শেষ করে উঠে দাঁড়ানোর মুখে বিনতি তার পাশে এসে দাঁড়াল।

"ক্যায়া বাত, বিনতি?"

"দিশ আভি লেড়কি নেহি হ্যায় সাব। ওহ্ আওবত বন গ্যায়ি। উসকি আভি আদমি চাহিয়ে।"

এত সহজে তার সঙ্গে এমন কথা বলতে পারল বিনতি!

দিশ এখন আর বালিকা নয় সে পুরোদস্তুর মেয়ে। তার এখন পুরুষমানুষ দরকার! হয়তো নিরুপায় হয়েই বিনতিকে এমন কথা বলতে হয়েছে। তাব ধারণা সাহেব হয়তো মাতাজিকে বলে ওর ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নিতে পাবে। কী ঘটেছে বিলক্ষণ বোঝে ধীর তবু জানতে চাইল।

"কিঁউ, ক্যাযা হুয়া?"

কী হয়েছে সেটা বলল না বিনতি। তবে দিশেব হাবভাব দেখে ধীরও এমন কিছু হতে পারে আশঙ্কা করেছিল। ওই পরিবেশে মাতাল লোকেদের আড্ডায় অমন ডগডগে একটা মেয়ে দুষ্টুমি করতে চাইলে যা ইচ্ছে তাই হতে পারে। হল-ই বা বোবা!

"আপ মাতাজিকো বলিয়েগা জো দিশকি হোটেলসে বাহার লে জানা বহত জরুরি।"

বিনতি একই ভাবে তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। দিশকে হোটেল থেকে বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া খুব জরুরি এ কথা সে কি সানজিদেবীকে বলতে পারে? দিশ খুব ভাল মেয়ে এটাই বিনতি জানত। তাব বোধহয় সে ধারণা ভেঙে গেছে। সে জন্য খুব কষ্টে আছে বিনতি। তা ছাড়া, তার কাছেও এটা চিন্তার কারণ। ধীর আশ্রম থেকে ফিরে এসেই হোটেলে গিয়ে উঠবে। একটা ব্যবস্থা না করে উপায় নেই।

"দিশকি বারে মাতাজিকো ম্যায় জরুব বলুঙ্গা। তুম চিন্তা মাত কবো।"

বিনতি চলে গেল। ধীরও ধীরে ধীরে ঢাল ধরে নীচে নামতে থাকল।

বিনতির সঙ্গে এবারই তার ভাল করে পরিচয় হল। পাহাড়ের বেশির ভাগ মানুষই যেমন চমৎকার স্বভাবের হয় বিনতিও ঠিক তাই। তার অনেক সমস্যা, জানে ধীর। দুটো ভিন্ন ধরনের মানুষের মেজাজমর্জি বুঝে তাকে চলতে হয়। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তাকে ঠিক ভাল স্বভাবের মেয়ে বলা যায় না। কিন্তু ধীর জানে বিনতিকে যা করতে হয় তার জন্য সে দায়ী নয়। অবস্থার অনিবার্য চাপে সে একটা সমাধানসূত্র বের করে নিয়েছে। ধীরের মতে সে সঠিক পন্থাই বেছে নিয়েছে। তার কাছে বিনতি অত্যন্ত সুন্দর মনের মানুষ। তার ভাল হয় এমন কিছু করতে সর্বদাই সে চেষ্টা করে যাবে। কিন্তু দিশের ব্যাপারে তার কোনও দায় নেই। বিনতির অনুরোধ সে শুনল কিন্তু সেইমতো কিছু করার মধ্যে সে নেই। সানজিমাতা, আপাং কেনি এবং নগলি থাকা সত্ত্বেও যখন দিশ অবহেলার শিকার তখন সেটাই তার ভবিতব্য। কই, একবারও তো নগলি দিশের কাছে গিয়ে তার কী অসুবিধে জানতে চায়নি। অথচ ধীরের কাছে সে কী উৎকণ্ঠা তার! এসব নাটকে আব তার কোনও ভূমিকা থাকবে না।

সানজিদেবীব সময়জ্ঞান সত্যিই প্রশংসা কবার মতো। তখনও চারটে বাজতে মিনিট দুই বাকি, মন্দিরের পাশে শুনশান অবস্থা। ওই সময অবশ্য কাবণ না থাকলে মানুষজন থাকে না। ভক্তদের ভিড় জমে সকালে এবং সন্ধে ছ'টায়। ঘড়ির কাঁটা চারটের ঘর ছুঁতেই একজন আশ্রমিক মহিলা তাব কাছে এসে মাথা নোয়ালেন। ওটাই ওখানে সম্ভাষণ জানানোর রীতি।

আগের দু'বারের মতো এবার এঘর-ওঘর এদালান-ওদালান করে উপর-নীচ করতে হল না। অন্যবারে আশ্রমেব ডানপ্রান্তে তাকে প্রবেশ কবতে হয়েছিল। এবার বামপ্রান্তে অল্প মিনিট খানেক গিয়েই একটা মাঝারি সাইজের ঘবে গিয়ে ঢুকে পড়ল আশ্রমিক মহিলাটি। তার পিছনে সে-ও। জুতো খোলার প্রয়োজন হল না। ঘরের মধ্যে চেযার-টেবিলের অবস্থান দেখলেই বোঝা যায় ওটা ড্রইং রুম। মহিলাটি তাকে বিশেষ কোনও চেয়ারে বসতে বললেন না। ফলে তাঁর মতো ধীরও দাঁড়িয়ে থাকল। মাত্র দশ সেকেণ্ড—তারপরই সানজিদেবী ঢুকলেন। মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। গোল টেবিলের চারধারে ছ'টা হাতলওয়ালা চেয়ার। যে অনাড়ম্বর পরিবেশের সঙ্গে সে পরিচিত ছিল তার সঙ্গে ঘরটার কোনও মিল খুঁজে পেল না ধীর। সানজিদেবী ওই ঘরে সম্ভবত অতিথি আপ্যায়নের কাজটা করে থাকেন। আসবাবপত্র, দেওয়ালের রঙ, মেঝের কার্পেট, দরজা-জানালার পালিশ সবকিছুর মধ্যেই জৌলুস উচ্চগ্রামে পরিস্ফুট।

ধীরকে চেয়ারে বসতে বলে সানজিদেবী তার মুখোমুখি বসলেন। মাঝখানে গোলটেবিলের পাঁচফুট দূরত্ব। মাতাজি মেরুনে মোড়া — শরীরের বাকু ও মাথার স্কার্ফ সবই মেরুন বঙের। ধর্মীয় আচকানের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ঢেকে রাখলেও তাঁব শরীরী

আবেদন বিন্দুমাত্র কমেনি। গত দু'বার যেমন ঢুকেই প্রশ্ন ও উত্তরের আড়ালে চলে গিয়েছিলেন এবার তা হয়নি। পর্যবেক্ষণ করার সময় পেয়েছিল ধীর। কোনও তাড়াহুড়ো ছিল না। তার হঠাৎ মনে হল, সানজিদেবী সম্ভবত কারও জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু তার ধারণা সঠিক নয়। তিনি কথা শুরু করলেন—এই প্রথম কোনও সাহায্যকারী ছাড়াই।

— যাঁরা আমাদের বন্ধু, আশ্রমের মঙ্গল কামনা করেন তাঁদের আমরা এই ঘরে এনে বসাই।

ধীরকে যে আশ্রমের শুভানুধ্যায়ী হিসাবে ভাবা হয়েছে এটা পরিষ্কার করে দিলেন। যেহেতু কোনও প্রশ্ন নয় তাই উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হল না। ইরিকা টোর ছাড়াই কথা শুরু হতে পারে এটা ভাবেনি ধীর।

— নগলি আপনার ভাল বান্ধবী বলেছিলেন তবু তার সঙ্গে আপনার বিবাদ হল কেন?

ছ্যাঁৎ করে উঠল ধীরেব বুক! সানজিদেবীর তো এটা জানার কথা নয়! সারা উপত্যকাতেই কি তাঁর গুপ্তচর ছড়ানো আছে! অত্যন্ত সতর্ক থেকে তাকে জবাব দিতে হবে। না হলেই বিপদ বেড়ে যেতে পারে।

— ঠিক বিবাদ নয়। দিশ বোবা মেয়ে, তার নিরাপত্তা নিয়ে নগলি কিছুটা চিন্তিত। আমি বলেছিলাম, এ নিয়ে এত চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই।

— ঠিকই তো! দিশকে নিয়ে নগলির এত উদ্বেগের কারণ কী বলে আপনার মনে হয়?

বারুদের স্তূপে পা পড়ার মুখে যে ধীর বিশ্বাস এটা বুঝতে তার আর বাকি থাকল না। নগলির সমস্যাও তা হলে কিছু কম নয়!

— দিশের মা নগলির কাছে থাকেন। সম্ভবত তাঁর উদ্বেগ থেকেই নগলি চিন্তিত হয়ে পড়ছে।

তার উত্তর শুনে সানজিদেবী খুশি হলেন বলে মনে হল ধীরের।

— দিশের সমস্যা হল ও আশ্রম বা সংসারে থাকার মতো মেয়ে নয়। হাজার চেষ্টা করলেও ফল ভাল হওয়ার নয়। এমন স্বভাবের মেয়ে কখনও শুভ হয় না।

সানজিদেবীর কথার উপরে আর কোনও অন্য কথা হতে পারে না। ধীর চুপ করে থাকল। তবু তিনি দিশকে কেন হোটেলে পাঠালেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। মনে হয় তার মনের কথা পড়তে পারলেন মাতাজি।

— লালাজির হোটেলে গেলে সস্তায় সুখ পাওয়া যায়। যে ক'দিন আছে দিশ ওখানেই থাকুক। আমার সিদ্ধান্ত তাই। বোবা না হলে অন্যভাবে ভাবা যেত।

যে ক'দিন আছে মানে! কী বলতে চান সানজিদেবী?

— আপনার মালপত্র কোথায় রেখেছেন?

— আপাতত দিরাং-এর ঘরে। আপনার এখান থেকে গিয়েই আমি আপাং-এর হোটেলে চলে যাব।

— ইচ্ছে হলে আপনি আমাদের এখানেও থাকতে পারেন। আশ্রমের বাইরে আমাদের দুটো ঘর আছে। অল্প সময়ের জন্য আমরা অতিথিদের ওখানে থাকার অনুমতি দিই।

অবাক হল ধীর। মাতরা হিমবাহ ঘুরে আসার পর যে কথা মাতাজির ধীরকে সবার আগে জিজ্ঞেস করা উচিত সে পথে কেন উনি যেতে চাইছেন না! তা হলে পাসপোর্ট আর টাকার কথা কি উনি ভুলেই গেলেন! ওই প্রসঙ্গে না গিয়ে সে আসল কথা পাড়ল।

— চাসু উপত্যকায় আমার আর থাকার প্রয়োজন নেই। হাতে কিছু সময় আছে তাই তামিন উপত্যকায় যাব ঠিক করেছি।

— তা কী করে হবে! আমার তো আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

ধীর যে হঠাৎ চাসু থেকে ফিরে যাওয়াব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে এটা মাতাজি ধারণাতেই আনতে পারছিলেন না। তার উত্তরের অপেক্ষায ছিলেন।

— আপনাব প্রয়োজনে আমি নয়তো আরও কয়েকদিন থাকব।

কোনও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন মাতাজি হঠাৎ ইরিকা টোর ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে বেশ ম্রিয়মান বলে মনে হল ধীরের। খুব শান্ত ভঙ্গিমায় মাতাজির চেয়ার থেকে দুটো চেয়ার ছেড়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধীরের কাছে জানতে চাইলেন।

— পাসপোর্টের হদিশ করতে পারনি?

— না। আমার কাজের মধ্যেই সময় বের করে বিস্তর খুঁজেছি কিন্তু কোনওভাবেই হদিশ করতে পারিনি।

— জানতাম, এটা সম্ভব নয়। তোমাকে একটা বাজে অনুরোধ করে প্রচুর অসুবিধেয় ফেলে দিয়েছিলাম।

— না ম্যাডাম, আপনার কাজ করতে গিয়ে আমার কোনও অসুবিধে হয়নি।

— দিরাং জানে ব্যাপারটা?

— না, বিন্দুমাত্র টের পায়নি। গোপনে আমি যে অন্য একটা কাজও করছি এটা ও জানে না।

— ডোলি উপত্যকায় যাওয়ার রাস্তা পেলে?

সংক্ষেপে ধীর তার অভিমত জানাল। যাওয়া অসম্ভব এমন কথা সে বলেনি। যাওয়া হয়তো যায় তবে তার পক্ষে সম্ভব নয় এটা সে জানিয়ে দিল। মন দিয়ে শুনলেন ইরিকা টোর।

— তুমি যে পাথরের দেওয়ালের কাছে গিয়ে আটকে গেলে ওই পথ ধরে গিরিশিরায় ওঠা যায়?

— গিরিশিরায় ওঠা যায় কি না আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় তবে সরঞ্জাম থাকলে দেওয়াল ধরে উপরে ওঠা যায়।

ইরিকা এমন প্রশ্ন করলেন কেন বুঝতে পারল না ধীর। উনি কি ওখানে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে চান। একটু চিন্তায় পড়ে গেল সে। রকে চড়ার ভাল অভিজ্ঞতা না থাকলে ওই রুট ধরে না যাওয়াই ভাল। সে কিছু বলল না। কিন্তু সানজিদেবী বললেন।

— পাসপোর্ট হারিয়ে গেলে দ্রুত থানায় খবর দিতে হয়। ইরিকা কালই তামিন থানায় যেতে চান। আপনি সঙ্গে থাকলে ওর বোধহয় সুবিধা হয়।

ইরিকা টোব সানজিদেবীর দিকে তাকালেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধীরকে লক্ষ্য করে হাসলেন।

— প্রথমে তাই-ই ভেবেছিলাম তবে এখন ভাবছি সোনামকে সঙ্গে নিয়েই যাওয়া উচিত। ও তো আমার সঙ্গে ছিল।

ধীর চুপ করে থাকলেও সোনাম যে মাত্র দশদিনেই চাঙ্গা হয়ে উঠেছে এটা জেনে অবাক হল। এত দ্রুত সে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে এটা তার মনে হয়নি। সানজিদেবী বোধহয় জানতে চান ইরিকা ম্যাডামের সঙ্গে থানায় যেতে তাব কোনও অসুবিধে আছে কি না।

— ম্যাডামেব সঙ্গে তামিন থানায় যেতে আমাব কোনও অসুবিধে নেই। তবে আমার মনে হয় এখনই থানায় যাওয়ার দরকার নেই। সোনামকে নিয়ে তো একেবারেই নয়।

ইরিকা টোর বিরক্ত হলেন বুঝতে পারল ধীর।

— কেন, সোনামকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না কেন?

একটু চাঁছাছোলা উত্তর হলেও ধীরকে বলতে হল।

— কারণ আপনার সঙ্গে ছিল তাই। পুলিশের সন্দেহ তাব দিকেই পড়বে। তাকে কঠিন জেরার মুখে পড়তে হবে। এমনকী সত্যি কথা বের করার জন্য পুলিশ সোনামকে হেনস্থা করতে পারে।

প্রচণ্ড ক্রোধ ফুটে বের হল ইরিকা টোরের বক্তব্যে।

— পাসপোর্ট হারানোর সঙ্গে সোনামের যে কোনও সংযোগ নেই এ তো আমি আগেই বলে দেব। তারপরও তাকে পুলিশ কেন সন্দেহ করবে তা তো আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

— পুলিশের কাজই হল সন্দেহ করা। এটা বোঝার জন্য পুলিশ হতে হয় না।

ইরিকা ও ধীরের মধ্যে কিছুটা উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হওয়া সত্ত্বেও সেদিকে সানজিদেবীর নজর পড়ল না। ধীর কী বলেছিল সেটা তাঁর মনে পড়ল। তার জের টেনে তিনি জানতে চাইলেন।

— বিশ্বাস, আপনি এখনই থানায় যাওযাব পক্ষপাতী নন। কী কারণে?

অন্য কথার মধ্যে তার এই অভিমত হারিয়ে গিয়েছিল। সানজিদেবী ঠিক মনে বেখেছিলেন। অথচ ইরিকার মনে নেই, ধীবের বিশ্বাস। এই প্রথম তাকে পদবি দিয়ে সম্বোধন কবলেন সানজিমাতা।

— আমার কেন জানি মনে হয ম্যাডামের পাসপোর্ট পাহাড়ের উপরে নেই। শীঘ্রই উনি উনার পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন।

অসম্ভব বিরক্ত হয়ে পড়লেন'ইবিকা।

— মানে! তুমি কী বলতে চাইছ?

গল্পটা সাজাতে অল্প সময় নিল ধীর। কাজটা যে সোনামের এটা ইবিকাকে কিছুতেই বুঝতে দেওয়া চলবে না।

— আমি বলতে চাইছি পাহাড়ের উপরে আপনার পাসপোর্ট হারায়নি। এবং এর সঙ্গে সোনাম চিকুর কোনও সম্পর্ক নেই।

— তা হলে আপনি কী করে বলছেন পাসপোর্ট ইরিকা শীঘ্রই পেয়ে যাবেন?

— কারণ পাসপোর্টের সঙ্গে প্রচুর টাকাও রাখা ছিল। টাকা যাদের দরকার পাসপোর্ট তাদের দরকার নেই। তাই আমার অনুমান, অভিনব কোনও উপায়ে পাসপোর্ট ইরিকার

কাছে চলে আসতে পারে।

সানজিমাতা ও ইরিকা দু'জনই তার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

— বুঝলাম। কিন্তু সোনামের সঙ্গে পাসপোর্ট হারানোর কোনও সম্পর্ক নেই এটা কেন আপনার মনে হল?

— সোনাম ভাই ম্যাডামের অত্যন্ত অনুগত। পাসপোর্ট খোয়া গেলে উনি চাসু ছেড়ে যেতে বাধ্য হবেন তা সোনাম ভালই জানে। এটা সে কখনই চাইবে না।

এই প্রথম ইরিকা টোরকে ধীরের স্বাভাবিক বলে মনে হল। সবার সন্দেহের তীর সোনামের দিকে এটা বুঝতে পেরে তিনি খুব কষ্টে ছিলেন। যাকে তিনি সোনামবিরোধী বলে ভেবেছিলেন সে-ই যে সোনামের পক্ষে সওয়াল করতে পারে এমনটা তিনি ভাবতে পারেননি। তাই তিনি ধীরের প্রতি হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে গেলেন।

— ধীর, সোনাম সম্বন্ধে তোমার অভিমত পুরোপুরি ঠিক। তোমাকে ধন্যবাদ। এবার বলি, একটা ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাই। তুমি কিন্তু না বলবে না।

— কী ব্যাপারে আপনি আমার সাহায্য চান?

— আগে বল তুমি আমাদের প্রস্তাবে রাজি হবে।

— পাহাড়ে যাওয়ার ব্যাপার হলে আগেই জানিয়ে দিচ্ছি সেটা এখনই সম্ভব হবে না। তা ছাড়া, মাতাজির প্রয়োজনে আমি আরও কয়েকদিন এখানে থাকব। তারপর চলে যাব।

হঠাৎ চুপসে গেলেন ইরিকা টোর। এভাবে মুখের সামনে না বলে দিতে পারে ধীর তিনি ভাবতে পারেননি। সানজিদেবীর মুখের দিকে ইরিকা তাকাতেই কিছু যেন একটা ঘটে গেল। কী ঘটল ধীর বুঝতে পারল না। তবে সম্ভবত তাকে বোঝাতে মাতাজি আসরে নামলেন।

— আসলে ইরিকা যে প্রস্তাবের কথা বলছেন সেটা নাংগেল তাফা-র প্রস্তাব।

— কাল সকালেই আমি লুনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। তাঁর নির্দেশেই আমি মাতরা গিয়েছিলাম। তাঁকে সব জানানো দরকার।

— উনি এখন আশ্রমেই আছেন। আপনি বরং এই প্রস্তাবের ব্যাপারটা তাঁর মুখ থেকেই শুনে নিন।

ধীর কিছু বলল না। দু'জন মহিলা যথেষ্টই বুদ্ধি ধরেন। সরল মানুষ তার গুরুজি। তাঁকে কৌশল করে বোঝানো হয়েছে এটা বুঝতে তার আর বাকি নেই। তবে ওদের জানা নেই এখনও ধীর বিশ্বাসের তার গুরুজির উপর অসীম প্রভাব। কোনও কিছু সে না করতে

চাইলে নাংগেল তাফা তাকে তা করতে কখনও জোর করবেন না। তেমন মানুষই নন তিনি।

জানলার পাশে একটা রঙিন দড়ি ঝুলছিল। খেয়াল করেনি ধীর। চেয়ার থেকে উঠে সানজিদেবী ওটা কয়েকবার ঝাঁকানি দিলেন। তারপর এসে ফের চেয়ারে বসলেন। ধীরও চুপচাপ বসে থাকল। তার আর কিছুই ভাল লাগছিল না। চাসু উপত্যকায় সে যে আর কখনও ফিরে আসবে না সেটা মোটামুটি ঠিক করে ফেলল। চুলোয় যাক সানজিদেবী আর ইরিকা টোর। দু'জনের কেউই সুবিধের মানুষ নয়। অশিক্ষিত আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষজনের কাছে একজন দেবী সেজে লাঠি ঘুরিয়ে যাচ্ছেন আর অন্যজন অর্থবলে হিমালয়-অ্যাডভেঞ্চার খরিদ করতে ব্যস্ত। দু'একদিন পর কৌশল করে সে চাসু থেকে উধাও হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলল। কিন্তু ওই পাসপোর্ট আর টাকার কী হবে! হঠাৎ সে বিষম সমস্যায় পড়ে গেল।

দু'জন আশ্রমিক মহিলা সুন্দর প্লেটে পায়েস এনে রাখলেন। আর একজন ছোট বাটিতে নুড্‌লসের সুপ পরিবেশন করলেন। সানজিদেবীর ইঙ্গিতে ইরিকা ও ধীর খেতে শুরু করল। একটু পরেই চা এল। চা খাওয়া শেষ করার আগেই নাংগেল তাফা এসে ঘরে ঢুকলেন। কোমর ঝাঁকিয়ে মাতাজিকে সম্মান জানানোর সময় ধীর উঠে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল। অন্যদিকে ব্যস্ত থাকায় ধীরকে প্রণামের আগেই বুকে ধরে নিতে পারলেন না। প্রণামটা ঠিকই নিতে পারলেন কিন্তু মাতাজিকে তিনি সম্পূর্ণ সম্মান জানাতে পারলেন না। বিব্রত বোধ করলেন খুব।

— তোমাকে নিয়ে তো আর পারা গেল না। দেখছ না মাতাজিকে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এখানে কি তোমার আমাকে সম্মান জানানো উচিত?

ধীর অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুতসই জবাব দিতেও ছাড়ল না।

— চাসু উপত্যকায় মাতাজি দেবী কিন্তু উনি আমার গুরুজি নন। উনি জানেন আপনি আমার কাছে কতখানি শ্রদ্ধার পাত্র।

নাংগেলজির মনে হয়ে থাকতে পারে এমন কথায় মাতাজি অসন্তুষ্ট হতে পারেন। তাই তাঁকে বোঝাতে চাইলেন।

— ধীরু আমার ছেলের মতো মাতাজি। আপনি ওর অপরাধ নেবেন না।

মাতাজি মুচকি হাসলেন। ইরিকা ধীরের রকমসকম দেখে তাজ্জব! একটা দেহাতি বৃদ্ধ মানুষকে ধীরের মতো মানুষ এত সম্মান করতে পারে তা তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। পরিবেশ সহজ করতে সানজিদেবীই এগিয়ে এলেন।

— আমি লালাজির কাছে আপনাদের দু'জনের সম্পর্ক নিয়ে শুনেছিলাম। আজ নিজের

চোখে দেখলাম। আমার খুব ভাল লেগেছে।

খুব খুশি হলেন নাংগেল তাফা। মাতাজির ধীরকে ভাল লেগেছে এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে। সানজিদেবী এবার মূল কথায় চলে যেতে চাইলেন।

— এবার আপনি ওই প্রস্তাবের কথা বিশ্বাসজিকে বলুন। আমরা যে উনার সাহায্য চাই সেটাও আপনি বুঝিয়ে বলুন।

গুরুজির মুখের ভাব দেখেই ধীর বুঝল প্রস্তাবটা মোটেই তাঁর নয়। উনি শুনে হয়তো নিমরাজি হয়েছিলেন। এখন তাঁকেই ধীর বিশ্বাসকে রাজি করানোর জন্য কৌশলে চাপ দেওয়া হচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে যে এমন দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে এটা বুঝে গেল ধীর। একটু ভাবলেন নাংগেলজি। তারপর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নরম কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

— মাতরা গিরিশিরাকে তোমার কেমন মনে হল?

— চড়ার জন্য খুবই বিপজ্জনক। সাজানো পচা পাথরস্তূপের উপর দিয়ে উঠতে হয়। সর্বত্র পাথর পড়ার ভয়। আমার মোটেই নিরাপদ জায়গা বলে মনে হয়নি।

— তুমি কতটা উঠেছিলে?

— সারা গিরিশিরার মধ্যে একটা গালি ধরে আমরা উপরে উঠতে চেষ্টা করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত পাথরের দেওয়ালে গিয়ে আর চড়া সম্ভব হয়নি।

— ওই পাথরের উপর দিয়ে ক্লাইম্ব করা যায়?

— অভিজ্ঞ ক্লাইম্বার হলে অবশ্যই যায়। তবে একজনের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। দু'জন সমান অভিজ্ঞ হলে হয়তো পাথরপ্রাচীর ধরে উপরে ওঠা যেতে পারে।

— দিরাং কতদূর গিয়েছিল?

— হাজার খানেক ফুট হতে পারে।

— তার উপরে তুমি কতটা এগিয়েছিলে?

— আরও দেড় হাজার ফুট কি সামান্য বেশিও হতে পারে।

— তোমার সঙ্গে দিরাং সাচ্চুধুরার মতো জায়গা যেতে পারল অথচ মাতরায় মাত্র হাজার ফুট উঠে থেমে গেল। কারণটা কী?

— কারণ দিরাং ক্লাইম্বার নয় সে মালবাহক। সাচ্চুধুরার মতো মাতরায় কাউকে আগলে উপরে তোলা সম্ভব নয়।

চিন্তায় পড়ে গেলেন নাংগেল তাফা। এর পর কীভাবে কী বলবেন হয়তো বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

— চিকু ইরিকা ম্যাডামকে মাতরা টপকে ডোলি উপত্যকায় নিয়ে যেতে চায়। মোটামুটি যাওয়া যায় এমন একটা জায়গা নাকি সে জানে। সেটা কতটা ঠিক বলে তোমার মনে হয়?

— এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের পক্ষে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি। এত বড় এলাকায় তেমন জায়গা থাকতেই পারে। সোনামভাই দক্ষ গাইড। তার কথা তো অবিশ্বাস করা যায় না।

নাংগেল তাফা একটু তাকিয়ে দেখলেন ইরিকার দিকে। তারপর মাতাজির দিকে।

— আচ্ছা ধীরু, চিকু যে পথের কথা বলছে সেটা কি তুমি যে গালি ধরে গিয়েছিলে ওটাই হতে পারে?

গুরুজির প্রশ্ন শুনে থমকে গেল ধীর। পরক্ষণেই সে তার উত্তর জানাল।

— না, সোনামভাই-এব পথ ওই গালি ধরে কখনই হতে পারে না।

ধীরের জবাবে সারা ঘর গমগম করে উঠলেও কারও মুখে কোনও কথা ছিল না। যে যার চেয়ারে বসে মৃদু চমকে উঠলেও উঠতে পারে। তবে তাতে ধীরের কিছু যায় আসে না। টেবিলের উপর দু'হাত রেখে মাথাটা অল্প নিচু করে কী যেন ভাবছিলেন নাংগেল তাফা।

— আমরা ঠিক করেছি মাতরা গিরিশিরা ধরে পথ বের করতে তোমার নেতৃত্বে একটা দল পাঠাব। তোমার দলে থাকবে চিকু, মানজু আর তুমি চাইলে দিরাং। ইরিকাও সঙ্গে যাবেন।

বিড়াল শেষ পর্যন্ত ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল। ধীরকে একটুও ভাবতে হল না। নাংগেল তাফার সম্মান যাতে অটুট থাকে সেটাও তার অবশ্যই দেখা দরকার।

— গুরুজি, আপনার নির্দেশ আমি কখনও অমান্য করিনি। এবারও না বলতাম না। কিন্তু বলতে হচ্ছে কারণ আমার শরীরের অবস্থা এখন পাহাড়ে যাওয়ার মতো নয়।

— তুমি গেলে খুব ভাল হোত ধীরু।

অবাক হল ধীর। গুরুজি তো কখনও এমন জোর করেন না! তা হলে কি তিনি এমন জোর করতে বাধ্য হচ্ছেন? কারও ইঙ্গিত কি তাঁর কাছে নির্দেশ হিসাবে মান্য হচ্ছে?

— আপনি আগে কখনও তো কাউকে পাহাড়ে যাওয়ার ব্যাপারে জোর করতেন না। হঠাৎ আজ করছেন! কী ব্যাপার বলুন তো?

শুনলেন তবে নিচু মাথা তুলতে অনেকটা সময় নিলেন।

— করতে হয়েছিল। তবে আর করছি না। দিরাং তোমার ওই গালিপথ চেনে বলে আমরা তাকে সঙ্গে নিতে চাই।

ধীর ইচ্ছে করেই গালিপথের প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল।

— নিতে পারেন তবে দিরাং উপরের জন্য কাজে আসবে বলে মনে হয় না। ওর পক্ষে উপরে ওঠা খুবই ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যেতে পারে।

— আমরা বললে ও কি যেতে চাইবে?

— মাতাজি চান শুনলে দিরাং পৃথিবীর যে কোনও জায়গায় নির্দ্বিধায় যেতে পারে।

— আমি চাই তুমিই ওকে যাওয়ার কথাটা বল।

আরও একবার অবাক হল ধীর। তার সামনে এ কোন্ গুরুজি!

— না গুরুজি, আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।

ধীর বিশ্বাস যে তার পিতৃসম গুরুজিকে পরিষ্কার না বলে দিতে পারে এমনটা মাতাজি ও ইরিকা টোর ভাবেননি। তার প্রতিটি কথার মধ্যে এত জোর ছিল যে পুরো পরিবেশটা থমথমে হয়ে পড়ল। ঘরের মধ্যে চারজন মানুষ কিছুক্ষণেব জন্য বাকহীন হয়ে পড়েছিল। ধীর ছাড়া বাকি তিনজন সম্ভবত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের অনুসন্ধানে মগ্ন ছিলেন। অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয় হযতো নাংগেল তাফা বুঝতে পাবলেন। চেষ্টা করলেন কিছুটা সামাল দেওয়ার।

— ধীরু, তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার সঙ্গে কথা বলে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারলাম। তবু আর একটা প্রশ্ন ছিল ...।

ধীর তার গুরুজির কথা শেষ হওয়ার আগেই জানতে চাইল।

— বলুন।

— ওই গালিপথ কি মাতরা গিরিশিরার 'ইউ' আকৃতির আশেপাশে?

— হ্যাঁ। ইউ ঢালের বামদিকে অর্থাৎ পশ্চিমকোণা। মাতরা গিরিশিরার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়।

— ঠিক আছে, আমার কথা শেষ।

ধীর জানে নাংগেল তাফা শেষ প্রশ্ন করেছিলেন থমথমে পরিবেশকে কিছুটা সহজ করতে। গালিপথ কোথায় হতে পারে সেটা তিনি ভালই জানেন। তাঁর যখন·আর কোনও কথা নেই তখন উঠে পড়াই সঠিক কাজ। তবু মাতাজির মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ার অনুমতি চাইল ধীর। তিনি বুঝতে পারলেন কিন্তু কিছু বললেন না। তিনি যে তার উপর অসম্ভব অসন্তুষ্ট সেটা বুঝে গেল ধীর। চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ধীর। তবে এবার আর ভুল হয়নি — সামনে মুখ রেখে পিছন পায়ে ভর দিয়ে পায়ে পায়ে ঘরের বাইরে এল ধীর। সেখানে কোনও আশ্রমিক মহিলা তার জন্য অপেক্ষা করছিল না।

গল্পটা ধীরের কাছে পরিষ্কার হল। সানজিদেবী ও ইরিকা টোরের সঙ্গে তার কোনও প্রেম নেই। চলতি পথের প্রচুর মুখের মধ্যে তাঁরা আরও দুটো মুখ। দু'দিন পর তাঁরা অনিবার্যভাবেই দৃশ্যান্তরে চলে যাবেন। কিন্তু তার গুরুজিও কি এবার অস্তাচলে? বলতে গেলে চাসু উপত্যকায় ওই একটা মুখের মৃন্ময় রূপে মুগ্ধ হতেই বারবার তাকে আসতে হত। এবার থেকে সম্ভবত তাও উপত্যকার আড়ালে চলে যেতে পারে। এতদিন ধরে অর্জিত আনন্দের মূলবিন্দুতে অধিষ্ঠান করেও সহসা তিনিও কি কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেলেন!

পারাতাল

বাইরে বেরিয়ে এসে ধাতস্থ হতে অল্প সময় নিল ধীর। ঘরের মধ্যেকার বিদ্যুতের তীব্র আলোয় তার চোখ ঝলসে গিয়েছিল। ঘড়িতে পৌনে ছয় অর্থাৎ দু'ঘন্টা হতে চলল তার ক্যাবিনেট মিটিং। শেষদিকে এক টুকরো ছেলেমানুষী রাগও দেখিয়ে দিলেন সানজিমাতা। কেউ তাকে সঙ্গ দিয়ে আশ্রমের বাইরে নিয়ে এল না। তিনি নাকি ধীরের বন্ধু, তাঁকে সে 'আনজু' বলে নাম ধরেও ডাকতে পারে। ভালই তার নমুনা পাওয়া গেল।

সানজিদেবীর তাকে দরকার। সে কারণে সে কয়েকদিন থেকে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও তাঁকে দিয়ে এসেছে। অথচ সত্যিই ধীরকে আর তাঁর প্রয়োজন আছে কি না জানা গেল না। অনেক কিছুই এত গোপন যে আপাং কেনির সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করাও উচিত নয়। রাস্তায় নেমে সে দ্রুত পা চালাতে থাকল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই বড় রাস্তা। একটু এগিয়েই সে ঢাল ধরে উপরে উঠতে থাকল। খোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই সে বুঝল, দিরাং তার অপেক্ষায় থেকে থেকে ভয়ানক বিরক্ত।

— ক্যায়া, ফিন আপ নগলিকি পাস গ্যায়া থা?

দিরাং-এর প্রশ্ন উপেক্ষা করল ধীর। তার পাশে পাথরের পৈঠানে গিয়ে বসল। বাম হাত দিরাং-এর ঘাড়ে রেখে অল্প ঝাঁকুনি দিয়ে ধমক দিল ধীর।

— নগলির কাছে যাওয়ার সময় এটা নয়। এবার যা বলছি মন দিয়ে শুনে নাও।

— ক্যায়া?

বেশ অবাক হয়ে গেল দিরাং। তার সাহের হঠাৎ এমন সন্ত্রস্ত কেন সে বুঝতে পারল না। হতভম্ভ হয়ে ধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

— কেউ জানতে চাইলে তুমি বলবে, মাতরায় ঢুকে আমরা বড় গ্লেসিয়ারের মুখে ক্যাম্প করে ছিলাম। আর কোথাও তাঁবু ফেলিনি, মনে থাকবে?

— মতলব, বিচমে নালে কা পাশ তাম্বু নেহি লাগায়া?

— হ্যাঁ, ঠিক তাই। মাঝখানে আমরা কোনও তাঁবু ফেলিনি। ওই এক জায়গাতে ক্যাম্প করেই আমরা মাতরা গিরিশিরা ধরে এগিয়ে পিছিয়ে কাজ করেছি।

— ঠিক হ্যায় সাব্। আপ জো বোলা অ্যায়সাই বোলুঙ্গা। মগর পুছেগা কৌন?

এসব তার কাছে কে জানতে চাইবে সেটা জেনে নিতে চায় দিরাং। খোলসা করাটা ঠিক হবে কি না ভাবল ধীর। তারপর সরাসরি জানিয়েই দিল।

— মাতাজি, সোনাম, মানজু এমনকী নাংগেলজিও জানতে চাইতে পারেন।

— মাতাজি!

— হ্যাঁ দিরাং, মাতাজিও জানতে চাইতে পারেন।

চুপ করে থাকল সে কিছুক্ষণ।

— মাতাজিসে ঝুট্ ক্যায়সে বোলেঙ্গে সাব্!

— না বললে তুমি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে যাবে দিরাং। তবে মনে হয় মাতাজি নন, সোনামই জানতে চাইবে।

— তব ঠিক হ্যায়। ওহ্ শালেকো ম্যায় সামহাল লুঙ্গা।

বিনতি কোথায় জানতে চাইল না ধীর। পকেট থেকে দুটো একশ টাকার নোট বের করে সে দিরাং-এর হাতে দিল।

— ইয়ে রুপেয়া কিস লিয়ে সাব্? ঠিক ঢঙ্গসে ঝুট্ বোলনেকে লিয়ে?

হেসে ফেলল দিরাং। ধীরও।

স্যাক পিঠে তুলে ঘরের মধ্যে গেল ধীর। পকেট থেকে টর্চ জ্বেলে কালো জেরিক্যানের উপর একবার মেরে দেখল। বাদুড়ঝোলা অবস্থায় তিনি দিব্যি যেমন ছিলেন তেমনি আছেন।

হোটেলে ফিরে এসে আপাং কেনির আওয়াজ পেল না ধীর। মুখি তাকে অনেকদিন পর দেখে অবাক হলেও যথারীতি চা রেখে গেল। চা খেয়ে ইদরিনালা ঘুরে এল ধীর। হোটেলে তখনও মদ্যপায়ীদের আনাগোনা শুরু হয়নি তাই আর একবার চা পেয়ে গেল সে। ঘরে এসে হাত-পা ছড়িয়ে খাটে শুয়ে পড়তেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে যখন তার ঘুম ভাঙল তখন সাড়ে সাতটা। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে এগারো ঘন্টা টানা ঘুমিয়ে ছিল ধীর। টেবিলের উপর তার খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল অথচ খাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। তাকে ঘুমে আচ্ছন্ন দেখে লালাজি ফিরে এসে তাকে আর ডাকেনি। তবে সে হাতমুখ ধুয়ে ফিরে আসতেই আপাং কেনি তার কাছে এসে বসল। অসম্ভব গম্ভীর মনে হল তাকে। মুখ দেখলেই বোঝা যায় তার অনেক প্রশ্ন আছে।

— তুমি মাতরায় গিয়েছিলে, বিশওয়াস দাদা?

— হ্যাঁ, তোমাকে বলতে পারিনি।

— না বলতে চাওনি?

হেসে ফেলল ধীর। আপাং কেনি লালাজি হয়েও বিনে পয়সার বন্ধুত্বের স্বাদ আবার খুঁজে পেয়েছে বলে মনে হল তার। বাঙালিদাদা কোন চুলোয় গেল তা যদি সে না জানতে পারে তাতে তার কোনও ক্ষতি হয় না। ওসব নিয়ে যে আপাং-এর মান-অভিমান হতে পারে সেটা তার মাথায় ছিল না।

— এবারই প্রথম তোমার সঙ্গে আমাকে দুর্ব্যবহার করতে হয়েছিল। তবে তার জন্য আমি অনুতপ্ত। মনে পড়লেই খুব লজ্জা হয়।

খুব অপ্রস্তুতে পড়ে গেল ধীর।

— যাহ্! কী সব যা তা বলছ আপাং ভাই! ও সব আমার মনে নেই। চাসুতে আমার বন্ধু বলতে তো তুমিই। সেটা কি তোমাকে বারবার বলতে হবে?

— বন্ধু হলে তার কাছে সব গোপন করতে হয় এটাও তোমার কাছে শিখতে হল। তুমি বিদ্যান আমরা মুখ্যু তাই হযতো তুমি এমন কর।

সামান্য একটা ভুলের জন্য আপাং কেনির মনে এত ক্ষোভ জমা হতে পারে বোঝেনি ধীর।

— এসব তুমি কী বলছ!

— বলছি কারণ তুমি এবার অনেককিছুই গোপন করতে চাইছ। চাসুতে কোনও বার তুমি তিনদিনের বেশি থাক না। এবার প্রায় মাস ঘুরতে গেল। কী আছে এখানে?

চোখে চোখ রেখে এমন চোখাচোখা কথা আপাং কেনি তাকে কখনও বলেনি। তবে সবটাই ভালবাসার দাবিতে।

— আমি কাল সকালের বাস ধরে চাসু ছেড়ে যেতে চাই। তোমাকে কথাটা বলার জন্য কাল থেকে অপেক্ষা করছিলাম।

— তুমি এভাবে চলে গেলে আমার বিপদ বাড়বে। সানজিমাতা আমাকে আর আস্ত রাখবেন না। জান তুমি?

অবাক হল ধীর। তার যাওয়া বা না-যাওয়ার সঙ্গে সানজিদেবীর আপাং-এর উপর চোটপাটের কী কারণ থাকতে পারে সে বুঝতে পারল না।

— আমি চলে গেলে মাতাজি তোমাকে কেন আস্ত রাখবেন না, এটা আমার মাথায় ঢুকছে না। কী ব্যাপার বল তো?

— ব্যাপার খুব সহজ। মাতাজি তোমাকে তাঁর জালে ছেঁকে তুলতে চান। সেটা করতে

হলে আপাং কেনির সাহায্য দরকার, জানেন উনি।

— ছেঁকে তুলতে চান!

— এক্কেবারে যাকে বলে ছাঁকনি দিয়ে।

— এটা কোনও মজার ব্যাপার হল? কী বলতে চাইছ পরিষ্কার করে বল।

— তোমার সঙ্গে আমি মোটেই মজা করছি না। সময় হলেই সব জানতে পারবে। এ ঘরে একটা বাঙালি পার্টি আছে। যাও তাদের সঙ্গে দেখা করে এসো।

আপাং কেনি উঠে পড়ল। ধীর ঘর থেকে বেরিয়ে বাঙালি পার্টির সঙ্গে দেখা করতে গেল। চারজনের দল। দলের নেতা বিপুল শূর বছর কয়েক ধরে হিমালয় ঘুরতে আসছে। তারা পারাতাল নামে একটা তাল দেখে গতরাতে মাচদায় ফিরে আসে। লালাজির পরামর্শে তারা আলাপানি যাওয়ার জন্য তোড়জোড় করছিল! ঘন্টা দেড়-এর মধ্যেই তারা রওনা দেবে। ধীরকে তারা নামে চেনে। তার লেখা পড়েছে। ওদের কাছে সে দাদাগোছের মানুষ বলেই বোধহয় সৌজন্যের মরচে ছাড়ানো গেল না। ওদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ধীর তাব ঘরে ফিরে এল।

ধীরেব কেন জানি মনে হল, মাচদায় থাকলে দিনটা তার ভাল যাবে না। মাচদা ছেড়ে চলে যাওযার জন্য সে তখনই তৈরি। কোথায় যাবে ঠিক করতে পারছিল না। ওই সময় আপাং এসে তার ঘরে ঢুকল। কোনও কিছু না বলে তাকে নিয়ে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। যে কথাগুলো আপাং ধীরকে বলার জন্য কাল রাত থেকে অপেক্ষা করছিল সেগুলো এক নিঃশ্বাসে সে উগরে দিল। মন দিয়ে সে আপাং কেনির কথা শুনে গেল।

ধীর আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসার পরই সেই ঘরে আপাং কেনির ডাক পড়ে। ধীর বিশ্বাস কে, তার পেশা কী, কেমন ক্ষমতা তার, তার রাজনৈতিক যোগাযোগ কেমন এমন সব প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় কেনিকে। কেনি পরিষ্কার জানিয়ে দেয় — এসব তার জানা নেই। বিশওয়াস দাদা তার পুরনো পরিচিত, বন্ধু ও সজ্জন মানুষ। তার সম্বন্ধে কেউ কখনও অভিযোগ করেনি। শুধু তাই-ই নয় ধীর বিশ্বাস যে সবার উপকার করতে চায় তার প্রচুর প্রমাণও দেয় সে। ধীরের উপর মাতাজির অসন্তোষের প্রধান কারণ মাতরা অভিযানে যেতে অস্বীকার করা। উপত্যকার কেউ মাতাজির ইচ্ছের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত যায়নি। তিনি অপমানিত বোধ করেছেন। এমনকী দিরাং-কে যাওয়ার জন্য বলতেও ধীর রাজি হয়নি। সে দায়িত্বটা যাতে মাতাজি নিজে নেন এমন প্রস্তাবও নাকি বিশওয়াস দাদা রেখে এসেছে। আর যায় কোথায়!

আপাং-এর ধারণা মাতাজির ক্ষোভের কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি ধীর বিশ্বাসকে কাছের

মানুষ করতে চাইলেও সে অন্যান্যদের মতো তাঁকে দেবীজ্ঞানেই সম্মান করতে পছন্দ করে। এই জায়গাটা ধীরের কাছে ধাঁধার মতো লেগেছে। সানজিঁদেবী ইরিকা টোরের মতো তার দিকেও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু ধীরের মনে হয়েছিল এটা নিছক সৌজন্য মাত্র। তাঁর মহানুভবতা। আপাং তার মতো করে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছে। দেবীমাতা হলেও কোনও রূপসী মহিলার অযাচিত সান্নিধ্য আপাং কেনির কাছে সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।

আপাং-এর মনে হয়েছে মাতরা অভিযানে যাওয়ার জন্য ধীরের কাছে আরও একবার চাপ আসতে পারে। সেটা এড়াতে হলে ঘন্টা খানেকের মধ্যেই তার পারাতাল দেখতে চলে যাওয়া উচিত। লালাজির হোটেলে দুপুরের মধ্যেই অভিযাত্রীদল এসে জড়ো হওয়ার কথা। ইরিকা আবার হোটেলে এসে উঠছেন। বিশওয়াসদাদা ভারী অস্বস্তিতে পড়ে যেতে পারে।

মিনিট পাঁচ ভেবে আপাং ভাই-এর পরামর্শই সঠিক বলে মনে হল ধীরের। যাতায়াতে চারদিনের মালপত্তর নেওয়া দরকার। কিন্তু আপাং সে ব্যাপারে অন্য প্রস্তাব রাখল।

— এখান থেকে কিছু নেবে না। তুমি কোথায় গিয়েছ আমি জানি না। এখনই আমি পিতসি বেরিয়ে যাচ্ছি। এসে দেখব তুমি নেই।

হোটেলের বাইরে এসে একটা ছেলেকে দেখিয়ে দিল আপাং কেনি। এমনভাবে দেখাল কথার মাঝখানে যে কেউ বুঝতে পারল না।

— ওই ছেলেটার নাম ডাভা। পারাতালে এর সঙ্গে আরও দু'জন ছিল। আলাপানি গেছে দুটো ছেলে। তুমি একে নিয়ে চলে যাও। উপরের দোকান থেকে যা পাবে তাই নিয়েই রওনা দিয়ে দাও।

মিনিট পনেরো পর জিপে করে আপাং রওনা হয়ে গেল। ঘরে এসে ধীর তার স্যাক বেঁধে রেখে ছেলেটির কাছে গেল।

— ক্যায়া, পারাতাল জায়েগা?

সাড়ে দশটার সময় কেউ পারাতাল যেতে পারে বিশ্বাস করতে পারছিল না ছেলেটা।

— জায়েগা সাব। কল সুব্‌বে আ জায়েঙ্গে।

— নেহি, আজই জানা হ্যায়।

একটু ভাবল ছেলেটা। তারপর জানতে চাইল।

— আজকি ফুল পারাও দেনে সে জরুর জায়েঙ্গে সাব।

এত দেরি করে গেলে অনেকে পুরো পয়সা দিতে চায় না। দিনের পুরো মজুরি দিলে

সে যেতে পারে। ধীর রাজি হতেই সে তৈরি হয়ে আসতে চলে গেল।

ডাভা ভারী চটপটে আর আমুদে ছেলে। কোনও কিছু নিয়েই ধীরকে ভাবতে হয়নি। আঠারোর বেশি বয়স হবে না ডাভার অথচ চরস তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। নেশাটা শরীরের পক্ষে যে ক্ষতিকর সেটা অনেক বলেও তাকে বোঝানো গেল না। এমন আরও বহুবিধ ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে হিমালয়ের ঢালে প্রচুর মানুষ ধীরে ধীরে স্থির হতে থাকে। হিমালয়প্রেমী মানুষজনের চোখে সে সব ধরা পড়ে না। নৈসর্গিক দৃশ্যে বিভোর হয়ে তাঁরা ঘরে ফিরে আসেন।

দ্বিতীয় দিন বিকেলে তারা পারাতাল এসে পৌঁছল। তাল শুকিয়ে ডোবা হওয়ার মুখে। তবু তার অবস্থান ভারী চমৎকার। তালের পাশ থেকেই পাথরের উঁচু প্রাচীর। ইতিউতি কম উচ্চতার কিছু পয়েন্টসও তার নজরে এল। জলের একমাত্র উৎস ঝরণাটির আয়ুও সম্ভবত আর সপ্তাহ খানেক। এক জেরিক্যান জল নিতে অনেক সময় লেগে যায়। ছুটে দৌড়ে চরসে দম লাগিয়ে ডাভা তার কাজ করে যায়। সন্ধে গাঢ় হওয়া পর্যন্ত ধীর ইতস্তত তালের চারপাশে ঘুরে বেড়াল। মজে মশগুল হওয়ার মতো না হলেও সময়টা তার ভালই কাটল।

তাঁবু লাগানোর ঝামেলায় যায়নি ডাভা। বড় পাথরের আড়ালে একটু কষ্ট করে দিব্যি রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। মে-জুন মাসে মেষপালকরা ওখানে মাসভর ডেরা বাঁধে, জানিয়ে দেয় ডাভা। শুকনো জুনিপার গাছের ডালপালা এনে আগুন জ্বালে সে। ঠাণ্ডায় ভাবী কাজের। ধীরও ডাভার আগুনের পাশে এসে বসে। গল্প জমে ওঠে।

ডাভাদের পরিবারে লোকজন মাত্র তিনজন—সে আর তার বাবা-মা। তার দিদি এই কিছুদিন হল কাঠ আনতে গিয়ে পাথরের আঘাতে মারা যায়।

— ক্যায়সে?

— উপ্পরসে পত্থর ইঁউ গিরা অওর মেরা বহিনকি মৌত হো গ্যায়া সাব্।

— ক্যায়া করতি থি তুমহারি বহিন?

— ধামপে কাম করতি থি সাব্। মগর উসকি ধামসে নিকাল দিয়া গ্যায়া থা।

— কিঁউ?

— মুঝে পাততা নেহি সাব্।

— উসকা বাদহি তুমহারি বাহিনকি মৌত হো গ্যায়া?

— জি, সাব্।

সেই ঢাকনাটা আর একবার খুলে দেখল ধীর। তরতাজা ও পরাক্রমী এক দেহাতি মেয়ের নিজেকে বাঁচানোর সংগ্রামের চিহ্ন তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ধামে থাকার সময় কোনও মেয়ের আলগা অভ্যাস ধরা পড়লে বোধহয় তার মাথায় পাথর পড়ে। এবং তার মৃত্যুও হয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মেয়েটির মুখ চেনার মতো মোটেই ছিল না তাই ধীর ডাভার দিদির সঙ্গে তার মিল ধরতে পারল না। আগুনের তেজ তার আর সহ্য হচ্ছিল না। সে উঠে এল।

মাচদা থেকে পারাতাল বত্রিশ কিলোমিটার পথ ভেঙে আসতে হয়েছিল। ফেরার দিন তারা সকালেই রওনা দেয়। চতুর্থদিন রওনা হওয়ার আগেই ধীর ডাভাকে তার পুরো মজুরি দিয়ে দিল। আশি টাকা হিসাবে তিনশো কুড়ি টাকা হলেও ধীর তার হাতে পুরোপুরি চারশো টাকা দিল। বেজায় খুশি ডাভা। জিপ যাওয়ার রাস্তায় পৌঁছে ধীর ডাভাকে চলে যেতে বলল। সাহেবের নির্দেশ পেয়ে সে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হল। ধীর রাস্তার পাশে বসে সময়কে দাঁড় করিয়ে রেখে শেষ পর্যন্ত মাচদায় গিয়ে পৌঁছল।

হোটেল ঢুকেই ধীর মুখির জায়গায় অন্য একজনকে দেখতে পেল। ডাভার বয়সী আর একজন টেবিলবয়ের কাজে ব্যস্ত। পরিবর্তনটা চোখে পড়ার মতো। অবাক হলেও ধীর ও ব্যাপারে কিছু জানতে চাইল না। এমন আশঙ্কা যে সে করেনি তা নয় তবে এত তাড়াতাড়ি তা ঘটবে এটা বুঝতে পারেনি। দিশকে নিয়ে মুখি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছিল, এমন একটা আঁচ করেছিল ধীর। সম্ভবত সেটাই কারণ। কিন্তু দিশের কী হল!

তার গলা পেয়ে আপাং বেরিয়ে এল। স্যাক নিয়ে তার ঘরে রেখে বেঞ্চিতে এসে বসল ধীর। হোটেলে ভিড় না থাকলেও খদ্দের ছিল। চোখের ইশারায় আপাং তাকে তার ঘরে যেতে বলল। ধীর বুঝল কথা আছে। ঘরে গিয়ে বসতেই সে এসে ঢুকল। ঢুকেই ভাল করে দরজা বন্ধ করে দিল আপাং। ধীরের মনে হল, তার নিজের হোটেলের মধ্যে লালাজিকে এত সতর্ক হতে সে এর আগে কখনও দেখেনি। গলা নামিয়ে কথা বলছিল লালাজি।

— মুখিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

চমকে উঠল ধীর! বলে কী লালাজি!

— পাওয়া যাচ্ছে না মানে!

— তুমি যেদিন গেলে তার পরদিন সকালে মুখিকে দোকান খুলতে না দেখে নীচে ওর কামরায় যাই। কামরার দরজা হাট করে খোলা অথচ মুখি নেই।

— তারপর?

— আজ তিনদিন হল মুখির কোনও খোঁজ নেই।

— আর দিশ?

— দিশ যেমন ভাঁড়ারে ঘুমোয় তেমনি ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু ওই ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাকে দেখে আমি ভয় পেয়ে যাই। যেন একটা মরা মানুষ।

— তারপর?

— সব ঘটনা আমি মাতাজিকে গিয়ে বলি। মাতাজির লোক এসে ওকে এখান থেকে নিয়ে যায়।

— খুব তাজ্জব ব্যাপার তো!

আপাং কেনি কোনও প্রতিক্রিয়া জানাল না। তবে খুব ঝিমিয়ে পড়ল।

— মনে হয় এখান থেকে এবার ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হবে। খুব চিন্তায় আছি বিশওয়াসদাদা। কোনও কিছু না বলে হঠাৎ এভাবে মুখি চলে যেতে পারে না, বিশ্বাস হয় না।

— তা হলে?

— দিশ কিছু বললে বোঝা যেত। বোবা হলেও মনে হয় ও কিছু গোপন করছে।

ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে খুব গুরুতর কিন্তু তবু ধীর পুরো ব্যাপারটা উপেক্ষা করতে চাইল। আজব ঘটনাই এখন চাসু উপত্যকার ট্রেডমার্ক।

— সানজিদেবীর অভিযানের কী খবর?

এমনভাবে প্রসঙ্গ বদলে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হল লালাজি।

— অভিযানের ব্যাপার আমি কী করে বলব? মাতাজির কাছে গেলেই তুমি জানতে পারবে। তবে মেমসাহেব সঙ্গে যাননি।

যাঁর জন্য অভিযান তিনিই গেলেন না অথচ অভিযান রওনা হয়ে গেল। পাসপোর্ট আর টাকা উদ্ধার করা ছাড়া তো উপরে যাওয়ার আর কোনও মানে হয় না। সোনাম ছাড়া বাকিদের তো ওখানে কোনও কাজ নেই।

— মেমসাহেব গেলেন না কেন?

— সেটা জানি না তবে তাঁর দুই হাঁটুতে ক্রেপ জড়ানো দেখলাম। প্রতিদিন এখন হাফপ্যান্ট পরে দুই হাঁটুতে রোদ লাগান। তোমার গুরুজির দাওয়াই।

— সোনামের সঙ্গে কারা আছে?

— মানজু, দিরাং আর মনে হয় পাঁচজন পোর্টার।

— মেমসাহেবের হোটেলে উঠে আসার কথা ছিল। তার কী হল?

— কাল আসার কথা আছে। তোমার গুরুজির চিকিৎসায় উনি নাকি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন।

— মাতাজি আমার খোঁজ করেছিলেন?

— করেছিলেন কিন্তু কাউকে না বলে হঠাৎ পারাতাল চলে যাওয়ার পর আর তোমার কথা জানতে চাননি।

— তোমার কি মনে হয় উনি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন?

— মনে হয়। তোমার উপর সম্ভবত আর উনি ভরসা করতে পারছেন না।

আপাং কেনির মুখের ভাষা পড়তে চাইল ধীর। হঠাৎ এত গম্ভীর মুখের কেনিকে সে আগে কখনও দেখেনি। তার উপর কী ব্যাপারে মাতাজি ভরসা করতে পারেন? দু'দিনের উটকো মানুষের উপর কীসের ভরসা! চাসু উপত্যকায় সানজিদেবীই শেষ কথা। সেখানে ধীর বিশ্বাস কোনও মানুষ হল! কেনির বাজে কথার উপরে আর কথা বাড়াতে চাইল না সে।

— হঠাৎ করে চাসু ছেড়ে তা হলে এবার চলে যেতে পারি?

কিছুক্ষণ কোনও কথা বলল না আপাং কেনি। দুই হাঁটুতে হাত রেখে ভাবতে থাকল।

— হ্যাঁ পার, তবে কালকের দিনটা থেকে যাও। এখন আমাকে আশ্রমে যেতে হবে। দেখি তোমার কথা ওঠে কি না।

— আমি সঙ্গে যাব নাকি?

গর্জে উঠল কেনি।

— না না, একদম না। তুমি গেলে সানজিদেবী তোমাকে আজ ওখানে থাকতে বলবে। মনে রাখবে কোনও অজুহাতেই এখন তুমি আশ্রমে থাকবে না।

ধীরকে কোনও কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই কেনি বেরিয়ে গেল। দু'মিনিট পর আবার সে ফিরে এল।

— যে ছেলেটা কাউন্টারে থাকে তার নাম তালাং। ডাক নাম তালু। আর যেটা চা দেয় তার নাম হাক্কা। আমি হাকু বলি। ওদের সব বলা আছে। তোমার কোনও অসুবিধে হবে না।

আপাং বেরিয়ে যেতেই ধীর ডায়েরি লেখায় হাত দিল। মুখি আর দিশের উপর বিশদভাবে

লিখে রাখল। তারপর চাসু উপত্যকায় তার শেষদিনটা কীভাবে কাটাবে তাও লিখে রাখল সে। ডায়েরির কোথাও সে পাসপোর্ট হারানো নিয়ে কিছু লেখেনি। কাল কোনও এক সময়ে দিরাং-এর ঘর থেকে পাসপোর্ট আর টাকা বের করে নিয়ে আসবে। তারপর সুযোগ বুঝে ইরিকার হাতে সেই প্যাকেট তুলে দিলেই তার কাজ শেষ। ফিরে আসার পরই কেন পাসপোর্টের পাউচ তাঁর হাতে ধীর তুলে দেয়নি এমন প্রশ্নের মোক্ষম জবাব দিতে তার অসুবিধে হবে না। তবে সে প্রশ্ন ইরিকা করবেন বলে মনে হয় না। তার অনুমান তিনিও চাসু উপত্যকা ছাড়তে পারলে বাঁচেন। মাতরা গিরিশিরা টপকে ডোলি যাওয়ার বাসনা তিনি যে ত্যাগ করেছেন সেটা জানার জন্য আর হাত গোনার দরকার হয় না। হাতে সময় পেলে ধীর গুরুজি এবং নগলির সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে পারে। তবে এত কম সময়ে লুনি যাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। নগলি তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল ঠিকই কিন্তু কারণ ভিন্ন। আচমকা তার সেই মৃত মেয়েটির প্রসঙ্গ আনা উচিত হয়নি। এখন এটা সে বুঝতে পেরেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে হোটেলের মধ্যে এল ধীর। এ সময় ভাল ভিড় হওয়ার কথা কিন্তু মাত্র দু'জন চা নিয়ে গল্প করছিল। তালু কাউন্টারে খদ্দের আসার অপেক্ষায়। হাকু চুপচাপ বেঞ্চিতে বসে। বেঞ্চিতে এসে সে বসতেই হাকু কাউন্টার থেকে প্লেট এনে তার সামনে রাখল। দু'জনই সম্ভবত তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় ছিল। হাতে গরম না হলেও টাটকা পরোটা এবং আলু আর মটরশুটির মাখা। কিছু পরে চা রেখে গেল হাকু। চা খেয়ে উঠতে যাওয়ার সময় জানতে চাইল হাকু।

— ক্যায়সা বনা সাব?

— বহত আচ্ছা বনা। রাতমে ক্যায়া বনেগা?

— আপ জো বলেগা সাব।

— ঠিক হ্যায় বাদমে বোলুঙ্গা।

ধীর বাইরে বেরিয়ে এল। ফিরফিরে ঠাণ্ডা বাতাস তার সারা শরীর জুড়ে খেলা করতে থাকল। সেপ্টেম্বরের সবে শুরু — এরই মধ্যে শীত আসার আভাস। প্রায় একমাস হতে চলল তার চাসুতে তবু মনে হয়, এই তো সেদিনকার কথা। আর মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সে মাকনায় পৌঁছে যাবে। শহরের উল্লাসের সঙ্গে সে গুলে জল হয়ে যাবে। আপাতত তার আর তামিন যাওয়ার ইচ্ছে নেই।

এবারের হিমালয় ভ্রমণ যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সে ভুলে যেতে চাইবে। সম্ভব হলে সে চিরদিনের মতো ভুলে যেতে চাইবে এই আজব উপত্যকার কথা। শুধু ক্ষোভ থেকে যাবে যে, সানজিদেবীকে সে একবার 'আনজু' বলে ডাকার সুযোগ করে নিতে পারল না।

খাস খবর

সকালে একটু তাড়াতাড়িই উঠে পড়ল ধীর। রাত পোহালেই পরদিন ভোরে তাকে বাস ধরতে হবে। একদিন আগেই ভোরে ওঠার অভ্যাসটা রপ্ত করে নেওয়া ভাল। সকাল হওয়ার আগেই যা তার আর প্রয়োজন নেই সে সব জিনিস প্যাক করে নিল। পাহাড়ে চড়ার সরঞ্জাম ও তাঁবু ভরে নিল। পাহাড়ের বুট জোড়াও স্যাকের ভিতরে চালান করে দিল। ন্যাপ স্যাকের মধ্যে টুকিটাকি যা তার কলকাতা পর্যন্ত লাগতে পারে সে সব আলাদা করে রাখল। উপরে পলিথিন সিট রেখে টাইট করে স্যাকের মুখ বন্ধ করে দিল ধীর। সব কিছু দেখার পর সে খুশি হল। বাসে ওঠার জন্য সে তৈরি।

আশ্রম থেকে ফিরে এসে আপাংভাই তাকে জানিয়ে দেয় তার সম্পর্কে মাতাজির আর কোনও আগ্রহ নেই। এমনকী চাসু ছাড়ার আগে তার মাতাজির সঙ্গে সৌজন্য-সাক্ষাৎ করারও কোনও প্রয়োজন নেই। তার মানে সানজ্জিদেবীর তার সঙ্গে আর কোনও কথা নেই। আশ্রমের কাজে তার যে সাহায্য তিনি পেতে চান বলে মন্তব্য করেছিলেন আপাতত তা খারিজের খাতায়। তাতে তার ভালই হল। কিন্তু হঠাৎ সব বদলে গেল কেন ভেবে সে কিছুটা ধন্দেও পড়ে গেল।

মুখ ধুতে গিয়ে ইদরিনালার পাড়ে একটা পাথরের উপর প্রচুর কালো দাগ দেখতে পেল ধীর। হাত দিয়ে খুঁচিয়ে দিতেই মামড়ির মতো ধুয়ে গেল। ভাল করে পরীক্ষা করে তার মনে হল রক্তের দাগ। পর পর আরও কয়েকটা পাথরে সেই দাগ। দাগ ধরে তার উৎস পেতে অনেকটা সময় লাগল ধীরের। কারণ দুটো পাথরের পর সেই দাগ পাওয়া গেল দশটা পাথর পার করে। রক্তেব উৎস হোটেলের নীচের কামরা। আপাং বা অন্যান্য লোক কি চোখ ঢেকে থাকে! একটা মানুষ হঠাৎ গায়েব, তার কোনও চিহ্ন পর্যন্ত নেই! হয় কখনও!

ভর দুপুরে মুখি ওখানে বিশ্রাম নিত। তা ছাড়া অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় ঘরটা খালিই থাকত। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে হোটেলে ওঠা যায়। নীচের কাঠের দরজা খুললেই ইদরিনালার নুড়ি ও পাথর। কাউকে আঘাত করে বেহুঁশ অবস্থায় কি তাকে নালার পাড়ে নিয়ে এসে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হতে পারে? ইচ্ছে করেই সে তার গোয়েন্দাগিরি থামিয়ে দিল। চাসুতে ঢোকার প্রথম দিনের কথা তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

সকালের ব্রেকফাস্ট মানেই আলু পরোটা আর টক দই। দই খেলে চা বাদ দিতে হয়। সেটা সম্ভব নয় বলেই সে পরোটার সঙ্গে শুধু চা খায়। ঘরের ভিতরে বসে এক মনে তাই-ই খাচ্ছিল ধীর। ভেজানো দরজা খুলে বিনতি ঢুকল। পাঁচদিন পর তার বিনতির সঙ্গে দেখা হল। খাওয়া থামিয়ে দিল ধীর।

— আও আও বিনতি। ক্যায়সা হো তুম?

— ম্যায় ঠিক হুঁ সাব্‌।

— অওর?

— মুখিভাইকো সায়েদ কোই মার ডালা সাব্‌।

মুখিকে সম্ভবত কেউ মেরে ফেলেছে! বলে কী বিনতি!

দু'চোখে বিনতির জল গড়িয়ে পড়ে। ধীর জানে এসব কথা চার কান হলে তার বিপদ হতে পারে।

— ইস বাত কিসিকো মাত বাতানা। সমঝা?

ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বিনতি।

জায়গাটা শেষ পর্যন্ত মগের মুল্লুক হয়ে গেল! শান্তির চাসুতে এখন খুনজখম যেন জলভাত! মেরে জলে ফেলে দিলেই খেলা শেষ। হঠাৎ মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত বোধ করল ধীর। মুখিকে খুন করা হয়েছে এটা বুঝল কী করে বিনতি? দিরাং পাহাড়ে যাওয়ার আগের দিনও কি বিনতি আপাং-এর ঘরে এসেছিল? এসে থাকলে বিনতি নিশ্চয়ই কোনও কিছু দেখে থাকবে। ভোররাতে বিনতি তার ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় কিছু ঘটে থাকলে ওর নজর এড়ানোর কথা নয়। মাত্র কুড়ি ঘন্টা পর ধীর মাচদা ছেড়ে চলে যাবে। তার এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন নেই। এখনও সে নিজে যে টারগেট হয়ে যায়নি তার ভাগ্য ভাল বলতে হয়। চাসুর লোকজন আগের মতোই ভেবে সে অনেকের সঙ্গেই অহেতুক টক্কর নিয়ে কথা বলেছে। স্থানীয় মানুষজনের মধ্যেকার পরিবর্তন সে ধরতে পারেনি। চাসু উপত্যকার লোকজন হঠাৎ এত একরোখা আর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে পড়তে পারে তার ধারণা ছিল না।

বেলা এগারোটার সময় আপাং-এর সঙ্গে ধীরের একটা গোপন মিটিং হল। বিনতি কী যেন একটা কথা লালাজিকে বলতে চায়। কিন্তু বলতে গিয়েও বলেনি। কথাটা ঠিক কী বিশওয়াস দাদা কি জেনে তাকে জানিয়ে দিতে পারে? কথাটা যে কী ধীর জানে। নির্বোধ আর বলে কাকে। এমন ইঙ্গিত লালাজিকে দেওয়ার মতো বোকামি আর কী হতে পারে! কী থেকে কী হয় তার কি কোনও ঠিকঠিকানা আছে। ধীরের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপাং তাকে সঙ্গে করে দিরাং-এর ঘরে গেল। স্নান সেরে ধোয়া জামাকাপড়ে সুন্দর লাগছিল বিনতিকে। চোলি আর ঘাঘরা এদিকে তেমন কেউ পরে না। ঘরের মধ্যে বলেই হয়তো পরেছিল বিনতি। তবুও ওই

পোশাকে সাহেবের সামনে এসে দাঁড়াতে তার সংকোচ হওয়ার কথা। কিন্তু তাকে দেখে ধীরের বেশ স্বচ্ছন্দই মনে হল। মুখে লাজুক লাজুক হাসি। কয়েক ঘন্টা আগেকার বিনতির সঙ্গে তার সামনে দাঁড়ানো বিনতির কোনও মিল খুঁজে পেল না সে। তার চালচলনে এমন ছেলেমানুষী চাঞ্চল্য সে আগে দেখেনি। লালাজিও সম্ভবত কিছুটা ধন্দে পড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে প্রশ্ন করে বসল।

— বাত ক্যায়া বিনতি? তুমকো বহত খুশ লাগ রহা।

— ম্যায় বহত খুশ হুঁ লালাজি। আপ দোনোকো ম্যায় এক ভারী খুশখবরি দুঙ্গা।

হঠাৎ ধীর নড়েচড়ে বসল। লালাজিও বিনতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। দু'জনের আগ্রহে উপচে পড়া প্রত্যাশা দেখে মুচকি হাসল বিনতি।

— সায়েদ ম্যায় মা বননেওয়ালী।

আর যায় কোথায়!

লালাজি তো বটেই, এমনকী ধীরও খবরটা শুনে আনন্দে চোখ বন্ধ করে ফেলল। দারুণ একটা ঝরঝরে সুখ তার শিরদাঁড়া বেয়ে করোটিতে গিয়ে ধাক্কা মারল। মনে মনে সে অনাগত সন্তানের মঙ্গল কামনা করল। খুব দুঃখ হল তার দিরাং-এর জন্য। এমন খুশির খবরে যার প্রধান হক তিনি এখন পাহাড় ডিঙোতে ব্যস্ত।

বিনতির হাতের রান্না নামতে সেদিন বেলা দুটো বেজে গেল। প্রচুর ঢেকুর তুলে লালাজি ও ধীর হোটেলে ফিরে এল। ধীর ঠিক করল সন্ধেব সময় বিনতির হাতে পাঁচশ টাকা দিয়ে সে আশির্বাদ করে আসবে। ধীর খুশি যে চাসু ছাড়ার প্রাক্‌মুহূর্তে সে মনে রাখার মতো একটা আনন্দ সংবাদ নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। আপাং-এর কাছে এখন দিরাং খুব দামি মানুষ, জানে ধীর। বিনতির সংসারের পালে এবার হাওয়া লাগতে বাধ্য — এর চেয়ে সুখবর আর কী হতে পারে! যাওয়ার আগে দিরাং-এর সঙ্গে দেখা হলে ভাল হত। কিন্তু সে আর কী করা যাবে। আপাং ভাই-এর নিজের কোনও সন্তান নেই। শারীরিক সমস্যার জন্য সে নিজে যে সন্তানের জন্ম দিতে পারে না এটা ধীর জানত না। উচ্ছ্বাসের প্রবল উত্তেজনায় কিছুক্ষণ আগেই কেনি সেকথা তাকে জানিয়ে দিয়েছে। এখন থেকে সে দিরাং-এর সন্তানকেই নিজের ভেবে দেখভাল করতে চায়। সব মিলিয়ে ঘটনার মোড় অতি দ্রুত ধীরকে অভিভূত করে দিয়েছিল। দিরাং যাকে তার শত্রু মনে করত ঘটনাচক্রে সে-ই আজ তার পরম মিত্র। দু'জনের মুখোমুখি স্নেহ-সম্ভাষণ ধীর আর দেখতে পেল না। না পাক, ভেবে সুখ তো সে পেতেই পারে।

শেষ বারের মতো নগলিকে একবার 'হ্যালো' করার ইচ্ছে হল ধীরের। মাচদায় এখন সন্ধে পড়লেই বেশ শীত শীত করে। হাফ সোয়েটারের উপর উইণ্ডপ্রুফ চড়িয়ে রওনা দিল

ধীর। নগলির ধাবা তখন শুঁড়িখানা হওয়ার মুখে। কী কাজে যেন নগলিকে আশ্রমে যেতে হয়েছিল। মুলকির অনুরোধে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে উঠে পড়ল। এ সময় সানজিধামে পুজো হয়। তার মানে সাড়ে সাতটার আগে তার দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। বেশি রাত করে শুতে গেলে ভোরের বাস ধরতে অসুবিধে হয়। তা ছাড়া, নগলির কাছে গেলে সহজে ছাড়া পাওয়া যায় না। আগেকার ঝামেলা মনে রাখলে আরও অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। সাড়ে ছ'টায় বড় রাস্তা থেকে সে দিরাং-এর ঘরে যাওয়ার চড়াই ভাঙতে থাকল।

খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুব দিকে তাকাতেই দেখল ধোঁয়াশায় সব আবছা। হিমেল আমেজ ধীরে ধীরে চাসু উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। সব আবছা মনে হলেও ভারী সুন্দর এক অনুভূতি তাকে ছুঁয়ে গেল। চোখ সরিয়ে সে ঢাকা বারান্দায় ঢোকার মুখে বিনতি বেরিয়ে এল।

— সাব্, আপ!

— মেবা এক ছোটাসা সামান ইধার ছোড়কে গ্যায়া থা। ওহ লেনেকে লিয়ে আয়া।

বিনতি অবাক। তাদের ভাঙা ঘরে কখনও কেউ জিনিস ছেড়ে যায়।

— কাঁহা হ্যায় আপকা সামান?

কালো জেরিক্যানটা দেখিয়ে দিল ধীর। অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারল না বিনতি। উইণ্ডপ্রুফের পকেট থেকে টর্চ বের করে কালো জেরিক্যানে ফেলতেই বিনতি হেসে ফেলল। যেভাবে চিন-আপ করে উঠে পাউচটা ধীর রেখেছিল সেইভাবে উঠেই সে জেরিক্যানের কাছে গেল। পাউচটা বের করে অন্ধকারেব মধ্যে উইণ্ডপ্রুফের চেস্টপকেটে ভরে নিল। সাহেবের ওঠানামাটা আগ্রহ নিয়ে দেখলেও বিনতি কোনও বাড়তি আগ্রহ দেখাল না। হাতে জল দিয়ে এসে তার ওয়েস্ট পাউচ থেকে পাঁচটা একশ টাকার নোট বের করে বিনতির হাতে দিল ধীর। কিন্তু কিন্তু করেও শেষ পর্যন্ত সে টাকাটা নিল। তারপর জানতে চাইল।

— ইতনা রুপেয়া কিস লিয়ে সাব্?

— ইয়ে সারি রুপেয়া তুমহারি খুশখবরি কা ইনাম।

আর দাঁড়াল না ধীর। বিনতি কোনও কিছু বলার আগেই সে টর্চের আলোয় উৎরাই পথে বড়রাস্তায় এসে নামল। সেখান থেকে হোটেলে পৌঁছতে মাত্র তিন মিনিট লাগল তার।

যাওয়ার আগের দিন যা সে করে থাকে সেটাই করে ফেলল ধীর। লালাজির সঙ্গে বসে হিসাব করে টাকা পয়সা মিটিয়ে দিল। তারপর ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। হাকু চা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর আপাং ঢুকল। হাতে তার কড়া পানীয়। অনেকদিন পর তার

হাতে মদের গ্লাস দেখল ধীর। আজ খুব খুশির দিন, একটু আধটু না হলে চলে।

নিরিবিলিতে বিশওয়াস দাদার সঙ্গে কেনি পুরনো দিনের কথা নিয়ে চালাচালি করল কিছুক্ষণ। তারপর চলে এল মুখির হঠাৎ উধাও হওয়া প্রসঙ্গ। পাছে সমস্যা হয় তাই তামিন থানায় খবর পাঠিয়ে দিয়েছে কেনি। কিন্তু সরেজমিনে তদন্ত করতে কেউ আসেনি। স্থানীয় মানুষের অভিযোগই পুলিশ খতিয়ে দেখে না আর মুখি তো বাইরের উটকো লোক। ধীরের মনে হল, মুখির ব্যাপারটা সবার কাছে রহস্যই থেকে যাবে।

দিরাং ফিরে এলেই কেনি যে তার হাতে কাপড়ের দোকানের পুরো দায়িত্ব দিয়ে দেবে সে কথা জানিয়ে দিল ধীরকে। ছেলে বা মেয়ে যাই হোক বিনতির, তাকে সে বাইরে রেখে পড়াবে। বিনতির বাচ্চা যাতে হাসপাতালের বিছানায় জন্ম নেয় তার ব্যবস্থাও সে করবে। সুন্দর ভবিষ্যতের সুখচিন্তায় কেনিকে মশগুল থাকতে দেখে দারুণ আনন্দ পেল ধীর।

হঠাৎ দরজা খুলে একজন লোক ঢুকল। কেনি অবাক! ওখানে তো কারও ঢোকার অনুমতি নেই।

"লালাজি, মাতাজিনে আপকো তুরন্ত বুলায়ি। অওর কলকাত্তা কা জো সাব্ হ্যায় উনকো ভি।"

রাত সাড়ে আটটার সময় মাতাজির ডাক! খুব বিরক্ত হল কেনি। এমনকী ধীরও। লোকটা তখনও উত্তরের জন্য দাঁড়িয়ে। আপদ আপাতত বিদেয় করার জন্য আপাং কেনি ধমকের মতো করে বলল : 'তুম আগে বাড়হো, হম নিকাল রহা।'

আপাং-এর নিশ্চিত ধারণা বিশওয়াস দাদাকে আটকানো-র জন্যই মাতাজির এই নাটক। ভোরে বাসে ঠাণ্ডা লাগতে পারে এই আশঙ্কায় ধীর উলের ছোট চাদরটা উপরে রেখেছিল। ওটা সঙ্গে নিয়েই আপাং-এর পিছনে সে আশ্রমের পথ ধরল।

যে ঘরে অভিযান নিয়ে কথাবার্তা হয়েছিল অপেক্ষারতা দু'জন আশ্রমিক মহিলা তাদের সেই ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে তারা দু'জনই আশ্চর্য হয়ে গেল। সামজিদেবী, ইরিকা টোর ও তার গুরুজি ছাড়াও নগলি সেখানে গোল হয়ে বসে। তাদের দেখে বাকিরা নড়েচড়ে বসল। আপাং-এর যেন তর সয় না। চেয়ারে বসেই সে হঠাৎ তলবের কারণ জানতে চাইল। উত্তরটা ইরিকা টোর দিলেন।

— উপরে গিয়ে ওরা দুর্ঘটনায় পড়েছে। দিরাং-এর ভারী চোট এমন খবর পেয়েছি আমরা।

ধীরের মনে হল ব্যাপারটা আরও গুরুতর হতে পারে। কিন্তু সে ভেবে পেল না দিরাং-

এর চোট লাগে কী করে। সে তো মাল বয়ে নিয়ে যেতে সঙ্গে গিয়েছে। আপাং-এর উত্তেজনাও কিছু কম নয়। সে বোধহয় অস্থির হয়ে পড়ছিল।

— ভারী চোট মানে?

এর উত্তর নাংগেল তাফাই দিলেন।

— একজন কুলি খবরটা নগলির কাছে দেয়। আশ্রমে এসে কথাটা বলতে তার সাহস হয়নি।

আপাং ফের উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

— এর জন্য সাহস না হওয়ার কী আছে!

অত্যন্ত ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে আপাং কেনির দিকে তাকালেন নাংগেলজি।

— কারণ কুলিটি সবটা বলেনি। আমার মনে হয় দিরাং আর বেঁচে নেই।

ধীরের মুখটা হঠাৎ সাইডে ঘুরে গেল। আপাং স্থির দৃষ্টিতে টেবিলের দিকে তাকিয়ে থাকলেও চোখের জল আটকাতে পারল না। ধীরের বুকে অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিল কিন্তু সে তা উপেক্ষা করল। শক্ত হওয়া ছাড়া তার কোনও উপায় ছিল না। আসলে তার কিছু যায় আসে না। বাসে উঠে কিছুটা এগিয়ে গেলেই সব ছাপসা। শুধু কয়েকদিন মন-কেমন-করা বাদ দিলে যে কে সেই।

— মাতাজি আপাংভাইকে কেন ডেকেছেন তা আমার জানার দরকার নেই। কিন্তু আমাকে ডাকার কারণ?

সানজিদেবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ধীরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকলেন। আবারও নাংগেলজিকে উত্তর দিতে এগিয়ে আসতে হল।

— আজ মাতাজি মৌনী। তিনি উত্তর দিতে পারবেন না। উত্তরটা হল, তুমি পাহাড়ে অভিজ্ঞ তাই মাতাজি তোমার সাহায্য চান।

— একটা লাশকে নীচে নামাতে চারজন কুলিই যথেষ্ট। তার জন্য আমার উপরে যাওয়ার দরকার নেই।

নির্মম তাচ্ছিল্য ছিল সম্ভবত ধীরের কথায়। নাংগেল তাফা-র মুখটা হঠাৎ কুঁচকে গেল।

— ধীরু, হিমালয়ে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে এমন মন্তব্য করতে নেই।

ধীর বিশ্বাস হঠাৎ ওই প্রথম হুমড়ি খেয়ে পড়ল। গুরুজির মুখের দিকে তাকাতে তার সাহস হল না। ইচ্ছে করেই নরম হতে চাইল।

— আসলে আমার ব্যক্তিগত সমস্যা আছে। তিনদিনের মধ্যে মাকনায় না পৌঁছলে পুলিশ আমার খোঁজে চাসুতে আসতে পারে। সেটা ঘটুক আমি চাই না।

এবার সানজিদেবীর মুখ কুঁচকে যেতে দেখল ধীর। কারণটা সে ঠিক বুঝতে পারল না। ইরিকা হঠাৎ কী যেন বলতে চাইলেন।

— তা হলে অবশ্য তোমাকে আটকানো ঠিক হবে না। তবে নাংগেলজি যে কথাটা বলেননি সেটা হল : সোনাম উপরে গিয়ে আটকে পড়েছে। কেউ সাহায্য না করলে তার ওখান থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন।

ধীর অবাক! এরা কী পাহাড়ে যাওয়ার যোগ্য! মাত্র চারদিনেই এত কাণ্ড! একজন মৃত আর একজন পাহাড়ের খাঁজে ফেঁসে বসে আছেন! নতুন পথে ডোলি — সবাইকে চমকে দেওয়ার শৌখিন বাহাদুরি! তিনি আবার মেমসাহেবকে সঙ্গে নিতে চান।

— খুবই চিন্তার বিষয়। কিন্তু সোনামভাইকে উদ্ধার করার জন্য যে পদ্ধতি নেওয়া জরুরি তা আমার জানা নেই। অযথা টানা হ্যাঁচড়া করলে ফল উলটো হতে পারে।

শুনলেই মনে হয় ধীর এড়িয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু আর একটা মৃত্যুর কারণ সে হতে চায় না। এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া তার উপায় নেই।

— ওদের একটা উদ্দেশ্য ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেটা সফল হয়নি। এখন ওদের বিপদ। এটা কি পিছিয়ে আসার সময়?

খুব রাগ হল ধীরের। মাঝে মাঝে নাংগেলজি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। সত্যি কথাটা বুঝতে চান না।

— কী এমন উদ্দেশ্য ছিল ওদের যে ইরিকা ম্যাডাম না যাওয়া সত্ত্বেও ওদের যেতে হল?

সমস্যায় পড়ে গেলেন নাংগেল তাফা। সত্যিই তো ইরিকা না গেলে ওদের তো যাওয়ার দরকার ছিল না।

— আসলে ওরা যদি ডোলি যাওয়ার কোনও পথ মাতরা হয়ে বের করতে পারে তা হলে ওদের রুটিরুজির সুবিধে হয়।

বুঝল ধীর। তা হলে গুরুজিও চেয়েছিলেন ওরা যাক। তাই পরোক্ষে দিরাং-এর মৃত্যুর

জন্য তিনিও কিছুটা দায়ী। হঠাৎ ধীরের মনে হল, ঘটনা যাই হোক দিরাং মারা গেল অথচ সে উপরে উঠল না এটা তার কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে বিঁধতে পারে।

— বেশ, আমি যাব তবে আপনাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। আশ্রমমোড়ে আপনাকে ভোর সাড়ে চারটের সময় না দেখতে পেলে আমি ফিরে যাব।

নাংগেলজি কোনও উত্তর না দিলেও ইরিকা কথা বললেন।

— আমার হাঁটুর অবস্থা ভাল। তোমার অসুবিধে না থাকলে আমিও যেতে পারি।

আড়চোখে সবার প্রতিক্রিয়া জরিপ করে নিল ধীর।

— আপনি যেতে পারলে তো খুবই ভাল হয়।

ধীর আপাং কেনিকে সঙ্গে করে বাইরে বেরিয়ে এল। প্রায় দশটা। অতটা পথ তারা দু'জন কোনও কথা বলেনি।

অনেক রাত পর্যন্ত বিনতির কান্না শোনেনি ধীর। তার মানে আপাং তাকে দিরাং-এর ব্যাপারে কিছু বলেনি। তার চিন্তা ছিল এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনার চাপে আপাংভাই না ভয়ঙ্কর কিছু করে বসে। ধীর ভোরে বেরিয়ে যাওয়ার পর হয়তো বিনতিকে সব বুঝিয়ে বলবে কেনি। মড়া কান্না শুরু হওয়ার আগেই সে পাহাড়ের ঢালে। সে নিশ্চিত তা না হলে তার কাছেও বিনতি কৈফিয়ত দাবি করে বসত।

সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর ধীর তার প্যাক করা স্যাক খুলল। সেখান থেকে যা যা তার দরকার সে সব আলাদা করে প্যাক করে নিল। পাসপোর্টের পাউচ থেকে টাকাগুলো বের করে একটা পুরনো মোজার মধ্যে ভরল। তারপর যে খাটের তলায় দুনিয়ার মদের খালি বোতল ডাঁই করা থাকে তার আড়ালে রেখে দিল।

ভোর বেলায় ধীরকে স্যাক পিঠে দরজার কাছে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে হাকু। তার ধারণা হয় সাহেব বাস ধরতে বোধহয় একটু আগেই বেরিয়ে পড়তে চান। খড়খড়ি আর হুড়কো খুলে দরজার পাল্লা সরিয়ে দিতেই দশটাকা তার হাতে দেয় ধীর। সাহেব বেরিয়ে যেতেই হাকু পাল্লা ভেজিয়ে দেয়। অন্ধকার কমে এলেও তখনও টর্চ ছাড়া আশ্রমের পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাকে আশ্রম পর্যন্ত যেতে হয়নি। নাংগেল তাফা অর্থাৎ তার গুরুজি ও ইরিকা টোর কয়েকজন মালবোঝাই কুলি সহ তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

গত কাল আলোচনার সময় উত্তেজনার বশে কথাটা বলার পর থেকেই ধীর অস্বস্তিতে ভুগছিল। অনেকদিন হল নাংগেল তাফা আর পাহাড়ে যান না। তাঁকে এভাবে তার সঙ্গে

যেতে বাধ্য করাটা ঠিক হয়নি। তা ছাড়া, পঁয়ষট্টি বছর বয়স হতে চলল তাঁর। বেশি বয়সের চোট সহজে সারে না। তবে যতটা সম্ভব ভোরে বেরিয়ে পড়ার অভ্যাস তাঁর জন্মগত। গুরুজিকে সামনে দেখে সে দুর্ঘটনা, বাদানুবাদ, অপ্রয়োজনীয় ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ার বিরক্তি সব ভুলে গেল। তার মনে হল, নাংগেল তাফার নেতৃত্বে সে হিমালয়ের কোনও দূরপ্রান্তের চড়াই ভাঙতে তৈরি। স্যাক নামিয়ে গুরুজিকে প্রণাম করল ধীর। যথারীতি তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

— ধীরু, আমাদের সামনে কিন্তু অনেকটা পথ। সম্ভব হলে আজ আমরা হিমবাহের কাছে পৌঁছে যেতে চেষ্টা করব।

ধীর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। এগিয়ে যাওয়ার জন্য সে সামনে গেলেও আর কাউকে সে নড়তে দেখল না। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে সানজিদেবী বেরিয়ে এলেন।

— দিরাং-এর শরীর যদি অক্ষত থাকে তবেই তাকে নীচে নিয়ে আসা যেতে পারে। তা না হলে ওখানেই গতি করার ব্যবস্থা করবেন। এটা ধামের আদেশ।

ধীরের মনে হল মাতাজির কথা শেষ। এত কঠিন কণ্ঠ যে বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু মাতাজির কথা শেষ হয়নি।

— সোনামকে উদ্ধার করতে গিয়ে আর কারও প্রাণহানি ঘটলে ধাম তার দায় নেবে না। তার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

ধীরেব মনে হল, অদৃশ্য হওয়ার আগে তিনি তাদের সবাইকে বেত্রাঘাত করে গেলেন।

কবর

গতি কিছুটা কমে গেলেও গুরুজির চড়াই ভেঙে উপরে ওঠার সেই মনোরম ছন্দ আগেকার মতোই স্বতঃস্ফূর্ত বলে মনে হল ধীরের। দু'জন মালবাহক সামান্য এগিয়ে আর ঠিক তার পরই গুরুজি। পিছনে ইরিকা টোর আর ধীর নিজে কয়েক কদম পর সবার পিছনে। ইরিকা ভালই চড়াই ধরে উঠছিলেন। পাহাড়ে তাঁকে আগে কখনও দেখেনি ধীর। ওই প্রথম এক নাগাড়ে একত্রে ট্রেক করে পথ পিছনে ফেলতে ব্যস্ত তারা দু'জন। পাহাড়ে নিজের ক্ষমতা বুঝে ওঠা নামা করলে ঘনঘন বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কীভাবে পাহাড়ে হাঁটলে ক্লান্তি সহজে আসে না সেটা বুঝতে নাংগেল তাফা-র পিছনে থাকলেই বোঝা যায়। তারা আজই মাতরা হিমবাহ থেকে বেরিয়ে আসা দু'টি নালার সংযোগস্থল পেরিয়ে আগে চলে যেতে চায়। মানজু সালান ও তিনজন মালবাহক নাকি খুবই দুরবস্থার মধ্যে আছে।

নাংগেল তাফা-র মতো ধীরও ঢাল ধরে এগিয়ে যাওয়ার সময় কোনও কথা বলে না। কিন্তু ইরিকা সর্বদা কথা বলে চলার-গতি ব্যাহত করে দেন। হয়তো তিনি এভাবেই অভ্যস্ত। তাঁকে যথাসম্ভব তাল দিতে হয়। সেই সুযোগে নাংগেল কিছুটা এগিয়ে যান।

ধীর ইরিকাকে তাড়া দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। বেলা দুটোর সময় দুই নালার সঙ্গমে এসে নাংগেল তাফা আর যেতে চাইলেন না। আবহাওয়ায় মৃদু অবনতি ঘটতে পারে, তিনি আশঙ্কা করলেন। ঘন্টা দুই পর বেশ কিছুক্ষণের জন্য ঝিরঝিরে বৃষ্টি হল। বৃষ্টি শেষ হতেই সাবুদানা তাঁবুর উপর পড়পড় শব্দ করে পড়তে থাকল। ইরিকার তাঁবুতে বসে ঠিক হল, দিরাং-এর বডি দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন নাংগেল নিজে এবং ধীর ও মানজু মিলে সোনামের ব্যাপারে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে। অর্থাৎ ইরিকা ওই যাত্রায় দর্শক মাত্র, তাঁর কোনও ভূমিকা নেই।

রাত তিনটের সময় সবাইকে তুলে দিলেন নাংগেল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তৈরি হয়ে বেরোতে তাদের চারটে বাজল। একটা তাঁবুর মধ্যে কিছু মালপত্র রেখে তারা উপরে উঠে গেল। মালবাহক দু'জন মাত্র দু'দিন আগেই ওখানে ছিল। তারা পথ দেখিয়ে তাদের তিনজনকে দিরাং-এর প্রাণহীন দেহের সামনে যখন হাজির করল তখন ঘড়িতে সকাল ন'টা বেজে পঁচিশ মিনিট। শরীরের কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই, শুধু খুলির পিছন দিকের অনেকটা অংশ ঘিলুসহ যেন সার্জারি করে বাদ দেওয়া। হিমবাহের মোরেনের উপর হেসিয়ান ব্যাগ পেতে দিরাং-এর শরীর শোয়ানো। তাঁবুর মধ্যে ডেডবডি রাখার ন্যূনতম সৌজন্যও দিরাং-এর কপালে জোটেনি। দু'মিনিট ডেডবডির পাশে দাঁড়িয়েই ইরিকা চলে গেলেন। ধীর দাঁড়িয়ে থাকল।

নিজেকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পেয়েছে ধীর। তার মনে

হয়েছে সে খুবই শক্ত মানুষ। কোনও অবস্থাতেই সহজে ভেঙে পড়ে না। তবু তার অনেক কথাই মনে পড়ে গেল। মাত্র ক'দিন আগেই টর্চ হারানোর সাজানো অজুহাতে ধীর দিরাং-কে এদিকে পাঠিয়েছিল। যেখানে তার শরীর শোয়ানো তার উপর দিয়েই সে ক্ষিপ্র পদক্ষেপে ক'দিন আগেই মাড়িয়ে গিয়েছিল। তার মতো এমন সুন্দর মানুষের এটা কোনও মৃত্যু হল! আসলে এমন অবিচারের শিকার সে বোধহয় জন্মলগ্ন থেকেই। কেউ তাকে পূর্ণ মানুষ হতে দেয়নি, ভাবেনি।

সানজিমাতার বজ্রনির্ঘোষ নির্দেশ অমান্য করে নাংগেল তাফা দিরাং-এর মৃতদেহ নীচে নামানোর সিদ্ধান্ত কিছুতেই নেবেন না। সুতরাং সে মাতরা হিমবাহেই চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে থাকবে। আর পৃথিবীর সব কিছুই ঠিকঠিক চলবে। কোথাও কোনও আলোড়নের কারণ ঘটবে না। হয়তো বিনতির মনে মৃদু ব্যথা জমা হতে পারে। অল্প হলেও তাকে কিছুটা অসহায় বোধ করতে হবে। তার সন্তান বিনতির গর্ভে। দিরাং-এর ঘাম রক্ত স্বেদ ও উত্তাপের গন্ধ বিনতির শরীরে অনিবার্যভাবেই ছড়িয়ে থাকার কথা। অর্থাৎ দিরাং-এর জমার খাতায় শুধু ওইটুকুই।

"তাই বা কম কী! কী বল দিরাং ভাই?"

হঠাৎ ধীর দিরাং-এর নাম ধরে ডাকায় নাংগেল তাফা বুঝলেন তাকে মরা মানুষটার কাছে না থাকতে দেওয়াই ভাল।

"তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে ধীরু। সোনাম কী অবস্থায় আছে তোমার একবার দেখা উচিত। যাই করো, মাতাজির নির্দেশ মনে রেখো।"

অনেকটা দূরে দুটো তাঁবু লাগানো। অতি ব্যবহারে তাদের ক্ষযাটে চেহারা। ওই অল্প সময়ের মধ্যেই মালবাহকদের নিয়ে ইরিকা তাঁর এবং ধীরের তাঁবু প্রায় খাড়া করে ফেলেছিলেন। ধীর তার রুকস্যাক নামিয়ে হাঁটু গেড়ে তাঁবুর মধ্যে জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখল। ন্যাপে চড়ার সরঞ্জাম ছাড়াও দুটো মিলিয়ে প্রায় দু'শ ফুট রোপ সঙ্গে নিল। সেই সময় নাংগেল এসে ধীরেরই দেওয়া একটা তিনশো ফুটের পুরনো ফিক্সড রোপ তার হাতে দিলেন। ইরিকাও এগিয়ে যাওয়ার জন্য পিঠে ন্যাপস্যাক তুলে ধীরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। একজন মালবাহকের পিঠে সব জমা দিয়ে তারা তাকে অনুসরণ করে মাতরা গিরিশিরার দিকে এগিয়ে চলল। সোজা 'ইউ' মোড়ের পূবকোণা লক্ষ্য করে এগোতেই ধীর অবাক হল। যে ভাঙা রিজ ধরে উপরে ওঠার কোনও সম্ভাবনাই নেই সেখানে যাওয়ার অর্থ কী!

দেড় ঘন্টা পর অর্থটা বুঝল ধীর। সোনামের কাছে ওটাই মাতরা গিরিশিরা টপকে ডোলি যাওয়ার সহজ পথ। দূর থেকে দেখেই ধীর ওটা খারিজ করে দেয়। ভাঙা রিজ ও

ইউ-র মাঝখানটা বেশ ছায়াছায়া। মাথার উপব সূর্য থাকলেও অন্ধকার যায় না। সাকুল্যে চার হাজার ফুটের পচা পাথরস্তূপ ও উপরিভাগ কঠিন প্রস্তরপ্রাচীর। অভিজ্ঞ মানুষ হয়েও সোনাম চিকু এমন ঝুঁকির জায়গা বেছে নিতে গেল কেন. বুঝতে পারল না ধীর। তা হলে সত্যিই কি ওই আপাত ঝুঁকিপূর্ণ আলো-অন্ধকারে কোনও রুট আছে?

হিমবাহ থেকে মোটামুটি সহজ ঢালে দু'শো ফুট উপরে মানজুকে পাওয়া গেল। সকালে উঠে সে সোনামের অবস্থা বুঝতে গিয়েছিল। তার সারা মুখে ক্লান্তি এবং হতাশা। তার কাছ থেকেই পুরো ঘটনাটা জানা গেল।

মাতরা আসার দিন সোনাম সবার আগে বেরিয়ে পড়ে। দুই নালার সংযোগস্থলে প্রথমদিন ক্যাম্প হয়। সে সেই ক্যাম্পে ফিরে আসে রাত ন'টায়। কোনও কারণে তার মেজাজ নাকি ভয়ানক বিগড়ে ছিল। অনেক চেষ্টা করেও মানজু কারণটা বের করতে পারেনি। সারারাত সে এমন ক্ষ্যাপামি শুরু করে যে মানজু দিরাং-কে নিয়ে ফিরে যেতে চেয়েছিল। তারপব সে কিছুটা শান্ত হয়। তখনই মানজু সিদ্ধান্ত নেয় হাঁটা পথে কিছুটা উপরে উঠলেও সে চড়াচড়ির মধ্যে থাকবে না। কী বলতে কী করে বসে সোনাম সেই চিন্তায় সে তার উপর আর ভবসা রাখতে পারেনি। সে কথা মানজু সোনামকে জানিয়েও দেয়। তাই শুনে সে হঠাৎ বেশ গুম মেরে যায়। তবু সে সিদ্ধান্ত নেয় কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার। তা না করলে সে নাকি ইকি ম্যাডামের কাছে খুব লজ্জায় পড়ে যাবে। উপরে ওঠার সময় ফিরে আসার সুবিধের জন্য সে দু'শো ফুটের দড়িও সঙ্গে নেয়।

দু'দিন আগে সকাল আটটায় সোনাম, মানজু ও দিরাং তারা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে এসে জড়ো হয়। সোনাম নাকি মাত্র কিছুদিন আগেই ওই রুট ধরে প্রায় হাজাব খানেক ফুট উপরে উঠেছিল। যেখান পর্যন্ত সে উঠেছিল সেখান থেকে নীল আকাশ দেখতে পেয়েছিল। তার ধারণা আরও কিছুটা উপরে উঠতে পারলে সে ভাঙা রিজ-এর উপরে চলে যেতে পারত। সেখান থেকে মাতরা গিরিশিরায় অনায়াসে ওঠা যায়। তার সঙ্গে যে ছিল সে ভয় পাওয়ায় সোনাম ফিরে আসে। তবে নীচে নেমে আসাব সময় তাদের নাকি প্রচণ্ড ঝুঁকি নিতে হয়েছিল।

এবারও সোনাম হয়তো তা-ই করতে গিয়েছিল। দু'শো ফুটের দড়ি কোমরে বেঁধে সোনাম খাড়া চড়াই ধরে এগিয়ে যায়। নীচে দাঁড়িয়ে মানজু কেবল দড়িটা ধরে থাকে। দড়ি শেষ হওয়ার অল্প আগে মানজু চিৎকার করে সোনামকে তা জানিয়ে দেয়। একটু পর দড়ি টেনে উপরে তোলার সময় আচমকা একটা ছোট্ট পাথর গড়িয়ে পড়ে। পড়ার কথা মানজুর শরীরে কিন্তু সেই পাথর তীব্র বেগে গিয়ে পড়ে দিরাং-এর উপর। বেচারা নীচে দাঁড়িয়ে সোনাম চিকু-র চড়া দেখছিল। তারপর কোথা দিয়ে যেন কী হয়ে যায়!

কয়েক মিনিটের জন্য মানজু চোখে অন্ধকার দেখে। পাথরটা সোজা তার দিকেই

আসছিল। হঠাৎ ঢালে ধাক্কা খেয়ে তার থেকে একটু দূরে দাঁড়ানো দিরাং-কে সেটা সরাসরি আঘাত করে। ঘটনাটা মানজুকে পুরোপুরি নিংড়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে সে দিরাং-কে দেখতে পায়। তার শরীর ছিটকে গেলেও একটা বোল্ডারে আটকে যায়। তার মাথার পিছনের অংশটা ছাড়া কোথাও কিছু হয়নি। হয়তো আঘাত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে গিয়ে সে ঘুরে যায়। মানজু আর উপরে তাকায়নি। ওই অবস্থায় সে ক্যাম্পে গিয়ে কুলিদের উপরে নিয়ে আসে। অনেক কষ্টে কোনও মতে তারা দিরাং-এর ডেডবডি ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

পরদিন অর্থাৎ গতকাল মানজু সঙ্গে একজন কুলি নিয়ে সোনাম কী অবস্থায় আছে দেখতে আসে। তার ধারণা ছিল দড়ির সাহায্যে অনায়াসে সে ক্যাম্পে ফিরে আসবে। সোনাম না ফেরায় তার চিন্তা বাড়ে এবং তাকে উপরে উঠতে হয়। মানজু শিস্ দেওয়ার পর সোনামের কথা সে শুনতে পায়। সবটা সে বুঝতে না পারলেও জানতে পারে সোনামের হাত থেকে দড়ি নীচে পড়ে গেছে। অর্থাৎ উপর থেকে নীচে নামা সোনামের পক্ষে সাহায্য ছাড়া আর সম্ভব নয়।

উপরে যে রুট ধরেই সোনাম ক্লাইম্ব করে থাক তা বেশ কঠিন। একা কারও সাহায্য ছাড়াই যখন কেউ ওই রুট ধরে ওঠে তাকে দক্ষ রক ক্লাইম্বাব বলে মানতে হয়। তবু সোনামকে ভর্ৎসনা করতে হয়। যেখানে সামান্য হিসাবে ভুল হলে অনিবার্য প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটতে পারে সেখানে এমন বোকামি ক্ষমা করা যায় না। তবে চোখের সামনে কারও মৃত্যু হলে এমন হয়ে যেতে পারে। সোনাম সম্ভবত খুব নার্ভাস হয়ে পড়ে। দিরাং-এর মৃত্যু তাকে মানসিকভাবে হয়তো বিপর্যস্ত করে দেয়। সে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারেনি।

ইরিকার কাছ থেকে বাইনোকুলারটা নিয়ে লেন্সে চোখ রেখে এদিক ওদিক করতেই শ'চারেক ফুট উপরে কাউকে নড়তে দেখল ধীর। ভাল করে ফোকাস করতেই অস্পষ্ট হলেও বোঝা গেল — একজন শরীর বেঁকিয়ে উবুড় হয়ে শুয়ে। অমন পাথরের গহ্বরে ওইভাবে আটকে থাকা সত্যিই ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। তা হলে কি হাত থেকে দড়ি পড়ে যাওয়ার ফলে সোনামের মধ্যে মৃত্যুভয় এসে ভর করেছে। একজন ক্লাইম্বার যখন মারাত্মক ভয় পেয়ে পাথরে উবুড় হয়ে পড়ে থাকে তখন তার পক্ষে বেঁচে ফেরা কঠিন। ইরিকাকে যন্ত্রটা ফিরিয়ে দিল ধীর। ইরিকাও তাকে দেখতে পেলেন।

দু'দিন ধরে সোনাম চিকু ওখানে আটকে আছে। মাত্র চারশ ফুট হলেও নিরাপদে তাকে নীচে নামিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব। সঙ্গে দড়ি থাকলেও সোনাম একা খুব একটা সুবিধে করতে পারত না। তার সাহায্য চাই। আর সেই সাহায্য করতে পারে কেবল অভিজ্ঞ দু'জন ক্লাইম্বার। সেটা তখনই সম্ভব যদি সেই দু'জন নিজেদের সম্পূর্ণ নিরাপদ করে সোনামের কাছে দড়ি নিয়ে পৌঁছাতে পারে। অতি দ্রুত কাজটা না করতে পারলে সোনামও নীচে গড়িয়ে পড়তে পারে। ধীরের ধারণা সোনাম চিকুর শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা ইতিমধ্যেই তলানিতে এসে

ঠেকেছে।

পাথরের অন্ধকার ছায়ার মধ্যে সোনাম কী অবস্থায় আছে বাইনোকুলারে দেখেও সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়নি। এমন সুঠাম ও শক্তিমান মানুষ হলেও মানজু সালানের চোখেমুখে হঠাৎ কিছু একটা ঘটার আশঙ্কা। ইরিকা টোর চোখের উপর বাইনোকুলার ধরে তাঁর প্রতিক্রিয়া আড়াল করে রেখেছিলেন। সম্ভবত তিনিও বুঝে গিয়েছিলেন সোনামকে আর কোনওভাবেই বাঁচানো সম্ভব নয়। ধীর ইরিকাকে পরীক্ষা করতে চাইল।

— কী বুঝছেন? আরও একটা রাত কি সোনাম ওখানে কাটানোব মতো অবস্থায় আছে?

উত্তর দেওয়ার জন্যই বোধহয় তাঁকে মুখের উপর থেকে বাইনোকুলার সরিয়ে নিতে হল। ভাবলেশহীন — চিকুর জন্য উথলে ওঠা অনুরাগ ছিল না মুখের ভাষায়।

— আমি বুঝতে পারছি না। তুমি আর একবার দেখতে পার। তবে আজ তো কিছু করা সম্ভব নয়। কাল একবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

মেমসাহেব কিছু ভুল বলেননি। কিন্তু সেদিনই কিছু করা সম্ভব নয বলে তাঁর মধ্যে কোনও আক্ষেপ নেই। সোনামের কথা ভেবে ধীরের বুকের মধ্যে কিন্তু একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল।

— তা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু একটু উপরে উঠে ওর দিকে তাকিয়ে হাতটাত নাড়লে বোধহয় চিকুর মনের জোর বাড়ত।

— উপরে ওঠার সময় আনজু কী বলেছিল তোমার মনে আছে নিশ্চযই?

বলেন কী মহিলা! একটা মানুষ জীবন-মৃত্যুর সরু সুতো আঁকড়ে বাঁচতে চায়। সেটা তাঁর কাছে কিছু হল না অথচ সানজুদেবী কী নির্দেশ দিয়েছেন সেটা বড় হয়ে গেল! ইরিকাই বোধহয় ঠিক, আবেগ এখানে বিপদ ঘটাতে পারে।

— তা হলে আজ আমরা ফিরে যাই। নাংগেলজি যদি বলেন আসার কথা তখন নয়তো ভেবে দেখা যেতে পারে।

যেন এমন কিছু শোনার জন্যই মানজু ও ইরিকা অপেক্ষা করছিলেন। তারা যেমন উঠে এসেছিল ঠিক তেমনভাবেই নীচে নামতে থাকল। কিছুটা নামার পর ধীর দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছন ফিরে উপরের দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত মিনিট দুই ধরে হাতের ইশারায় বোঝাতে চাইল : দুঃখিত সোনাম, তোমার বাহাদুরিকে সেলাম জানানো গেল না। তোমাকে আরও একদিন পাথর আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিলাম।

দুটোর সময় তারা ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছল। উপরে যতক্ষণ ছিল দিরাং-এর কথা একবারের জন্যও ধীরের মনে পড়েনি। তখনও মোরেন আর বরফ তুলে দিরাং-কে শোয়ানোর মতো বড় জায়গা করা সম্ভব হয়নি। তবে কাজ চলছিল। চারজন মালবাহক নাংগেলজির তদারকিতে মোটামুটি কাজ শেষ করার মুখে। ওই কঠিন ভূমিতে গর্ত খোঁড়ার কাজ সহজ নয় বলেই অবহেলার চিহ্ন দেখতে পেল ধীর। গর্তের আকার দেখেই বুঝতে হয় পা-হাত মুড়েই দিরাং-কে শুয়ে পড়তে হবে। এপাশ ওপাশ করার কোনও সুযোগ নেই তার। ইচ্ছে করেই সরে এল ধীর। নাংগেল তাফাও সেটাই চাইছিলেন।

— তোমার সঙ্গে কথা আছে। তাঁবুতে চল।

অবাক হল ধীর। কী নিয়ে কথা বলতে চান জিজ্ঞেস করল সে।

— কীসের কথা?

খুব সহজ ও স্বাভাবিক মনে হল তাঁকে।

— সোনামের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ তোমরা?

— সেটা আপনি ইরিকা মেমসাহেবের কাছে জানতে পারবেন।

ধীর দেখল প্লেট থেকে চামচ দিয়ে খাবার তুলতে তুলতে ইরিকা তাদের দিকেই আসছেন। নাংগেল কী জানতে চান আন্দাজ করেছিলেন মেমসাহেব।

— কাল সকালে ফ্রেস অবস্থায় আমরা একবার উপরে যাব। দেখা যাক, কী হয়।

কোনও তাপ নেই কথার ভঙ্গিতে। একটা মানুষ চরম দুরবস্থার মধ্যে কিন্তু তবু তিনি প্রচণ্ড স্বাভাবিক। নাংগেল বোধহয় চিন্তায় ছিলেন। যতই হোক সোনামের পাহাড়ে যাওয়ার হাতেখড়ি তাঁর কাছেই।

— না, মানে আমি জানতে চাই উদ্ধার করার ঝুঁকিটা কতখানি।

— সে কথা পরে। কাল সকাল পর্যন্ত সোনাম ওখানে থাকে কি না দেখুন।

নাংগেল তাফা কিছুক্ষণের জন্য কোনও কথা বলতে পারলেন না। তার পর ধীরের দিকে তাকালেন।

— ধীরু, তোমারও কি তাই মনে হয়?

— আমার কী মনে হওয়ার কথা বলছেন আপনি?

— যে সোনাম কাল সকালে ওখানে নাও থাকতে পারে।

ধীর বুঝতে পারল নাংগেল তাফা-র কাছে এর উত্তর খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তার উপরেই তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন। যদি সব শুনে তাঁর মনে হয় উপরে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই তা হলে তিনি কাউকে উপরে যেতে দেবেন না। অর্থাৎ সোনামকে পর পর দু'বার মরতে হবে।

— নীচে নামার সময় আমি সোনামকে হাত নেড়ে জানিয়ে এসেছি যে আমরা কাল আবার আসছি।

ইরিকা কথাটা শুনে অবাক হলেন। আসলে মানজু আর মেমসাহেব এত দ্রুত নীচে নামছিলেন যে ওরা কেউই উপরে তাকিয়ে দেখেনি। নাংগেল কিছুক্ষণ ভাববার পর তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন।

— তোমরা যাবে, ঠিক আছে। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই মাতাজির নির্দেশ ভুলে যাবে না।

কথা শেষ হওয়ার পরই তিনি দিরাং-এর কবরখানার তদারকিতে ফিরে গেলেন। ইরিকা টোর অত্যন্ত সৌজন্যবোধ সম্পন্না। সাধারণ বিদেশি মহিলাদের মতো অকারণে উচ্ছল হওয়ার তাঁর অভ্যাস নেই। তাই যখন তিনি আঙুল দিয়ে তার ঠোঁটের উপর আলতো করে চাপ দিলেন তখন হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করল ধীর। আর সঙ্গে সঙ্গে আঙুল সরিয়েও নিলেন।

— তোমাকে বোঝা সত্যিই খুব কঠিন। তোমার গুরুজিকে মিথ্যে কথাটা বলতে গেলে কেন। কাল আমরা ভোরভোর নেমে যেতে পারতাম।

— আমি কোনও মিথ্যে কথা বলিনি ম্যাডাম।

— হাত নেড়ে সোনামকে তুমি সত্যিই এমন সঙ্কেত পাঠিয়েছিলে?

— হাত নেড়ে আমি তা-ই বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু সোনাম কী বুঝেছে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

— তোমার ওই হাতনাড়া সোনাম যে দেখতে পেয়েছে তা তুমি জানলে কী করে?

— আমার অনুমান সে দেখতে পেয়েছে।

— আবার নাও দেখতে পারে?

— হ্যাঁ, তাও হতে পারে।

— তার মানে একটা অনুমানের ভিত্তিতে চরম একটা উৎকণ্ঠাকে তুমি জিইয়ে রাখলে। তোমার উদ্দেশ্য ঠিক আমি ধরতে পারছি না।

ধীর এমন মন্তব্যের কোনও কারণ খুঁজে পেল না। বরং মেমসাহেবের কথাবার্তা তাকে অশান্ত করে তুলল। সোনাম পাহাড়ে চড়তে এসে একটা ভুল সিদ্ধান্তের শিকার। তার মনে হয়নি এমন ঘটতে পারে। তার ধারণা ছিল দুনিয়াকে সে দেখিয়ে দিতে পারে কেমন এলেমদার মানুষ সে। তা হয়নি। এমন ঘটনার শিকার হয়ে প্রচুর মানুষ পাহাড়ে হারিয়ে গেছে। সোনাম এখনও বেঁচে আছে। তাকে সাহায্য করার জন্য ইরিকার তো আজই উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল। তা না করে ধীরের উদ্দেশ্য খুঁজে বের করতে চান। সোনামের ওই অবস্থার জন্য কিছুটা হলেও তো তিনিও দায়ী।

— আমার উদ্দেশ্যর কথা ছাড়ুন কিন্তু আপনি হঠাৎ সোনামকে ফেলে পালাতে চান কেন বলতে পারেন?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ইরিকা ধীরকে বিদ্ধ করলেন।

— কারণ সোনাম ইতিমধ্যেই মারা গেছে। তাকে উদ্ধার করতে চাওয়া নিছক মূর্খামি ছাড়া অন্যকিছু নয়।

— নিজের জীবনের ঝুঁকির কথা বললেন না।

— বললাম না কারণ সেই ঝুঁকি অন্ততপক্ষে আমি নিতে যাব না।

হাসল ধীর। এমন বাক্যবাগীশ আত্মম্ভরি মহিলার হিমালয় ঘুরতে ভাল লাগে কল্পনা করাও কঠিন। হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে পড়লেন ইরিকা।

— তুমি হাসলে কেন?

— সোনামের কাছে পৌঁছতে হলে পাথরের ওই ঢাল ধরে চড়তে হয়। আপনার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, জানেন আপনি অথচ সেটাই আড়াল করার কৌশল নিলেন। না হেসে পারা যায়, আপনিই বলুন?

শুনেও শুনলেন না। যেখানে তারা বসেছিল সেখান থেকে সোনামের আটকে থাকার জায়গাটা আড়ালে চলে যায়। ওইদিকে বার কয়েক তাকালেন ইরিকা টোর।

— যখন জেনেই গিয়েছ ওই ঢালে আমি চড়তে পারি না তখন একা তুমিই কাল উপরে উঠছ, তাই তো?

— আমি তো সেটাই ভেবে রেখেছি।

— তা হলে বেস্ট অব্ লাক জানিয়ে রাখি।

ইরিকা উঠে তাঁর তাঁবুতে ঢুকে পড়লেন। ধীর উঠে ধীরে ধীরে দিরাং-এর অন্তিমসংস্কার

কোন পর্যায়ে দেখতে এগিয়ে গেল। শেষদিকের কাজে নাংগেলজি কোনও ত্রুটি রাখেননি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিটের জন্য ঢিবি মতো জায়গাটার দিকে সে স্থিরনেত্রে তাকিয়ে দেখল। তারপর নিজের তাঁবুর কাছে এসে বসে পড়ল। স্যাকের পকেট থেকে ডায়েরি বের করে দিরাং-এর সৎকার-কাহিনী লিখতে শুরু করল। দূরে পাথর পড়ার শব্দ হয় আর সে মাথা তুলে তাকিয়ে এদিক ওদিক দেখে। তার চোখের সামনে শুধু নীল আকাশ। সূর্য ঢলে পড়লেও ঝকঝকে আলোর আভা চতুর্দিকে। ভারী চমৎকার পরিবেশ। পাশাপাশি কোনও সবুজের চিহ্ন থাকলে সে কিছু আগাছা ফুল হিসাবে দিরাং-এর কবরে রেখে আসতে পারত। তার কোনও সম্ভাবনা নেই। হঠাৎ-ই সে ম্রিয়মান বোধ করল। আপাং কেনির কাছে দিরাং-এর মৃত্যু সংবাদ শুনে বিনতির প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে ভাবতে থাকল ধীর।

একজন মালবাহক চা দিয়ে গেল। চা খেতে গিয়ে তার খেয়াল হল নাংগেল তাফা তার সামনে। সে নিজেই জিজ্ঞেস করল : কিছু বলবেন?

"মেমসাহেব কাল সকালেই নীচে নামতে চান।"

খুব অসন্তুষ্ট হল ধীর। সোনামের আটকে থাকাব মতো এমন সঙ্কটজনক অবস্থাকে কৌশলে হালকা করে দিতে চান উনি। সবার মধ্যেই ফিরে যাওয়ার তাড়া। কারও মধ্যে কোনও হেলদোল নেই। তা দশহাজার কিলোমিটার দূরে থাকা এক বিদেশিনীর তো বয়ে যাওয়ারই কথা।

"কালকের দিনটা থেকে যেতে বলুন। পরশু আমরা সবাই এক সঙ্গে নেমে যাব।"

"আমার মনে হয় কথাটা তোমারই বলা উচিত? ইংরেজি ভাষায় সবটা তুমিই ভাল বুঝিয়ে বলতে পারবে।"

"বেশ, তাই বলব।"

নাংগেল তাফা চলে গেলেন। উনি রাতে মালবাহকদের সঙ্গেই থাকবেন বলে মনে হল ধীরের। তাঁর মালপত্র কিচেন তাঁবুর কাছে সুন্দর করে রাখা দেখে এসেছে সে। মাত্র পঁচিশ ফুট দূরত্বে ইরিকার তাঁবু। দু'জনের তাঁবুতেই ভালভাবে দু'জন থাকতে পারে। সংকোচবশত দু'জন একত্রে থাকা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, তারা একত্রে থাকলে কেউই স্বচ্ছন্দ বোধ করবে না এটাই সম্ভবত বাড়তি একটা তাঁবু বয়ে আনার মূল কারণ। ধীর উঠে ইরিকার তাঁবুর কাছে গেল। সত্যিই যদি তিনি চলে যেতে চান তা হলে পাসপোর্টটা তাঁকে দিয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। পাহাড়ের উপরে হলেও যতটা সম্ভব মেয়েদের সৌজন্য-সম্ভ্রম রক্ষার ব্যাপারে নজর দিতে হয়। তাঁবুর পাশ থেকে ইরিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল ধীর।

— কয়েকটা কথা বলার ছিল। আসতে পারি?

কণ্ঠের ধারালো বক্তব্যে রাগত সম্ভাষণ।

— না যখন বলা যাবে না তখন আসতে পার।

তাঁবুর সামনে এসে বসল ধীর।

— কাল সকালেই আপনি নীচে নেমে যেতে চান শুনে নাংগেলজি চিন্তায় আছেন। প্লিজ, কাল আপনি থেকে যান। পরশু আমরা সবাই নেমে যাব।

— তুমি উপরে সোনামকে উদ্ধার করতে যাবে। আমার তো এখানে কোনও কাজ নেই।

— আপনিও যাবেন উপরে, আমার সঙ্গে।

— আমি ... তোমার সঙ্গে ... উপরে ...! কেন?

ভাবল ধীর। অনেক রকমের উত্তর দেওয়া যায়। আবেগের ধার তেমন ধারেন না ইরিকা। তাও সেখানেই ধাক্কা মারতে চাইল সে।

— কাল সকালেও সোনাম উপরে ঝুলে থাকবে বলে মনে হয় না। যে দুরূহ কোণায় ওকে দেখা গিয়েছে সেখান থেকে পড়লে ওর আর হদিশ পাওয়ার কথা নয়। তাই যাব আর আসব।

কিছুক্ষণ কোনও কথা বললেন না ইরিকা।

— বাইরে হিম পড়া শুরু হয়েছে। তুমি ভিতবে এসে বসতে পার।

কথাগুলো শুনলেও মূলপ্রসঙ্গ থেকে সরল না ধীর।

— তা হলে কালকের প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে গেল?

ইরিকাও কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইলেন।

— আমার হাতে কোনও পাসপোর্ট নেই। কী সমস্যা আমার সামনে আমি জানি। পাসপোর্ট আমার হাতে ঠিক চলে আসবে তুমিই বলেছিলে। কই, এল না তো?

উত্তরটা তৈরিই ছিল তাই অনায়াসে দিয়ে দিল ধীর।

— আপনার পাসপোর্ট আমার হাতে একরকম এসেই গেছে বলতে পারেন। নীচে নামলেই আপনি পেয়ে যাবেন।

বিস্ময়ে ইরিকার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল।

— তোমার হাতে এসে গেছে মানে! কী বলছ তুমি?

— আমি ঠিকই বলছি ম্যাডাম। কিন্তু টাকাটা বোধহয় পেতে কিছু দেরি হবে।

— টাকাটার আমার তেমন প্রয়োজন নেই ধীর। মাত্র দু'শো ডলার ভাঙিয়ে ওই টাকাটা আমি পেয়েছিলাম। যদি পাওয়া যেত তা হলে অবশ্য ওটা দিরাং-এর মিসেসকে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল।

অবাক হল ধীর। দিরাং সম্বন্ধে যাঁর কোনও প্রতিক্রয়াই নেই সেই মৃত মানুষটার স্ত্রীর প্রতি হঠাৎ তাঁর এমন সহানুভূতি দেখে অভিভূত হয়ে গেল ধীর।

— দিরাং-এর মিসেসকে টাকাটা দিতে চান কেন?

— সি ইজ মোস্ট আনলাকি! সি নিডস আওয়ার হেল্প।

কোনও প্রতিক্রিয়া জানালো না ধীর। উঠে তার তাঁবুতে ফিরে এল। পাসপোর্ট থেকে টাকাগুলো আলাদা করে রাখার সময় ধীরেরও বিনতির মুখই মনে পড়েছিল। ফিরে যাওয়ার সময় পুরো টাকা বিনতির হাতে দিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ধীর। কাজটা অনৈতিক ছাড়াও চৌর্যবৃত্তির অপরাধ। বিনতি ও তার আগামী সন্তানের সুখের জন্য এমন কালির দাগ শরীরে নিতে তার সংকোচ ছিল না। ইরিকাও সেটাই চান তবে বিনতি যে সন্তানসম্ভবা এটা তিনি জানেন না। ধীর আবেগের বশে যেটা করতে চেয়েছিল ইরিকা সেটাই বাস্তব অবস্থা বিচার করে করতে চান। তবু টাকাটা ইরিকার হাতে দেওয়া কিছুটা ঝুঁকির হয়ে যেতে পারে বলে মনে হল ধীরের। কারণ ওই টাকার হাতবদল হতে একটা ঠাণ্ডা ইশারাই যথেষ্ট, বিলক্ষণ জানে সে।

ইরিকা টোর ধীরকে সত্যিই ভাবিয়ে তুললেন। যাকে চেনেনই না সেই বিনতির কথা তিনি ভাবছেন অথচ সোনামের ব্যাপারে তাঁর কেমন নিস্পৃহ ভাব। যার সঙ্গে পাহাড়ে ঘুরতে তিনি দশ হাজার কিলোমিটার উড়ে আসেন মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সে কী করে অচেনা মানুষ হয়ে যায়। সোনামের সঙ্গে ধীর দুর্ব্যবহার করেছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ইরিকা তাকে কম হেনস্থা করেননি। তাই এমন মানসিক পরিবর্তন ধীরকে যারপরনাই বিস্মিত করল। যে মানুষটা প্রায় মৃত তার প্রতি ন্যূনতম সৌজন্য দেখাতেও তাঁর তেমন গরজ নেই। বিশেষ করে মানুষটা যখন তাঁর এত কাছের, এত বিশ্বস্ত।

চিকু উদ্ধার

হঠাৎ একটা ঘড়মড় আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল ধীরের। শোবার সময় সে স্বল্পবাস থাকে তাই বাইরে বেরোতে সময় লেগে গেল তার। তাঁবুর চেন টেনে মুখ বের করতেই দেখে ইরিকা টোর। দ্রুত বেরিয়ে এল ধীর। খুব বেশি ভয় পেলে যেমন স্থির হয়ে পড়ে কেউ ঠিক তেমন স্থির। কোনও কথা বলল না ধীর। কোনও কিছুতে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছেন ইরিকা, বুঝতে পারল সে। মাথায় তার চেয়ে ইঞ্চি খানেক বেশিই হবেন তাই কাঁধে হাত না দিয়ে কোমরে হাত রাখল। তার পর আস্তে আস্তে তাঁর তাঁবুতে গেল ধীর। কেউ তাঁকে ধরে আছে দেখে বোধহয় তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

— অনেকক্ষণ ধরেই আমার তাঁবুর চারধারে কেউ ঘুরে ঘুরে তাঁবুর দড়ি ধরে নাড়ছিল। বেরিয়ে এসে দেখতে পেলাম কেউ যেন ছুটে নীচে নেমে গেল।

দুধসাদা জ্যোৎস্নায় সারা মাতরা অঞ্চল এক অপরূপ স্বর্গরাজ্য বলে ভুল হয়। ওখানে তাঁবু ধরে টানাটানি করার লোকের খুবই অভাব। তবে পাহাড়ের সৌন্দর্য মুহূর্তের মধ্যে বীভৎস রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। এত লোকজন যখন কাছেপিঠে তখন ভয় পেতে হলে পাহাড় মাথায় ভেঙে পড়ার দরকার হয়। তেমন কিছু ঘটেছে বলে মনে হল না ধীরের।

— হালকা বাতাসে আপনার তাঁবুর কাপড় শব্দ তুলছে। কেউ তাঁবু নাড়েনি। নীচেও কেউ নেমে যায়নি।

— শব্দটা কিন্তু আমি নিজের কানে অনেকক্ষণ ধরে শুনেছি। যে লোকটা ছুটে নীচে নেমে গেল তাকে দেখতে অবিকল দিরাং-এর মতো।

পাহাড়ের উপরে ধীর অনেক মানুষকে ভয় পেতে দেখেছে। সে নিজেও অনেকবার ভয় পেয়েছে। সুতরাং কোনও ভীত মানুষের মনের অবস্থা নিয়ে বিদ্রুপ করা অনুচিত কাজ। তা সে কখনও করেও না।

— দিরাং অত্যন্ত সজ্জন মানুষ ম্যাডাম। কবর থেকে উঠে এলে সে আমার তাঁবুতে যাবে। আপনার কাছে সে কখনই আসবে না।

ধীরের কথাগুলো শুনে ইরিকা তার অর্থ বোঝার চেষ্টা করলেন। তারপর সহজ হতে চাইলেন।

— না না, আমি তা বলছি না। দিরাং তো মারা গেছে। সে আবার আমার তাঁবুর কাছে আসবে কী করে।

— সেটা তো আমারও কথা। আপনি শুয়ে থাকুন দিরাং কী অবস্থায় আছে আমি

একবার বরং দেখে আসি।

ধীর সত্যি সত্যিই দিরাং-এর কবরের দিকে এগিয়ে গেল। ঢিবির পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তার বুকটা হু হু করে উঠল। যখন সব অন্ধকার সরে গিয়ে ভোরের আলো তাকে স্বাগত জানাতে তৈরি তখনই সে নিরাপদ আশ্রয় বেছে নিল। এর চেয়ে বেদনাদায়ক আর কী হতে পারে!

— আমার ভয় ছিল তুমি গভীর রাতে এখানে এসে দাঁড়াতে পার। কাল তোমাকে উপরে উঠতে হলে এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। যাও তোমার তাঁবুতে ফিরে যাও।

নাংগেল তাফা ঠিক তার পিছনে। একটুও টের পায়নি সে।

— ম্যাডাম খুব ভয় পেয়েছেন। মনে হয় তাঁর কাছাকাছি থাকা দরকার।

তারা দু'জন ইরিকার তাঁবুর কাছে আসতেই তাঁর গলার আওয়াজ পেল ধীর।

— তোমার কি আমার তাঁবুতে আসার আপত্তি আছে?

এক সেকেণ্ড লাগল ধীরের উত্তব দিতে।

— না, কোনও আপত্তি নেই। আমি এক্ষুনি আসছি।

নিজের তাঁবু থেকে স্লিপিংব্যাগ আর ন্যাপটা তুলে নিয়ে ইরিকার তাঁবুতে ঢুকে পড়ল ধীর। নাংগেল তাফা কিচেন থেকে ধীরের তাঁবুতে গিয়ে উঠলেন। সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে গেল।

রাত চারটের সময় ইরিকা ও ধীরের জন্য গরম চা নিয়ে হাজির নাংগেল তাফা। তার কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ভারী ব্রেকফাস্ট তৈরি। শুধু তাই-ই নয়, ধীরের কথামতো দড়ি ও চড়ার সরঞ্জাম স্যাকে ভরে মানজু ও তিনজন মালবাহক ওই ভোররাতেই রেডি। মোরেন, বোল্ডার ও শক্ত বরফ সরিয়ে তারা ছ'জন সেই ঢালে পৌঁছাতে অনেকটা বেশি সময় নিয়ে ফেলল। দশ মিনিট ধরে দেখার পরও ইরিকা সোনামের হদিশ পেলেন না। তিনি হাল ছেড়ে দিলেন।

মাতরা গিরিশিরার উপর ইউ-কে দূর থেকে দেখলে মনে হয় কোনও এক বিশাল চেহারার দৈত্য যেন পিছন ফিরে দু'পাশে হাত মেলে দিয়েছে। সেই মেলে দেওয়া ডানহাতের গোড়ায় 'ইউ'-এর পুবকোণা ও ভাঙা রিজের অবস্থান। এমনিতেই আলোর অভাব ওই জায়গায় তার উপর সূর্য ওঠার তখনও দেরি ছিল। ম্যাডামের হাত থেকে বাইনোকুলার নিয়ে চোখ রাখার আগে সে কিছুক্ষণ ধরে হাত নেড়ে গেল। তার পর বাইনোকুলার দিয়ে অন্ধকার

খাঁজের বিভিন্ন অঞ্চল ধরে ধরে চোখ ঘোরাতে থাকল। কোনও চিহ্নই তার নজরে এল না। হতাশ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা জেনেও ধীর এসেছিল একটাই কারণে। সোনাম চরম দুরবস্থায় থাকতে অভ্যস্তই শুধু নয় তার পাহাড়ি মানুষের জান। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও সে বাঁচতে চাইবে। শেষ চেষ্টা করতে সে মরিয়া হবে এটাই স্বাভাবিক। অথচ যেখানে কাল তাকে নড়তে দেখা গিয়েছিল সেখানে তাকে দেখতে পেল না ধীর।

— ম্যাডাম, আরও কিছুটা উপরে উঠলে হয় না। শ' খানেক ফুট সহজেই আমরা উঠে যেতে পারি। মনে হয় সেখান থেকে ভাল বোঝা যেতে পারে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পিছনে ঢাল ধরে এগিয়ে এলেন ইরিকা টোর। সঙ্গে মানজু ও দু'জন মালবাহক। টুকবো পাথরের ঢাল শেষ হওয়ার সামান্য আগেই ধীরকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। সামনে তাদের শক্ত পাথরের দুরূহ ঢাল। বিভিন্ন খাঁজে বরফ থাকায় পাথরের ঢাল কিছুটা পিচ্ছিল।

— তুমিই ঠিক ধীর। আমার মনে হয় সোনাম এখনও ওখানে নড়াচড়া করছে। বোধহয় ও আমাদের দেখতে পেয়েছে।

ধীরের মনে হল কেউ তার ঘাড়ে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল। পিছন ফিরে দেখল ম্যাডামের চোখের উপর তখনও বাইনোকুলার লাগানো। তার হাতে বাইনেকুলার দিলেন ইরিকা।

— নাও, এবার তুমি দেখে বলো আমি ঠিক বলছি কি না।

তাকিয়ে দেখে বুঝল ধীর ম্যাডাম একশ দশ ভাগ ঠিক। সোনাম কি হাতও নাড়ল তাদের দেখে! ঠিক বুঝতে পারল না ধীর। হঠাৎ তার মধ্যে একটা আশঙ্কা দেখা দিল। কেউ সাহায্য করার মতো না থাকলে এমন দুরূহ ঢালে যদি সে বিপদে পড়ে তখন? অন্ততপক্ষে দড়ি ধরার মতো একজন অবশ্যই থাকা দরকার। একবার ম্যাডামকে অনুরোধ করে দেখলে কেমন হয়।

পিছন ফেরে ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে ধীর স্তম্ভিত। ইরিকা হারনেস পরে পিটন-স্লিং-ক্যারাবিনার ও হ্যামার ঝুলিয়ে তৈরি। হেলমেট হাতে দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

— যুদ্ধে যাচ্ছি, তুমি আমার সেনাপতি বলে কথা। প্রথম গুলিটা অন্তত আমাকেই খেতে দাও।

জীবনে এত অবাক সে আগে কখনও হয়েছে বলে মনে পড়ল না ধীরের। সে খুব লজ্জায় পড়ে গেল। এমন একজন রক ক্লাইম্বারকে চিনতে সে ভুল করল!

— আপনি লিড় করবেন! আমি আগে গেলে হত না?

— তুমি তো আছই। আমি একবার চেষ্টা করে দেখি পারি কি না। দাও, পরিয়ে দাও।

কোনও কথা না বলে ধীর ইরিকার মাথায় হেলমেট পরিয়ে দিল। নাংগেল তাফা সব দড়ি সুন্দর করে আলগা কয়েলে বেঁধে দিয়েছিলেন। মানজুও যে পিছনে পিছনে তাদের সঙ্গেই উপরে উঠছে দেখেছিল ধীর। কিন্তু সে যে ইতিমধ্যে দড়ি বের করে ম্যাডামের সাহায্যে হাত লাগাতে পারে এটা সে ভাবেনি। ওই প্রথম তাকে একজন তৎপর ক্লাইম্বার বলে মনে হল ধীরের। মুহূর্তের মধ্যে দড়ি হারনেসের ক্যারাবিনারে লাগিয়ে ইরিকা ধীরকে ছাড়িয়ে উপরে এসে দাঁড়ালেন। ঠিক সেই সময় মানজু ধীরেব কাছে তার ন্যাপ ও চড়ার সরঞ্জাম এগিয়ে দিল। সে-ও তৈরি হয়ে নিল। মিনিট দশেক পাথরের ঢাল ভাল করে দেখে নেওয়ার পর পাথরের উপর শব্দ করে দুটো জুতো ঠুকে নিলেন।

"রেডি, ধীর?"

'ইয়েস, রেডি ম্যাম!"

দড়ি ধরে ধীব ম্যাডাম ইরিকার ঢালে চড়া শুরু করার অপেক্ষায় থাকল। সামান্য কয়েকটা স্টেপ যাওয়ার পর ইরিকা টোরের শৈলারোহণ কী অপূর্ব ছন্দে সাজানো বুঝতে পারল ধীর। তার হাতের দড়ি দ্রুত সরে সরে এগিয়ে যেতে থাকল। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর পিটন মেরে নিজেকে সুরক্ষিত করলেন ইরিকা। তিন মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার এগোতে শুরু করলেন। ঢাল কিছুটা দুরূহ হওয়ায় ইরিকার চড়া দেখতে পেলেও তিনি কীভাবে এগোচ্ছেন তা বুঝতে পারল না ধীর। গতি বেশ কমে যাওয়ায় খুব চিন্তা হচ্ছিল তার। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর ফের পিটন ঠোকার শব্দ পেল ধীর। শব্দ থেমে যাওযার পাঁচ মিনিট পর ইরিকা হাঁক পাড়লেন।

"আমি রেডি। তুমি উঠে এসো। আসার সময় পিটনটা দেখে নিও।"

উপরে ওঠার আগে ধীর বাকি দড়ি তার ন্যাপস্যাকে ভরে নিল। হেলমেট পরার পর মানজুকে কী করতে হবে সে বুঝিয়ে দিল।

"অগর তুম কুছ গলতি কিয়া তো মেমসাব অওর ম্যায় সিধা নীচে। হুঁশিয়ারিসে কাম উঠানা।"

"বিলকুল সাব্।" মাথা নেড়ে উত্তর দিল মানজু।

উপরে তাকাল ধীর। তার পর হাতের ইঙ্গিতে ইরিকাকে জানিয়ে দিল সে উপরে উঠছে। ঘাড় নেড়ে উনি সম্মতি জানালেন।

উপরে একজন উঠে গেলে পরের মানুষের উঠতে বেশি সময় লাগে না। তা সত্ত্বেও

প্রায় পঁচিশ মিনিট পর ধীর ম্যাডামের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মাতরা হিমবাহ তাদের চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিল! ভাঙা রিজ মাথা উঁচু করে তাদের ডানদিকে দাঁড়িয়ে। সেই রিজের গা ঘেঁষে তাদের উপরে ওঠার পথ। সুন্দর জায়গায় দাঁড়িয়ে বিলে করে ইরিকা তাকে উপরে উঠতে সাহায্য করেছিলেন। এমন দুরূহ ঢালে বিলে করার সুবিধের জন্যই তিনি বেশি ঝুঁকি নিয়ে ওখানে পৌঁছেছিলেন। মুগ্ধ হল ধীর। একজন অভিজ্ঞ ক্লাইম্বারের চৌকশ মুন্সিয়ানা ছাড়া এটা সম্ভব হয় না। কিছুটা ঘুরে উপরে ওঠার ফলে সোনাম তাদের আড়ালে চলে গিয়েছিল। দরকার পড়লে যাতে দড়ি ছেড়ে যেতে পারে সেজন্য তারা নাংগেল তাফার হলুদ দড়ি দিয়ে চড়া শুরু করেছিল। তিনশো ফুটের তখনও একশ ফুটের বেশি তাদের হাতে। মানজুকে বলা ছিল দড়ি শেষ হওয়ার সময় সে যেন দড়ির শেষ ভাগে পাথর বেঁধে দেয়।

এর পর ধীরের আগে যাওয়ার পালা। সেভাবেই তৈরি হচ্ছিল সে। কিন্তু হলুদ দড়ি যতটা যায় ততটা পর্যন্ত ম্যাডাম যেতে চান। তাঁকে দেখার পর ধীর আর আপত্তি করেনি।

— এবার আপনি সোজা যাওয়ার চেষ্টা করবেন। সোনামকে যাতে দেখতে পাওয়া যায় এমন জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন।

হাসলেন মেমসাহেব। অর্থটা পরিষ্কার—চাইলেই কি পাহাড়ে নিজের পছন্দমতো কাজ করা সম্ভব!

— উপরের অবস্থা কেমন তা তো জানি না। তবে চেষ্টা করব।

বিলে করার সময় সতর্ক থাকলেও ইরিকার মোড় নিয়ে এঁকেবেঁকে উপরে ওঠা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল ধীর। তবে তার পক্ষে সোজা হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। দড়ির টান ক্রমাগত বাড়তে থাকায় চিন্তা হচ্ছিল তার। দড়িতে বাড়তি টানের অর্থ যিনি চড়ছেন তিনি খুব স্বস্তিতে নেই। আধঘন্টা পরও কোনও পিটন মারার শব্দ পেল না সে। ম্যাডাম হঠাৎ ঢাল থেকে পড়ে গেলে ভয়ঙ্কর বিপদ হতে পারে অথচ উনি কোনও বিপদ-সঙ্কেত পাঠানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। তার হাত থেকে দড়ি সরে সরে উপরে এগিয়ে গেলেও তার চিন্তা দূর হল না। হঠাৎ সে পিটনের আওয়াজ পেল। যেন ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছাড়ল। আরও পাঁচ মিনিট পর উঠে আসার নির্দেশ পেল ধীর।

উপরে ওঠার সময় দড়িতে কেন এত টান ছিল বুঝতে পারা গেল। ঢালের অনেকটা জায়গা জুড়ে কোনও খাঁজ নেই। হাত দিয়ে ধরার বা পা রাখার তেমন সুবিধে ছিল না। ফলে ম্যাডামকে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এধার ওধার করে কোনও মতে সামাল দিতে হয়েছিল। অনিবার্য বিপদ থেকে তারা দু'জন কোনও রকমে বেঁচে গিয়েছিল। হিসাবে একটু এদিক ওদিক হলেই সব শেষ হয়ে যেতে পারত। ম্যাডামের কাছে গিয়ে ধীর যখন পৌঁছল তখন ঘড়িতে সাড়ে আটটা। অর্থাৎ প্রায় তিনশো ফুট উঠতে তাদের দু'ঘন্টা লেগে গিয়েছিল। তবে

এত করেও সোনাম চিকু সেই আড়ালেই থেকে গেল। পাথরের উপরে মাথা রেখে ইরিকা কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশটা হেলিয়ে দিয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিলেন। ক্লান্ত হওয়ারই কথা। জলের বোতলে ইলেকট্রল ঢেলে তাঁব দিকে এগিয়ে দিল ধীর। কয়েক ঢোক খেয়ে বোতলটা ফেরত দিল ইরিকা।

— এবার কিন্তু তোমার পালা। হাসল ধীর। ম্যাডামের প্রতি দারুণ কৃতজ্ঞ বোধ করল সে। যেটা তার স্বভাবে নেই সেটাই হঠাৎ করে বসল ধীর। হাতের আঙুল দিয়ে ইরিকার ঠোঁট স্পর্শ করল। অবাক হলেন তিনি।

— তুমি তো স্বামীজি! তুমি আবার কবে থেকে এত স্মার্ট হলে?

কোনও উত্তর না দিয়ে ন্যাপে বোতল ভবে হলুদ দড়ির সঙ্গে তাব নিজের নীল দড়ি জুড়ে নিল ধীর।

— উত্তরটা পরে দেব। এখন আপনি বিলে করুন।

দড়ি ধরতেই ধীর ঢাল ধরে এগিয়ে গেল। প্রথম পঞ্চাশ ফুট খুব সহজ ঢাল। তার পর ডানদিকে চলে গেলে ইরিকা তাকে আব দেখতে পাবেন না। পিটন না মেরে পাথবে দড়ি গলিযে লুপ বানালো ধীর। ক্যারাবিনারে দড়ি পরিয়ে সে ডানদিকে ঢুকে পড়ল। আর অমনি তার চক্ষুস্থির! দুটো হাত একটা পাথরের উপর ঝোলানো। মাথা বা শরীরের অন্য অংশেব হদিশ নেই। আরও প্রায় পঞ্চাশ ফুট অসম্ভব কষ্টকর ঢালে ওঠার পর সে দেখল মাঝখানে প্রায় তিরিশ ফুটের এক পিচ্ছিল শ্যাওলা পড়া অংশ। কোনও কিছু ভাবার আগেই ধীর পিটন মারতে চাইল। কিন্তু কিছুতেই কোনও ফাটল তার চোখে পড়ল না। মরিয়া চেষ্টার পর ফাটল পেলেও সেখানে লাগানোর মতো পিটন তার কাছে ছিল না। শেষমেষ মন্দের ভাল পাথরে লুপ পরিয়ে নিজেকে কিছুটা বিপদমুক্ত করল ধীর। মুখ তুলে সে তাকিযে দেখল কিন্তু সেই দু'হাতের পাশে কোনও মুখ উঠে এল না। পিটনে হাতুড়ি ঠুকে শব্দ করার পর সত্যিই একটা মুখ দু'হাতের মাঝখানে দেখা দিল। সে চোখের দৃষ্টিতে কোনও ভাষা ছিল না। থেকে থেকে চোখ বুজে আসছিল। সোনামকে দেখে তার চোখ ফেটে জল আসতে চাইলেও সে স্থির থাকল।

— সোনামভাই, ম্যায় ধীর। আপকো নীচে লেনেকো লিয়ে আয়া হুঁ।

কথাটা শোনার পর অনেকক্ষণ ধরে স্থির দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল সোনাম। মাত্র চল্লিশ ফুট দূরে থাকলেও সোনামের কথা সে কোনও মতে বুঝল। অস্ফুট তোতলানো তার ভাষা।

— ম্যায় চল নেহি পাতা। সায়েদ ম্যায় জা নেহি স্যাকেগা।

সব কথা এক সঙ্গে বলতে চাইল ধীর।

— আপকো চলনাহি পড়েগা। হিম্মত হারনা মাত। ডরনা মাত। হম সব আপকা সাথ হ্যায়।

ধীর সোনামের উত্তরের জন্য আর অপেক্ষা করল না। পৃথিবীর কারও পক্ষেই দড়ি ছাড়া ওই শ্যাওলা-পড়া ভেজা অংশ দিয়ে নামা সম্ভব নয়। ঘটনা কী ঘটেছিল তা পরে জানলেও চলবে। এখনই তাকে ওখান থেকে শ্যাওলার এপাশে আনা প্রয়োজন। ন্যাপ থেকে সেই ষাট ফুটের ইমারজেন্সি দড়ি বের করে তার সঙ্গে ধীর একটা স্লিং ও ক্যারাবিনার বেঁধে নিল। তার পর কয়েকবার ছোঁড়াছুঁড়ি করার পর সেটা সোনামের হাতের কাছে গিয়ে পড়ল। একজন দক্ষ ক্লাইম্বার বলেই ধীর কী চাইছে সে বুঝতে পারল। অন্যপ্রান্তে দড়ি ধরে ধীর অপেক্ষা করে থাকল। সোনাম শ্যাওলায় এসে নীচে গড়িয়ে পড়ার আগেই সে বিলে করে এপাশে তাকে নিয়ে আসতে পারে।

— জলদি কিজিয়ে সোনামভাই, তুরন্ত নীচে উতারনা হ্যায়।

কোমর তুলে সোনাম উঠে দাঁড়াতেই ধীর বুঝল তার দুটো হাতেই আঘাত। ফলে তাকে ফের বসে পড়তে হল। ঘষটে ঘষটে পিচ্ছিল অংশটার কাছে এসে ধীরের দিকে তাকাল সোনাম। হঠাৎ নিজেকে ছেড়ে দিল সে। ঝাঁকুনিটা হঠাৎ এলেও সামলে নিল ধীর। প্রায় পনেরো মিনিটের চেষ্টায় সোনামকে কোনও ক্রমে তার সামনে আনতে পারল ধীর। কী করে সোনাম ওপারে গিয়েছিল ভেবে অবাক হল ধীর। ভাল করে পরীক্ষা করে সে বুঝল সোনাম নিজের চেষ্টায় দড়ি ধরেও নীচে নামতে সমর্থ নয়। ঢালের উপর ঘষটে সে হয়তো নীচে নামতে পারে। তবে সেটাও দড়িতে বাঁধা অবস্থায়। যে কোনও উপায়ে সেই ডানদিকে মোড় নেওয়ার জায়গায় সোনামকে নিয়ে যেতে হয়। তার চড়ার দড়ির সঙ্গে ক্যারাবিনাব আটকে ষাট ফুটের দড়িতে ধরে ধরে বাঁকের মুখে সোনামকে নিয়ে এল ধীর। বাঁকের মুখে সোনামকে বেঁধে রেখে উপর থেকে সে দড়ি খুলে নিয়ে এল। ক্যাডবেরি আর জল খেয়ে সোনামের গলার আওয়াজ বেরোতে গিয়ে রক্তেব দলা বেরিয়ে এল। দেখেও দেখল না ধীর। তাকে জড়িযে ধরে অনেকক্ষণ অঝোরে কাঁদল সোনাম। সে বাধা দিল না। শেষ দিকটায় এমন হাউমাউ অসহায় মানুষের কান্না যে তার খুব অসুবিধে হচ্ছিল।

— সোনাম ভাই, আভি স্রিফ নীচে উতারনা।

চুপ করে গেল সোনাম।

বাঁক থেকে ইরিকাকে চিৎকার করে ডাকল ধীর। নীচে থেকে আওয়াজ পাওয়া মাত্র ধীর তাঁকে দড়ি ধরে উপরে আসতে বলল। দড়ি ধরে মাত্র দশ মিনিটেই ইরিকা সহজ ঢাল ধরে বাঁকের মুখে এসে গেলেন। সোনামের অবস্থা দেখে উনি বেশ মুষড়ে পড়লেন।

— নষ্ট করার মতো সময় নেই আমাদের হাতে। সোনামকে দড়িতে বেঁধে আমি নীচে নামতে সাহায্য করছি। আপনি ওর পাশে থাকুন।

ওই সহজ ঢালেও ঘষটে ঘষটে নামতে হল সোনামকে। পঞ্চাশ ফুট ওইভাবে নামতে তার প্রায় এক ঘন্টা লেগে গেল। ইরিকা টোরকে সামনে দেখেও তার মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। থেকে থেকে তার মাথা ঝুলে যাচ্ছিল। হলুদ দড়ির কাছে গিয়ে ধীর ইরিকার সঙ্গে আলোচনায় বসল। নীচের ঢাল একটু বেশি খাড়াই ফলে কিছুটা ঝুলে ও কিছুটা ঘষটে নীচে নামা ছাড়া সোনামের কাছে আর কোনও অন্য উপায় নেই।

— নীল দড়িতে বেঁধে আমি সোনামকে নীচে নামাব। আপনি হলুদ দড়ি ধরে ওর সঙ্গে সঙ্গে নামবেন। দেখবেন পাথরে ওর আঘাত যেন বেশি না লাগে।

— আর তুমি?

— আপনারা নামার পর হলুদ দড়ি ধরে আমি নেমে যাব। যাওয়ার সময় দুটো পিটন আমি খুলে নিয়ে যাব।

— হলুদ দড়ি কি রেখে যাবে?

— হ্যাঁ, সঙ্গে আপনার দামি পিটনটাও।

হারনেস পরিয়ে সোনামকে নীচে ঝুলিয়ে নামানোর সময় তাকে আঘাত থেকে পুরোপুরি বাঁচানো যায়নি। ইরিকা অবশ্য তাঁর মতো করে চেষ্টা করেছিলেন। সোনামকে নামানোর পর আধঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে তবেই ধীর নামতে শুরু করে। নীচে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ইরিকা টোর। সোনামকে মালবাহকদের পিঠে করে নিয়ে যাওয়াব ব্যবস্থা হল। মানজু সাহায্যকারী হিসাবে তাদের সঙ্গে থাকল।

সাড়ে চারটের সময় তারা ক্যাম্পে এসে পৌঁছল। আশ্চর্য হল ধীর। বারো ঘন্টা ধরে উপর-নীচ করা সত্ত্বেও নিজেকে তার ক্লান্ত মনে হয়নি। সোনামকে যে উদ্ধার করা সম্ভব এটা নাংগেল তাফা বিশ্বাস করতে পারেননি। প্রচুর ধন্যবাদ জানালেন তিনি ধীর ও ইরিকাকে। বললেন বটে কিন্তু এমন একটা অভাবনীয় ঘটনায় যে উচ্ছ্বাস থাকা স্বাভাবিক ছিল তা নাংগেল-এর বলার ধরনে অনুপস্থিত। যেন হয়েছে ভাল কিন্তু না হলেও কোনও অসুবিধে ছিল না। পাহাড়ি মানুষজন এমন নয়। তারা অল্পেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। প্রচুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তার আর ওসবে প্রয়োজন নেই। কিন্তু বুঝল কোথাও কিছুর মারাত্মক অভাব। গোল হয়ে আগুনের সামনে ব্যাপক আলোড়ন তোলার মতন ঘটনা ঘটল না।

ধীর ইরিকার সঙ্গে সোনামকে দেখতে গেল। তারই পড়ে থাকা বিছানাতে তাকে শোয়ানো হয়েছিল। তাদের পায়ের শব্দে সে চোখ খুলল। উপরে একবারের জন্যও সোনাম ইরিকাকে

চিনতে পারেনি। হঠাৎ সে পাশ ফিরে ইরিকার দুই পায়ের জুতোর উপর মুখ রাখল। ঘটনাটা এতই আকস্মিক যে তিনি দু'চোখ বন্ধ করে ফেললেন। ধীর তাঁকে পাশ থেকে না ধরলে হয়তো তিনি টাল খেয়ে পড়েও যেতে পারতেন। এমন অবস্থার মধ্যে মেমসাহেবকে বোধহয় কখনও পড়তে হয়নি। ইরিকাকে সরিয়ে ধীর সোনামের মাথা হাত দিয়ে ধরল।

— আপ আভি বহত পরিশান হ্যায়, সোনামভাই। আভি রেষ্ট লেতে রহো। হম দোনো কল আপসে সুব্‌বে মিলেঙ্গে।

ঝুম মেরে গেলেন ইরিকা। অসম্ভব গম্ভীর হয়ে সেফটিপিন দিয়ে নখের ভিতর থেকে ময়লা বের করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

— আসলে এখন সোনামের মাথার ঠিক নেই। ওর বিশ্বাসই হচ্ছে না যে ও সত্যিই বেঁচে আছে। আপনার প্রতি ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চেয়েছে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে তাকালেন ইরিকা।

— কী ইচ্ছে করছে জান?

— কী?

— সেফটিপিন দিয়ে তোমাব চোখ দুটো ফুটিয়ে দিই।

— কেন, আমি আবার কী করলাম?

— কারণ তুমি কিচ্-চ্ছু বোঝো না। অবশ্য তুমি বুঝবেই বা কী করে!

— না বললে বুঝব কী করে। বলুন না, রহস্য করছেন কেন?

কোনও কিছু উত্তর না দিয়ে ইরিকা তাঁর তাঁবুতে চলে গেলেন। গুটিগুটি পায়ে ধীরও তাঁর তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ধীর অবাক। সোনামকে নিয়ে পাঁচজন মালবাহক নাকি রাত তিনটেয় নীচে রওনা হয়ে গেছে। বাকি জিনিসপত্র নিয়ে মানজু ও নাংগেল তাফা নামার জন্য তৈরি। তারা একদিনেই চাসু পৌঁছে যেতে চায়। এত তাড়াহুড়োর কী আছে বুঝতে পারল না ধীর। নাংগেল তাঁর শান্ত কণ্ঠে যাওয়ার আগে পরামর্শ দিয়ে গেলেন।

"মেমসাহেবকে নিয়ে তুমি ধীরে সুস্থে নামো। আমরা এগোচ্ছি।"

কিছু বলল না ধীর। মানজুকে সঙ্গে নিয়ে নাংগেল হিমবাহের পথ ধরে এগিয়ে গেলেন।

তাঁবুর বাইরে মেমসাহেব নোংরা কুড়িয়ে একত্র করছিলেন। ধীর তার স্যাক থেকে গ্যাস স্টোভ বের করে চা বসাল। চা নেমে যেতেই ইরিকা তার তাঁবুর কাছে এসে বসলেন। চা খেতে খেতে অনেক চেষ্টা করেও ধীর কিছুতেই নাংগেল তাফা-র এমন আচরণের অর্থ খুঁজে বের করতে পারল না।

— তুমি খুব অবাক হচ্ছো তোমার গুরুজির আচরণে, ঠিক তো?

— হ্যাঁ, হচ্ছিই তো। উনি তো এমন মানুষ নন।

— বৃথাই তুমি নিজের প্রাণ বিপন্ন করে সোনামকে ফিরিয়ে নিয়ে এলে।

অবাক বলে অবাক, অসম্ভব অবাক হল ধীর।

— সেটা তো আপনিও করেছেন; কিন্তু বৃথা বলছেন কেন?

— আমি তোমার সঙ্গে উপরে গিয়েছিলাম কিন্তু মোটেই ইচ্ছে ছিল না।

— কী বলছেন আপনি।

— বলতে হচ্ছে কারণ আমি জানি এত করেও সোনামকে বাঁচানো যাবে না। তুমি সেটা জান না।

— মানে।

ধীরের মানের উত্তর দিল ইরিকা। কিন্তু সে উত্তর দীর্ঘ এবং তার বিবেচনায় অবিশ্বাস্য। তবু শেষ পর্যন্ত শুনল ধীর।

সানজিধামের বিচিত্র বিধানে যে কোনও সানজিমাতা দেবী হলেও পঁযত্রিশে পা দিলেই পুরুষের সঙ্গে তাঁর সহবাসে নাকি কোনও বাধা নেই। তবে সেই পুরুষকে অবশ্যই পেডাং সম্প্রদায়ের মানুষ হতে হবে। বর্তমানে পেডাং সম্প্রদাযভুক্ত পুরুষ ক্বচিৎ মেলে। তেমন কোনও পুরুষকে যদি কোনও সানজিমাতা সহবাসে আবদ্ধ হওয়ার আমন্ত্রণ জানান তা হলে তা গ্রহণ করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। এর ফলে কোনও সানজিমাতা সন্তানসম্ভবা হলে তিনি পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত 'ধাত্রীমাতা' হিসাবে পূজিত হতে পারেন। সানজিধামে কিছুটা কতৃত্বও করতে পারেন। তাতে তাঁর কোনও মর্যাদাহানি হয় না। বরং তিনি অসীম মাহাত্ম লাভ করেন। তবে মাতৃত্বদানকারী পুরুষটিকে সারাজীবনের মতো চাসু উপত্যকা থেকে দূরে সরে যেতে হয়। তাকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়। সে কোনওদিন ওই পিতৃত্বের কথা কাউকে বলতে পারে না।

মাতৃত্বের ঘটনা না ঘটলে পঁয়ত্রিশ বছর পার করার পরদিনই সাধারণ নিয়মে

সানজিমাতাকে ধাম থেকে সরে যেতে হয়। আনজু সবে পঁয়ত্রিশে পড়েছেন। অন্যদিকে, নতুন সানজিমাতাকে নাকি ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি আশ্রম অভ্যন্তরে বিভিন্ন আচার-প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুশীলনরতা। সোনাম নিজে না বললেও আনজু নাকি জানতে পেরেছিল যে সে পেডাং সম্প্রদায়ভুক্ত। শুধুমাত্র ওই কারণেই তিনি নাকি সোনামের প্রচুর অন্যায় সহ্য করেছেন। ইরিকার কাছে খবর আছে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অভিপ্রায়ে আনজু মা হতে চান। তিনি সোনামকে প্রস্তাবও দেন। যাঁকে সে দেবীজ্ঞানে পূজা করে তাঁর এমন প্রস্তাবে সোনাম ক্রোধে ফেটে পড়ে। তার অপরাধ তাই ক্ষমার অযোগ্য। সানজিধামের ঐশ্বরিক বিধানে সোনামের চরম শাস্তি প্রাপ্য। ইরিকার ধারণা সেই শাস্তি, মৃত্যু। এত তড়িঘড়ি বেঁচে ফিরে আসা সোনামকে ধামে নিয়ে যাওয়ার নাকি এটাই মূল কারণ।

অবাক হওয়ার ভাবটা গল্পের মাঝখানেই কেটে গিয়েছিল ধীরের। ফিরিক্ করে যে হাসি হাসলে কোনও কথাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় সেই হাসি হাসল সে।

— আসলে কী জানেন ম্যাডাম, আপনারা বিদেশীরা ভারতীয়দের মানুষ বলেই ভাবেন না। না হলে সানজিমাতা সম্বন্ধে আপনি এমন কথা বলতেন না। কোথায় সোনাম আর কোথায় তিনি।

ইরিকাও হাসলেন। তবে তা বিপন্ন ছন্নছাড়া মুখের অসহায় অভিব্যক্তি মাত্র।

— বিদেশীরা ভারতবিদ্বেষী এমন মন্তব্য দিয়ে সত্যকে আড়াল করা যায় না ধীর। সোনাম ক্ষ্যাপাটে বা বদমেজাজি হতে পারে, কিন্তু তার ক্ষমতালিপ্সা নেই।

— আপনি তো সানজিমাতাকে ভিলেন বানিয়ে দিলেন।

— তা হয়তো দিলাম কিন্তু তুমি সাবধানে থেকো। অনুরোধ এলেও তুমি ধামে থাকতে যেও না।

— আমার আবার সাবধানে থাকার কী আছে!

একটু ভাবলেন ইরিকা টোর। তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। কথা এক হলে তাব উত্তর হল আর এক।

— ধামে পৌঁছাতে আমাদের কাল সকাল গড়িয়ে যাবে। আমার পাসপোর্ট নেই আর তুমিও নিরুপায়। কালই আমাদের চাসু ছেড়ে যেতে হবে। মনে থাকে যেন।

— আপনি কি কোনও ব্যাপারে ভয় পাচ্ছেন?

— কেউ যাতে দেখতে না পায় এমনভাবে চাসু ছাড়ার সময় তুমি পাসপোর্টটা আমার ন্যাপে ঢুকিয়ে দিও। এবাব কিন্তু আমাদের উঠতে হয়।

হাজার চিন্তা ধীরের মাথায় পাক দিতে থাকল। ওই প্রথম তার মনে হল ইরিকা টোর এখন থেকে সত্যিই তার নেত্রী। বাকি দেড়দিন তার ম্যাডামের কথামতো চলা উচিত।

শহিদ সোনাম

পরদিন সকাল আটটায় ইরিকা টোর ও ধীর বিশ্বাস সানজিধামে গিয়ে হাজির হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন আশ্রমিক মহিলা তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে তাদের দু'জনকে সম্মান জানালেন। মাথা তুলেই তিনি তাদের ওই অবস্থাতেই এক প্রশস্ত উঠোনে নিয়ে এলেন। উঠোনের দরজা মহিলাটি ঠেলে খুলে দিতেই তারা দেখল চাসু উপত্যকার প্রায় সবাই সেখানে উপস্থিত। এত সকালে সবাই এসে জড়ো হওয়ার কারণটা ঠিক কী বুঝতে পারল না ধীর। তারা দু'জনই সানজিমাতাকে লক্ষ্য করে তাদের প্রণাম জানাল। মাতাজি ঈষৎ মাথা নেড়ে সেই প্রণাম গ্রহণ করলেন। মুখে তাঁর স্মিতহাস্য।

কিছুটা অর্ধগোলাকার বৃত্তে তারা দাঁড়িয়ে, যেন সবাই তাদের আসার অপেক্ষায় ছিল। মাঝখানে সানজিদেবী নিজস্ব বহিরঙ্গ ও মহিমায় দণ্ডায়মান। তাঁর বামদিকে কিছুটা দূরত্বে ও ভঙ্গিমায় পরপর নাংগেল তাফা, ধামি আজান ও আপাং কেনি। মাতাজির সোজাসুজি প্রায় পনেরো ফুট দূরে তারা দু'জন শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছিল। এমন মহাজোটের কারণ থাকাই স্বাভাবিক। সানজিদেবীর মধ্যেকার সেই উজ্জ্বল মাধুর্য হঠাৎ কেন উবে গেল জানার ইচ্ছে হল ধীরের। কিন্তু এত গম্ভীর পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব হল না। হঠাৎ সানজিমাতা মুখ খুললেন।

— আপনারা বোধহয় আজ এখানে সবাইকে দেখে বেশ বিস্মিত হয়েছেন। তার কারণ চাসু উপত্যকার মানুষ আজ আপনাদের অভিনন্দন জানাতে চায়।

কীসের জন্য অভিনন্দন সেটা ধীব অনুমান করতে পারল। ইরিকার দিকে সে তাকিয়ে দেখল তাঁর অসম্ভব নিস্পৃহ মুখ। কী হচ্ছিল তাঁব মধ্যে সেটা বোঝা গেল না। মাতাজি আবাব শুরু করলেন।

— আমরা সবাই চাসু উপত্যকার মানুষজনেব তবফে আপনাদেব সেবা ও মানবিকতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আপনারা বার বাব এখানে আসবেন আশা প্রকাশ করছি।

কোনও কিছু একটা প্রত্যুত্তর দেওয়া সৌজন্যবোধের পরিচয় কিন্তু ইরিকার মুখে কোনও কথা ছিল না। অগত্যা ধীরকে চুপ করে থাকতে হল।

— আপনাদের জন্যই আমরা আজ রাতে একটা বিশেষ উৎসবের আয়োজন করেছি। আপনাবা দু'জন আজ আমাদের মাননীয় অতিথি।

তবু ইরিকা কিছু বললেন না অথচ বলা উচিত। ধীরকে এবারও চুপ করে থাকতে হল।

— তা হলে ধরে নিচ্ছি আজ রাতে আপনারা আমাদের অতিথি হতে রাজি হয়েছেন।

সেই মতো আমরা আয়োজন করতে পারি।

যে ভুলটা সে এতক্ষণ করেনি শেষ পর্যন্ত সংযম হারিয়ে সেটাই ধীর করে বসল। ইরিকার রক্তচক্ষু দেখার আগেই তার কথা বলা শেষ।

— উৎসব-আয়োজনের আগে আমরা একবার সোনামকে দেখতে চাই। দ্রুত তাকে মাকনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। কেমন আছে এখন সোনাম?

এত সুন্দর পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যে কীভাবে যেন বদলে গেল। ইরিকা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মাতাজির পাশে যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা পাথরের উঠোনের বৈচিত্র নিরীক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কোনও দিকে না তাকিয়ে সানজিদেবী ধীরকে টারগেট করলেন।

— সোনামকে যে অসাধারণ তৎপরতায় অশেষ ঝুঁকি নিয়ে আপনারা নীচে নামিয়ে এনেছেন তা আমরা চিরদিন স্মরণে রাখব। মানজু এবং নাংগেলজি আমাকে সব বলেছে। আমরা এ নিয়ে আলোচনা করেছি। পরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে।

মূল কথাকে আড়াল করতে এমনভাবে কথা বলেন এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধিজীবীরা। সে যে বিরক্তবোধ করছে সেটা বোধহয় সানজিদেবী বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বৃত্ত থেকে সরে এলেন। একটু আলাদা করে নিয়ে গিয়ে মানজুকে কী যেন বললেন। মানজু চলে গেল। তিনি আবার ধীরের সামনে এলেন।

— সোনাম খুব শক্ত সম্প্রদায়ের মানুষ। তার পক্ষেই এমন অসম্ভব শারীরিক আঘাত সহ্য করা সম্ভব।

হঠাৎ একজন আশ্রমিক মহিলা পাশ থেকে মাতাজির কানে কানে কী যেন বললেন। আর ঠিক সেই অবসরে ইরিকা ধীরের হাত খামচে ধরে চোখের ভাষায় কিছু যেন বলে দিলেন। ধীরের মনে হল,তিনি বলতে চাইলেন—চমকে যাওয়ার মতো কিছু দেখলেও স্বাভাবিক থাকবে। এবং যা বলব তাতে সায় দেবে। যেন কোনও অন্যথা না হয়।

উঠোন পেরিয়ে একটা আলো ঝলমলে বড় ঘরে তাদের দু'জনকে নিয়ে এলেন সানজিদেবী। মেঝের উপর বেদি মতো একটা জায়গার উপরভাগ মেরুন কাপড় দিয়ে ঢাকা। সেখানে গিয়ে তারা দাঁড়াতেই এক আশ্রমিক মহিলা এসে কাপড় সরিয়ে দিলেন। এত যন্ত্রণাকাতর মর্মান্তিক মুখ সে আরও একবার দেখল।

— সোনাম ডিহাইড্রেশনে খুব কষ্ট পেয়েছিল। আমারও মনে হয়েছিল চাপ নিতে পারবে না।

বক্তা ইরিকা টোর। যেন খুব স্বাভাবিক ঘটনা। খুশি হলেন মাতাজি।

— আমরা খুব চেষ্টা করেছিলাম। বোধহয় ধামের ইচ্ছে ওকে শহিদ করা। অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষের ক্ষেত্রেই এমন শহিদ হওয়া সম্ভব।

ধীরের ইচ্ছে ছিল সামনে ঝুঁকে সোনাম চিকু-র মুখটা তুলে চোখ দুটো ভাল করে মুছে দেয়। কিন্তু সে চেষ্টা করল না। কী কারণে ঘরের মধ্যে এসেছিলেন ইরিকা সেটা বোধহয় ভুলে গেলেন। ঘরটার বাহারি পরিসর নিয়ে মাতাজির সঙ্গে তিনি গভীর আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এমন নিস্পৃহতা সুস্থ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা নয়। ঘর থেকে বেরিয়ে ধীর উঠোনে এল। নাংগেল তাফা ও ধামি আজান দুজনই ম্রিয়মান। মানজু ও নগলিকে দেখে কিছুই বোঝা গেল না। আপাং কেনি অনেকটা দূরে একা আনমনে—যেন কারও অপেক্ষায়। বিনতিকে দেখে মনে হল সে কিছুতেই ধীরের চোখে চোখ রাখতে চায় না। স্বাভাবিক। তার স্বামী পাহাড় থেকে ফিরে আসেনি। অশেষ যন্ত্রণা ও ব্যথায় কাতর সে। ঘুরে সে আপাং-কে দেখল। সবাই দাঁড়িয়ে থাকলেও সে বসেছিল। হাতে জল নিয়ে সে মেঝেতে আঁক কাটতে ব্যস্ত। অল্প পরেই জলের দাগ শুকিয়ে গেলেও কী লেখা ছিল পড়ে দেখল ধীর। বারবার ইংরেজিতে আটচল্লিশ লিখে সেটার উপর ট্যাড়া মেরে পাশে সে বারো লিখে রাখে। আপাং কিছুতেই তার দিকে তাকিয়ে দেখল না। সানজিদেবী ইরিকার সঙ্গে তার দিকে এগিয়ে আসছেন দেখে সে সরে এল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাকিরা উঠোন থেকে বেরিয়ে গেল।

— ইরিকার খোঁজে আশ্রমে পুলিশ এসেছিল। উনি আজই থানায় গিয়ে দেখা করতে চান। পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়ায় সমস্যা হতে পারে। ওঁর মালপত্রও পুলিশ দেখতে চায়।

পাসপোর্ট হারানোর ব্যাপার পুলিশ জানে না। তাহলে হঠাৎ তার খোঁজ!

— কী কারণে পুলিশ হঠাৎ ম্যাডামকে খুঁজছে আপনাকে কিছু বলেনি?

একটু চুপ করে থাকলেন সানজিদেবী। হযতো কী বলবেন ভেবে নিলেন।

— বলেছে কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।

— কী বলেছে সেটা বলুন, দেখি আমরা বুঝতে পারি কি না।

— এগারোই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ যেদিন দিরাং মারা যায় ওইদিন নাকি আমেরিকায় বোমা ফেলা হয়েছে। সরকারি নির্দেশে বিদেশিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

কথাটা শুনে ধীর হো হো করে হেসে উঠতে চেয়েছিল কিন্তু তাকে ভাবতে হল। আমেরিকায় বোমা পড়ার ঘটনা আর যাই হোক গল্প হতে পারে না। কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে।

· আমার মনে হয় ব্যাপার বেশ গুরুতর। ম্যাডামের সঙ্গে আমারও থানায় যাওয়া

উচিত। উৎসবটা সেক্ষেত্রে কাল হতে পারে।

ইরিকাও সায় দিলেন।

— মনে হয় সেটাই ভাল।

খুশি হলেন সানজিদেবী। ইরিকা ধীরের দিকে তাকিয়ে চোখের ভাষায় 'থ্যাঙ্কু' বললেন।

এত সব ঘটনার মধ্যেও সোনামের কথা ধীর ভুলতে পারছিল না। দিরাং-এর মৃত্যু কষ্টের হলেও এমন ঘটনা পাহাড়ে ঘটতে পারে। দঃখজনক হলেও মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সোনামের মৃত্যু মর্মান্তিক, সেই ইদরিনালার তীরে লাশ হয়ে যাওয়া মেয়েটির মতোই।

— আপনি কিন্তু একবারও আমাকে আনজু বলে ডাকেননি।

সম্বিৎ ফিরে এল ধীরের। ইরিকার শান্ত নির্বিকার স্বভাব আস্তে আস্তে তার শরীরের মধ্যেও চুপিসাড়ে ঢুকে পড়ল।

— এত তাড়াহুড়োর কী আছে? কাল তো আপনাব অতিথি হয়ে আসছি। তখনি প্রাণভরে বান্ধবীর নাম ধরে ডাকব।

— ঠিক বলছেন?

— ঠিক।

সানজিদেবীকে চিনতে আর ভুল হল না ধীবের। ঠিক আগেকার মতোই মনোহরা যৌবনের মাতাল করা উচ্ছলতা। তবে তাব মধ্যেও কিছুটা অস্থিরতা তার নজর এড়াল না। ওই নরম মুহূর্তে ধীর একটা সুযোগ নিল। বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে মনে হলেও সে বলেই ফেলল।

— মনে হল ভেজা বেদির উপর সোনামকে শোয়ানো হয়েছে। তলায় কিছু একটা পেতে দেওয়া যায় না?

একটু ক্ষণের জন্য চোখ দু'টো কুঁচকে গেল আনজুর। পরক্ষণেই স্বাভাবিক হয়ে গেল।

— কী জানেন তো, যে শহিদ হয়ে যায় তাকে খালি বেদির উপর শোয়ানোই রীতি। কোনও পুরুষ মানুষ তো সচরাচর ধামে দেহ রাখে না।

পুরোটাই গল্প মনে হলেও তাকে বিশ্বাস করতে হল।

— আসলে আমি এসব জানতাম না।

— তা হলে আরও জেনে নিন যে আজ বেলা বারোটার সময় আমি শহিদ সোনাম চিকুর পুজো করব। সে সময় প্রথা অনুসারে পুজ্য ও পুজকের অঙ্গে কোনও বসন থাকে না।

শেষ কথাটা তাঁর বলার কী দরকার ছিল বুঝতে পারল না ধীর। তবে মুখে সম্ভ্রমের ভাব ধরে রাখল। আর তার কিছু বলার ছিল না। তাই চুপ করে গেল। সেই সময় ইরিকা এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মালপত্র ততক্ষণে এসে গিয়েছিল।

— আর দেরি করলে আজ কিন্তু ফেরা যাবে না। আনজু, তা হলে আসি আমরা। কাল আবার দেখা হবে।

দারুণ হৃষ্ট বোধ করলেন আনজু ম্যাডাম। ইরিকা টোর যে আনজু ম্যাডামের কাছে অনেক লিবার্টি নিতে পারেন, জানল ধীর। তবে কখন কীভাবে সেটা তিনি অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করেন।

মানজু মঞ্জুর

আশ্রমের বাইরে বেরিয়ে এসে তারা কাউকে দেখতে পেল না। নাংগেল, কেনি, ধামি এমনকী নগলি বা বিনতি কেউ-ই ধারে কাছে ছিল না। অবশ্য আশ্রমের কোনও কক্ষে তারা বিশেষ আলোচনায় ব্যস্তও থাকতে পারে। তারা মাননীয় অতিথি ছিল কিছুক্ষণ আগেও। হঠাৎ অবহেলা করা হলে নজরে পড়ে। পড়ল ধীর বিশ্বাসের। মিনিট পঁচিশের মধ্যে মালপত্র সহ তারা কেনির হোটেলে পৌঁছে গেল। সেখানে কেনিও ছিল না। হাকুর কাছেই জানা গেল তার মনিব আগামীকাল উৎসব সেরে ফিরে আসবে। সবই সম্ভবত মায়ের ইচ্ছায় ঘটে থাকে। ইরিকার ব্যবহারের জন্য একটা ভাল ঘর খুলে দিল হাকু। ঠিক যেভাবে সোনাম মেমসাহেবের হাতেমুখে জল দেওয়ার সময় পাশে থাকত সেভাবেই মগ হাতে পাশে থাকেল ধীর। তোয়ালে দিয়ে ইরিকা মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকতেই সে রাস্তার দিকে তাকাল। সাড়ে দশটায় রাস্তা জমজমাট হওয়ার কথা কিন্তু প্রায় ফাঁকা।

তার ঘরে ঢুকে রেখে যাওয়া জিনিসপত্র তুলে ধীর স্যাকে ঢুকিয়ে নিল। তারপর দরজা বন্ধ করে অতি সন্তর্পণে খালি মদের বোতলের ডাঁই সরিয়ে মোজার প্যাকেট হাতে নিল। প্যাকেটটা ন্যাপস্যাকে ভরে মিনিট দুই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরোতে যাবে হঠাৎ ইরিকা এসে ঢুকলেন।

— তা হলে কী ঠিক করলে? কখন বেরোবে?

— কাল সকালে বেরোতে পারলেই ভাল হত কিন্তু আমাদেব হাতে বোধহয় বারো ঘন্টার বেশি সময় নেই।

— কেন, বারো ঘন্টার বেশি সময় নেই কেন!

আপাং-এর জলের দাগ দিয়ে মেঝেতে লেখা সংখ্যাতত্ত্বের কাটাকুটি কী ইঙ্গিত করে ধীর ম্যাডামকে বোঝাতে চাইল।

ঘোর বিস্ময় ইরিকার চোখেমুখে।

— সেকি! এতক্ষণ কথাটা তুমি আমায় বলনি কেন? এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!

— বলিনি, কারণ আমার অনুমান। হয়তো আপাং অন্যকিছু বলতে চেয়েছিল।

— তোমার অনুমান ঠিক। আপাং তোমাকে সতর্ক করতে চেয়েছেন। আমার মনে হয় অতটা আশঙ্কার কারণ নেই। তবে আমার কাজ শেষ। যখন বলবে বেরিয়ে পড়ব।

অবাক হল ধীর। ম্যাডামের কাজ শেষ মানে!

— আপনার কোন কাজের কথা বলছেন?

হাসলেন ইরিকা। নিজের মধ্যে তৃপ্তির শিহরণ উঠলে যে হাসি মুখে জড়িয়ে থাকে সেই হাসি তাঁর মুখে।

— দেখার কাজ, ধীর। সবাইকে কাছ থেকে দেখার কাজ। আমি শুধু সোনাম আর মানজুকে দেখতে চেয়েছিলাম। সঙ্গে দেখার মতো আরও দু'জনকে পেয়ে গেলাম।

— এখানকার মানুষজনকে নিয়ে কিছু লিখতে চান?

— কতটা সম্ভব হবে জানিনা তবে ইচ্ছে আছে।

চুপ করে গেল ধীর। একটু পরে ইরিকা জানতে চাইলেন—

— তোমাকেও তো খুব নোট নিতে দেখলাম। লিখবে নাকি?

হেসে ফেলে ধীর। ভাবটা এমন, ধ্যুর—কী যে বলেন!

— নোট নিই ঠিক, তবে লেখাটেখা আমার আসে না। তা ছাড়া, চাসু উপত্যকার কী এমন কথা আছে যে মানুষ পড়তে চাইবে?

চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় নিজের মনেই ইরিকা বলে উঠলেন।

— আছে ধীর, আছে। একবার চেষ্টা করেই দেখ না। কে পড়ল বা না পড়ল তাতে তোমার কী যায় আসে।

ম্যাডামের কথা শুনে ধীরকে সত্যিই ভাবতে হল।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েই আবার ফিরে এলেন ইরিকা।

— তুমি বিনতির সঙ্গে দেখা করতে যাবে না?

থতমত খেয়ে গেল ধীর। ম্যাডামকে সঙ্গে করে বিনতির কাছে যাওয়ার কথাই সে ভেবে রেখেছিল।

— যাব। আপনিও যদি আমার সঙ্গে থাকেন তা হলে ভাল হয়।

— দিরাং-কেই আমি চিনতাম না। তার স্ত্রীকে সমবেদনা জানাতে যাওয়াটা একটু বেশি বেশি হয়ে যায়। তুমিই যাও। কিন্তু যাবে আর আসবে।

টাকাভর্তি মোজার প্যাকেটটা ন্যাপ থেকে বের করে ইরিকার দিকে এগিয়ে দিল ধীর। তার দিকে না তাকিয়ে দোমড়ানো পাঁচটা একশ টাকার নোট ওয়েস্টপাউচ থেকে বের করলেন ইরিকা।

— প্যাকেটে পাঁচশো টাকা কম আছে। পুরোপুরি করে সবটাই তুমি তোমার নাম করে বিনতির হাতে দিয়ে আসবে।

তার বাহাদুরি কীভাবে ফাঁস হল বোঝার চেষ্টা করছিল ধীর। নোটগুলো পরীক্ষা করে তার মনে হল একই নম্বর। হয়তো ম্যাডাম নিজেই খুলে রেখেছিলেন।

— নোটগুলো কীভাবে পেলেন?

— সে অনেক কথা ধীর। পরে যেতে যেতে বলব। তবে তোমার বাহাদুরির কোনও তুলনাই নেই।

ধীর নিজের বিস্ময় চেপে রাখার চেষ্টা করল। ম্যাডাম তাড়া দিলেন।

— যাও, আর দাঁড়িয়ে থেকো না। আমাদের হাতে সময় কিন্তু আর বেশি নেই।

ইরিকা তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ধীরকে সঙ্গে করে বাইরে এসে তিনি তার ঘরে ঢুকে গেলেন।

দৌড়তে দৌড়তে বিনতির কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল ধীর। খুব হাঁপিয়ে পড়েছিল সে। তবু খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে এক ভিন্ন কণ্ঠের ফিসফিসানি শুনতে পেল। ঘরের মধ্যে না গিয়ে ওখান থেকেই বিনতির নাম ধরে হাঁক পাড়ল ধীর। বিনতি বেরিয়ে এল। তার ঠিক পিছনেই মানজু সালান, আনজুর ভাই। অসম্ভব অবাক হল ধীর। দিরাং-এর ঘরে তার বউ-এর পাশে ঘন হয়ে মানজু দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এটা তার কল্পনায় আসেনি। ধীর নিজেকে সামলে নিলেও বিনতির অস্বস্তি গেল না।

— মাতাজিনে মানজুকো মেরা পাস ঠেরনেকে লিয়ে বোলা, সাবজি।

মাতাজি তাঁর ভাইকে বিনতির কাছে গিয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। একমাত্র মাতাজিই এমন নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা ধরেন।

— বহত আচ্ছা কিয়া মাতাজিনে। সায়েদ মানজুভি তুমহে মঞ্জুর হ্যায়?

মানজুকে সে সত্যিই মন থেকে চায় কি না জানতে চাইল ধীর। মানজুকে তার পছন্দ এটা সে বোধহয় বলতে বাধ্য। চাসু উপত্যকায় মাতাজির বিরুদ্ধে যাওয়ার হিম্মত ছিল

একজনেরই। তিনি এখন শহিদবেদিতে উলঙ্গ হয়ে মালা পরতে ব্যস্ত।

— মুঝে মানজু মঞ্জুর হ্যায় সাব্।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর কথা বলল ধীর।

— তুম দোনো খুশ রহো।

যেমন এসেছিল তেমনি খোলা বারান্দা থেকে দৌড়ে নীচে নেমে এল ধীর। হোটেলের মুখে তার জন্য খুব উদ্বিগ্ন মুখ করে ইরিকা দাঁড়িয়ে ছিলেন। এত অস্থির হতে তাঁকে এর আগে দেখেনি ধীর।

— কেনি আজ হোটেলে ফিরবে না শুনলাম। তার সঙ্গে তোমার বোধহয় আর দেখা হবে না। এখানে আর আমার একদম থাকতে ইচ্ছে করছে না।

ধীরেরও। দু'জনের মালপত্র আগাম ভাড়া করা জিপে এনে রাখতেই জিপ ছেড়ে দিল। পুল পেরিয়ে ওপারে যাওয়ার সময় ইদরিনালার তীরে কিছু জটলা দেখতে পেল ধীর। ড্রাইভার জানাল একটি মেয়ে পাহাড় থেকে পড়ে মারা গেছে। ইরিকা জানতে চাইলেন।

— কে মারা গেছে ধীর?

— দিশ।

—দিশ! সে আবার কে?

— কেউ না।

তাম্রধার

জিপটা পিতসিতে ঢুকে মোড় নিতেই ধীর হঠাৎ নাংগেলজিকে দেখতে পেল। ওই সময় ওখানে তার কী দরকার! গাড়ি দাঁড় করাতে বলতেই ড্রাইভার ব্রেক কষল। খুব বিরক্ত হলেন ইরিকা।

— কী ব্যাপার ধীর, তুমি কি আমাকে চাসুনদীতে ফেলে পালাতে চাও?

— ওই দেখুন গুরুজি। আর তো আসা হবে না। একবার দেখা করে আসি।

ভাল করে দেখলেন ইরিকা। চিনতে পারলেন।

—তুমি তোমার গুরুজিকেই চিনলে। আরও একজন আছে; দেখ চিনতে পার কি না।

তাকিয়ে দেখল ধীর। তার গুরুজির পাশে এক দেহাতি মেয়ে ঘাঘরা আর কামিজ পরে দাঁড়িয়েছিল। আর কাউকে সে দেখতে পেল না।

— কই আর কোনও চেনা মানুষ তো দেখতে পাচ্ছি না।

— গিয়ে দেখ ঠিক চিনতে পারবে।

তাঁর সামনে একটা জিপ শব্দ করে দাঁড়ালেও নাংগেল তাফা-র কোনও খেয়াল ছিল না। দুই হাঁটুর উপর মুখ রেখে আপনমনে কী যেন চিন্তা করছিলেন। ধীর তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মুখ তুলে তাকালেন। সারা মুখ ফ্যাকাসে, অভিব্যক্তিশূন্য। প্রায় আট ঘন্টা আগে আশ্রমের উঠোনেও তো তাঁকে এমন মনে হয়নি। মিনিট খানেক পর চিনতে পারলেন।

— ওহ্ ধীরু, তুমি! এখানে কী করছ তুমি? মাতাজি আজ তো তোমাদের জন্য উৎসবের আয়োজন করবেন বলে শুনেছি।

— ওসব বাদ দিন। কিন্তু আপনি এখানে কেন?

ধীরের প্রশ্ন শুনে তার গুরুজি পাশের দেহাতি মেয়েটির দিকে তাকালেন। মহিলা সামনে আসতেই ধীর যেন আকাশ থেকে পড়ল।

— কী ব্যাপার নগলি? গুরুজির সঙ্গে তুমি!

নাংগেল তাফা-র সঙ্গে নগলি দাকাত আছে ধীরের বিশ্বাসই হয়নি। কীভাবে এমন ঘটনা ঘটতে পারে তার মাথায় ঢুকল না। নগলি ধীরকে কিছুটা দূরে নিয়ে গেল।

— তুমার গুরুজি কা রাতসে ভারী বুখার। মুহ সে বহত খুন পড়ছে। আমি তুমার গুরুজি কো কাল মাকনা লিয়ে যাবে। যদি কুছু হয়।

এমন নগলিকে চিনতে তার খুব অসুবিধে হল। অবস্থার চাপে অতি দ্রুত সে আর পাঁচটা গ্রামের মেয়ের মতোই হয়ে পড়েছে। জীবনের একমাত্র ভালবাসার মানুষ কি শেষ পর্যন্ত তার কাছে আসতে বাধ্য হল? কিন্তু কী লাভ হল নগলির? অসুস্থ, অথর্ব হয়ে সে এখন অসহায়। তার বোঝা বয়ে তার লাভ?

— গুরুজির অসুখটা কী, জান তুমি?

অনেক কিছুই বলল নগলি আবার কিছুই বলা হল না। তবে ধীরের মনে হল, অসুখটা বেশ জটিল। মানুষটাকে সে জোর করে মাতরায় নিয়ে গিয়ে ভারী অন্যায় করেছে। অবশ্য নগলি তার মতো করে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবে। তাই করতে গিয়ে ধাবা লাটে উঠলেও নাংগেলজিকে সে সুস্থ করে তুলতে চাইবে, জানে ধীর। দিশ যে ইদরিনালার ধারে পড়ে আছে সেটাও তার কাছে আপাতত কোনও খবর নয়।

ইরিকা জিপ থেকে নেমে নাংগেলজিকে শুভেচ্ছা জানালেন। তিনিও জোড়হস্ত হয়ে মেমসাহেবকে নমস্কার করলেন। ভাষার সমস্যার জন্যই আর বেশি কথা হল না। ইরিকা ধীরের কাছে এসে দাঁড়াতেই নগলি নাংগেল তাফা-র কাছে গেল।

— বিনতিকে যে টাকা তুমি দিতে পারনি সেটা তুমি তোমার গুরুজির হাতে দিতে পার। তাঁর মতো মানুষের আরও কিছুদিন বাঁচা দরকার।

ধীরও সে কথাই ভাবছিল। মেমসাহেব কি মনের কথা পড়তে পারেন!

— আমি ভাবছি ...।

তার কথা শেষ করতে দিলেন না ইরিকা।

— তুমি ঠিকই ভেবেছ। আমার মনে হয় উনি ক্যান্সারে ভুগছেন। টাকাগুলো তুমি ওনার হাতে দাও। কাজে লাগতে পারে।

ইরিকা জিপে ফিরে যেতেই ধীর শেষবারের মতো চাসু উপত্যকার দিকে তাকাল। জিপ ঘুরলেই চাসু উপত্যকা আড়ালে চলে যাবে। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর সে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে চাইল, কিন্তু সে বাধা পেল। নগলি তাকে কিছু বলতে চায়।

নগলি ধীরের কাছে জানতে চায়, সে কি তার গুরুজিকে নগলির কাছে গিয়ে থাকার জন্য জোর করতে পারে? দেড় সেকেণ্ড ভাবার পর ধীর মনে মনে বলে উঠল : ওয়াও! পারে মানে, আলবাত পারে!

নাংগেলজির কাছে এসে ধীর তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। এক-পা এক-পা করে তিনি হোটেলের দিকে এগোতে থাকলেন। তাঁর পিছনে সতর্ক থেকে ধীরও এগিয়ে

গেল। ঠিক যেন দুরূহ ঢালে চড়াই ভেঙে উপরে উঠতে তৎপর দুই আরোহী। হোটেলের দরজা পেরিয়ে আস্তে আস্তে খাটের উপরে গিয়ে বসলেন নাংগেলজি। মুখ তুলে হাতটা বাড়িয়ে ধীরের মাথায় হাত রাখলেন।

— তুমি আমার মান রেখেছ ধীরু। তোমাকে ধন্যবাদ।

কী মান সে রেখেছে আর কেনই বা ধন্যবাদ বুঝতে পারল না ধীর বিশ্বাস। তবে সুযোগটা সে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাইল।

— এবার তা হলে আপনি আমার মান রাখুন।

এমন কথা শুনে নাংগেল তাফা মুহূর্তের জন্য অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। ঘোলাটে চোখ দুটো উপরে তুলে তিনি ধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

— মাকনা থেকে ফিরে এসে আর লুনি নয় আপনাকে নগলির ঘরে গিয়ে উঠতে হবে। গোঁয়ার্তুমি করলে আপনাকে আর বাঁচানো যাবে না। মনে রাখবেন।

একটু কষ্ট করেই হাসলেন তার গুরুজি। অসুস্থ মানুষের হাসিতে তেমন উচ্ছ্বাস থাকে না। তবু অসম্ভব আরাম পেল ধীর।

— এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই ধীরু। আমিও তাই-ই ভেবে রেখেছি।

এত সহজে নাংগেল তাফা তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবেন ভাবতে পারেনি ধীর। তবে তার গুরুজির কথা শুনে ধীরের এও মনে হল, যেন নিরুপায় হয়েই তিনি এমনটা করতে বাধ্য হচ্ছেন। ঘটনাটা যে মোটেই তা নয় সেটা সে নাংগেল তাফা-কে বুঝিয়ে দিতে চাইল।

— এটাই একমাত্র উপায় গুরুজি। অনেক আগেই আপনার এটা করা উচিত ছিল। যাদের কাছে আপনার মান যাবে ভেবে তা করেননি তারা কেউ-ই কিন্তু আজ আপনার পাশে নেই। আছে একমাত্র নগলি দাকাত।

কয়েক সেকেণ্ড পর নাংগেল তাফা ধীরের একটা হাত তাঁর দু'হাতের মধ্যে আলগা করে চেপে ধরলেন। তারপর হালকা করে ঘাড় নাড়লেন। অর্থাৎ ধীরুর কথা একশ ভাগ সত্যি।

ব্যস্, ধীরের কাজ শেষ।

ঠিক ওই সময় আস্তে আস্তে নগলি এসে ঘরে ঢুকল। চোখে চোখে ধীর নগলির সঙ্গে তার কথা সেরে নিল। চাসু উপত্যকায় ঢোকার পর ওই প্রথম সে খুশিতে উপচে উঠল। তবে নগলির কথা ভেবে একটু বেশিই কষ্ট হল তার। সেই পেল কিন্তু গোটা মানুষটা তার নাগালের

বাইরেই থেকে গেল।

চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সে মূল কাজটা সেরে নিতে চাইল। ন্যাপ থেকে মোজার প্যাকেটটা বের করে ধীর নগলির হাতে দিল। হঠাৎ তার সামনে গার্ডার দিয়ে আটকানো একটা মোজার প্যাকেট দেখে সে কিছুই বুঝতে পারল না।

— কী রাখলে জুরাপে?

মোজার মধ্যে কী রাখা আছে নগলি জানতে চায়। তবে তার জানতে চাওয়ার মধ্যে কোনও আগ্রহ ছিল না। কেমন যেন নিস্পৃহ ভাব। কোলের উপর প্যাকেট যেমন ধরে ছিল তেমনি থাকল।

— গুরুজির জন্য মেমসাহেবের ভেট। কী আছে জানি না।

চুপচাপ বসে থাকা নগলির শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে খুব বিব্রত বোধ করছিল ধীর। সে সরে যেতে চাইল। তখনই গুরুজি তাকে কাছে ডাকলেন। ধীর তাঁর কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াতেই অস্ফুটস্বরে ভেঙে ভেঙে তিনি কথাগুলো বলে গেলেন।

"উপত্যকা এখন রাহুর কবলে ধীরু। ঠেকানোর মানুষ নেই।"

শুনেও শুনল না ধীর বিশ্বাস। ওসব কথায তাব আর কোনও দরকার নেই। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে চায়। কোনও জবাব দিল না ধীর। ঝপ্ করে প্রণামটা সে সেরে নিল। কোনও বাধা দিলেন না। তার মনে হল, এই প্রথম নাংগেল তাফা গুরুজি হিসাবে ধীর বিশ্বাসের প্রণাম অন্তর থেকে মেনে নিলেন। আর একটুকুও দাঁড়াল না সে। ঘরে থেকে বেরিয়ে দৌড়ে এসে সিটে বসতেই জিপ ছেড়ে দিল। পিতসি থেকে গাড়ি ডাইনে মোড় নিতেই চাসু উপত্যকা আড়ালে চলে গেল।

জিপ ফাঁকা রাস্তা ধরে হু হু করে এগিয়ে চলল। তারা দু'জন গাড়ির মধ্যে নির্বাক, আনমনে। অনেক পরে ইরিকা মুখ খুললেন।

— এগারোই সেপ্টেম্বর আমেরিকায় কী ঘটেছে জানি না কিন্তু সেটা ঘটে আমার মহা উপকার হয়েছে।

— পুলিশ এসে আপনার খোঁজ নিয়ে গিয়েছে বলছিলেন।

— মাত্র দু'দিনেই তিনবার। আনজু কিছুটা ঘাবড়ে যায়। আমারও মালপত্রসমেত আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসতে সুবিধে হয়ে যায়।

— আমেরিকায় কী ঘটেছে বলে আপনার মনে হয়?

ভাবতে কিছুক্ষণ সময় নিলেন মেমসাহেব।

— যাই ঘটুক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া না হলে দু'দিনের মধ্যে তিনবার এই অখ্যাত অঞ্চলে এক বিদেশিনীর খোঁজে পুলিশ দৌড়ে আসতে পারে না।

ধীর চুপ করে যেতেই কথাবার্তায় ছেদ পড়ল। তার মধ্যে ম্যাডাম তাঁর ন্যাপের ভিতরে হাত চালিয়ে কী যেন খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কম করে দশ মিনিট বিরতির পর ইরিকা আবার কথা শুরু করলেন। সময় কাটানোর জন্য যে সব আলগা কথা চালাচালি হয় তেমন কথা।

— তুমি কিন্তু অকারণে বেশি সাহস দেখাও। এর ফলে একদিন তুমি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়তে পার।

বাইরে পাহাড়ি পথের দৃশ্য থেকে চোখ ফেরানোর কোনও প্রয়োজন অনুভব করল না ধীর।

— সময় বিশেষে একটু কাপুরুষ হলে তুমি অন্যের উপকাব কবতে পারতে, জান তুমি?

ইরিকার দিকে তাকাতে এবার সে বাধ্য হল।

— মানে! ঠিক বুঝলাম না।

মুচকি হাসলেন মেমসাহেব।

— বছর পনেরো আগেকার কথা। সন্ধের সময় রাস্তা পার হতে যাব হঠাৎ তিনটে মাগাব আমাকে অ্যাটাক করে। চতুর্দিক শুনশান। বুঝলাম আমি শেষ। আচমকা অল্প দূরে একটা বিকট চিৎকার!

থামলেন ইরিকা ম্যাডাম। ধীর শুনতে কতটা আগ্রহী বুঝতে চাইলেন।

— তারপর?

— এমন চিৎকার সত্যিই মানুষকে ভয় পাইয়ে দেয়। ছেলেগুলো আমার ব্যাগটা নিয়ে হাওয়া। তবে যাওয়ার আগে আমার শরীরে একটা ছুরির ফলা বসিয়ে দিয়ে যায়।

— তারপর?

— যখন জ্ঞান হল, দেখলাম আমি হাসপাতালে, নিম্নাঙ্গে ভারী ব্যাণ্ডেজ। আমার মা-বাবার পাশে একটা অচেনা লোক। পরে জানলাম ওর চিৎকারই আমাকে বাঁচিয়ে দেয়।

— লোকটিকে আপনি কাপুরুষ বলছেন কেন?

— বলছি কারণ তার নাম রেক্স সাইড, আমার বয়ফ্রেণ্ড। স্রেফ নিজেকে বাঁচাতেই ভয় পেয়ে সে এমন চিৎকার করে।

— বলতে চান রেক্স-এর জায়গায় আমি থাকলে ...।

ধীরকে কথা শেষ করতে দিলেন না ইরিকা।

— নিজের সঙ্গে তুমি আমাকেও লাশ বানিয়ে দিতে।

— মানলাম, হয়তো তাই হত। কিন্তু আপনি আমাকে কবে সাহসী হতে দেখলেন?

ম্যাডাম ধীরের প্রশ্ন শুনেও শুনলেন না।

— মনে রাখবে, যার দল তারই বল। পিছনে রে রে করে সঙ্গ দেওয়ার লোক না থাকলে সাহসী হতে নেই। একা মানুষকে এখন সর্বদাই কাপুরুষ হতে হয়।

বেশ বিরক্ত হল ধীর। কী কথার কী উত্তর।

— এটা কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর হল না।

অনেকক্ষণ কোনও কথা বললেন না ইরিকা টোর। ধীরও কথা বাড়াতে চাইল না। মিনিট খানেক পর হঠাৎ ঝিমিয়ে পড়া প্রসঙ্গটা মেমসাহেব তুলে আনলেন।

— প্রমাণ দিতে পারব না, কিন্তু আমার ধারণা সোনাম ও দিরাং-এর মৃত্যুর জন্য পরোক্ষে তোমার বেপরোয়া মনোভাবই দায়ী।

এমন অসংলগ্ন ও বালখিল্য-সুলভ মন্তব্যে ধীর বিব্রত বোধ করলেও কিছু বলল না। দু'জনের মৃত্যুই তার কাছে মর্মান্তিক ঘটনা, বিশেষ করে দিরাং-এর। মনে পড়লেই ভিতরটা হু হু করে ওঠে। মূলত সে কারণেই চাসু উপত্যকা তার ভ্রমণ-মানচিত্র থেকে হঠাৎ উধাও। তবে ইরিকার মতো বিচক্ষণ মহিলা এমন আলটপকা মন্তব্য না করলেই পারতেন। ধীর ফের বাইরের দৃশ্যদর্শনে ফিরে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে আর এক দফা কিছু একটা খুঁজে পেতে চেষ্টা করে গেলেন ইরিকা। মিনিট দশ পর সহসাই তিনি থেমে পড়লেন।

তার কানের কাছে এত প্রচুর খোঁজাখুজির শব্দ আচমকা থেমে যেতেই তাকিয়ে দেখল ধীর—ম্যাডাম কিছুটা বিব্রত। ধীর তাঁর মন্তব্যে কিছুটা হলেও যে ক্ষুব্ধ এটা সম্ভবত তিনি টের পেয়েছিলেন।

— তবু কিন্তু ধীর বিশ্বাস আমাকে মুগ্ধ করেছে। এমন মানুষকে বন্ধু হিসাবে পাওয়া সত্যিই এক দুর্লভ প্রাপ্তি।

ইরিকা ম্যাডামের মুখের ভাব ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখল ধীর। ভণিতা বলে মনে হল না তার। তবে কোনও কিছু বলতেও চাইল না সে। ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল কিন্তু জানালো না।

— সোনামকে আমরা যখন উপর থেকে নীচে নামাচ্ছিলাম তখন ওর পকেট থেকে একটা জিনিস পাওয়া যায়। ভাবছি ওটা তোমায় গিফ্‌ট করে যাব।

— কী জিনিস? জানতে চাইল ধীর।

ওয়েস্ট পাউচ থেকে জিনিসটা বের করে ইরিকা তাব হাতে দিলেন। আর অমনি ধীরের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল।

— এটাকে বলে তাম্রধার। অত্যন্ত কাছের মানুষ হলেই সানজিদেবী কাউকে এমন তাম্রধার দিয়ে সম্মান জানান। আমার খুব কাছের মানুষ হয়ে পড়েছ তুমি। এটা পরিয়ে দিয়ে আমিও তোমাকে সম্মান জানাতে চাই।

ধীরের মাথাটা প্রচণ্ড শব্দে টুকরো টুকরো হওয়ার আগেই আমেরিকায় পড়া বোমাটা তাদের জিপে এসে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে জিপটা বিশাল একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ তার আর কিছু মনে পড়েনি। জ্ঞান ফিরতেই ধীর দেখল সময়েব অনেক আগেই সে আলমোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে।